ত্রিপুরার গাছপালা

নলিনীকান্ত চক্রবর্তী

ত্রিপুরার গাছপালা

নলিনীকান্ত চক্রবর্তী
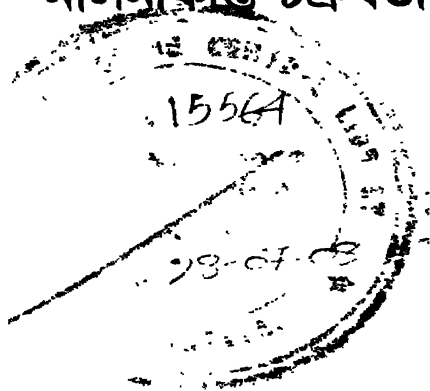
11, জগন্নাথবাড়ি রোড
আগরতলা -799001

TRIPURAR GACHPALA

by

NALINI KANTA CHAKRABORTY

প্রথম প্রকাশ ঃ

জানুয়ারি, 2001

প্রকাশক ঃ

দেবানন্দ দাম

জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী

11 জগন্নাথবাড়ি রোড,

আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)

লেজার টাইপ সেটিং ঃ

শিবনারায়ণ মজুমদার

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ

নলিনীকান্ত চক্রবর্তী

মুদ্রণ ঃ

জ্ঞান বিচিত্রা অফসেট এণ্ড কম্পিউটার ইউনিট

যোগেন্দ্রনগর, আগরতলা, 799004

কলকাতায় প্রাপ্তিস্থান ঃ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

12 বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা - 700073

দে বুক স্টোর

13/1 বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা - 700073

বাউলমন প্রকাশন

২৪ বালিগঞ্জ গার্ডেনস্, কলকাতা-19

ISBN - 81-86792-95-3

মূল্য ঃ 100 টাকা

উৎসর্গ

অমিতাভ-কে

মুখবন্ধ

ত্রিপুরা রাজ্যের গাছপালার সঙ্গে পরিচয় দীর্ঘ দিনের। গত প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরে গাছপালা সম্বন্ধীয় পঠন পাঠনে নিযুক্ত থাকায় এই পরিচয় আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে। আমার অনেক ছাত্র-ছাত্রী ও বন্ধু-বান্ধবকে দেখেছি আমাদের এই মূক প্রতিবেশীদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে। তবে কোথায় যেন একটা বাধা। তাই এ রাজ্যের কিছু বৃক্ষের পরিচয় বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ সম্বন্ধে সামান্য তথ্য পরিবেশনের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

বইটি যথাসম্ভব সহজ সরল ভাষায় লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। একাজে অনেকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, সেজন্য তাদের জানাই ধন্যবাদ। দৈনিক সংবাদ পত্রিকা ত্রিপুরার গাছপালা সম্বন্ধীয় আমার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন, যার উপর ভিত্তি করে এই বই লেখা হয়েছে। এজন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। এই পুস্তকে পরিবেশিত বিভিন্ন তথ্যাবলীর জন্য অনেক পুস্তক ও পত্রপত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তাদের সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। জ্ঞান বিচিত্রা ও সংশ্লিষ্ট সকলকে বই প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সকল পাঠক সমাজের কাছ হতে পাওয়া পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদাসহ বিবেচিত হবে। প্রচ্ছদপটের বৃক্ষটি ককবরক ভাষা হতে নেওয়া গাছপালার বৈজ্ঞানিক নামের একমাত্র উদাহরণ যা এ রাজ্যে পাওয়া যায়।

বিনীত

গ্রন্থকার

ইন্দ্রনগর,

আগরতলা-799006

ত্রিপুরা

সূচীপত্র

সূচনা

মানুষের জীবনে বৃক্ষরাজির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এরা যেমন আমাদের নানা খাদ্য যোগায় তেমনি প্রযেজনীয় অন্যান্য সামগ্রীর যোগানদারও এই বৃক্ষরাজি। আমাদের ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যে নানা প্রকার উদ্ভিদ সম্পদে সমৃদ্ধ। রাজ্যের প্রায় ১৬০০ প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে প্রায় ২৮০টি প্রজাতি বৃক্ষ জাতীয়। এদের মধ্যে আমাদের দেশীয় গাছপালা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে বেশ কিছু বিদেশী গাছপালা। এই বিদেশী গাছপালারা অনেকে এখানকার আবহাওয়ায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে যাতে তাদের আর বিদেশী বলে চেনা যায় না। আগরতলায়ও রয়েছে অনেক দেশী বিদেশী বৃক্ষরাজি যাদের পথের পাশে ও অন্যান্য স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। এদের কাউকে হয়ত যত্ন করে লাগানো হয়েছে আবার কেউ বা প্রকৃতির আপন খেয়ালে নিজে গজিয়ে উঠেছে।

সুপরিকল্পিত শহর হলে হয়ত এক একটি রাস্তার ধারে এক এক জাতের বৃক্ষ লাগানো হত অথবা একই সময়ে ফুল ফোটে এমন বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো হত যাতে নানা ফুলের রামধনুর রঙের বাহার দেখতে পেতাম। তা নাহয় নাইবা হয়েছে, কিন্তু নানা প্রজাতির পুষ্পিত বৃক্ষ কিন্তু এই রাজ্যে কম নেই। আকাশের পানে হাত বাড়িয়ে থাকা আমাদের এই মূক সঙ্গীদের জানার জন্য মাঝে মাঝে কারো আগ্রহ দেখি। তবে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের খটমটে নাম ও পরিচয় জ্ঞাপক নানা পরিভাষিক শব্দ প্রায়ই এর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষের মধ্যে কারো রয়েছে উজ্জ্বল রঙের ফুলের বাহার যেমন কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, শিমুল প্রভৃতি আবার কারো ফুলের তত বাহার নেই, কিন্তু রয়েছে গাঢ় সবুজ পাতার বাহার যেমন দেবদারু। এই দুই জাতের গাছের মধ্যে ফুলের বাহারের অনেক গাছই এসেছে বিদেশ থেকে যেমন — আফ্রিকা, আমেরিকা, মালয় প্রভৃতি হতে। দেশী বৃক্ষদের প্রায় সবারই রয়েছে দেশীয় নাম, বিদেশীদের হয়ত তা নেই। কিন্তু বিদেশী দেশী প্রায় সবারই রয়েছে বৈজ্ঞানিক নাম। বিশ্বজুড়ে যে নামে তারা পরিচিত। এই নাম, ঠিকানা সম্বন্ধীয় আলোচনায় পরিভাষিক শব্দ যতটা সম্ভব বাদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারেরও উল্লেখ রয়েছে, যাতে নিজ নিজ বাড়িতে যারা এইসব গাছ লাগিয়েছেন তার সুষ্ঠ ব্যবহার করতে পারেন আর পরিচয়ের বাধা কেটে গেলে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে আশা করি সবার ভালো লাগবে। এবার তাহলে এক একটি করে গাছ সম্বন্ধে আলোচনায় আসা যাক ---

বর্তমান আলোচনায় দ্বিবীজপত্রী বৃক্ষকেই নেওয়া হয়েছে এবং হাচিন্‌সনের শ্রেণী বিন্নাস পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ত্রিপুরার যে সব বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদকে এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি ভবিষ্যতে এদের নিয়ে আলোচনাব ইচ্ছা রইল।
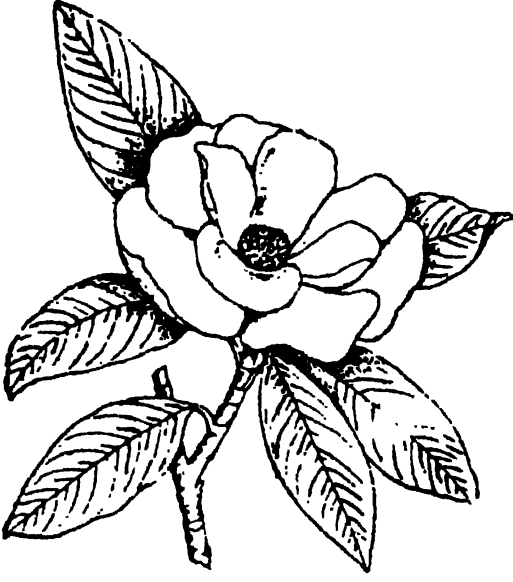
হিম চাঁপা

Magnolia grandiflora L

গোত্র ঃ **Magnoliaceae**

অন্য নাম ঃ ম্যাগ্নোলিয়া

নামের প্রথম শব্দটি এসেছে উদ্ভিদবিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যাপক Pierre Magnol এর নাম অনুসারে আর grandiflora অর্থ বড় ফুল।

এই সুন্দর ছোট বৃক্ষটি উত্তর আমেরিকার আদিবাসী তবে বর্তমানে আমাদের দেশে সুন্দর ফুলের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে এর চাষ হয়। ত্রিপুরাতেও এর কিছু গাছ রয়েছে। আগরতলা শহরে কোন কোন বাড়িতে এই গাছ রয়েছে। কলেজটিলায় মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের ঠিক সামনে দুটি গাছ আছে।

আকৃতিতে এই ছোট গাছ টিঅনেকটা ছোট পিরামিডের মতো। চির সবুজ। বাকল ধূসর রঙের, পাতা বেশ বড় পুরু। পাতার উপরের দিক চকচকে, গাঢ় সবুজ। নীচের দিক লালচে, ছোট ছোট রোমে ঢাকা, কচি পাতার কুড়িগুলি পত্রাবরণে ঢাকা থাকে, যা ঝরে যাওয়ার পর নূতন পাতা বের হয়। ফুল বেশ বড়। বড় ডিমের মত দেখতে ফুলের কুড়িগুলি শাখার আগায় জন্মায। সাদা রঙের অনেকগুলি পুষ্পপুট পুংকেশর ও গর্ভকেশরকে ঘিরে থাকে। ফল অনেকটা ডিমের মত। ফল হতে লাল বীজগুলি সরু সুতার প্রান্তে ঝুলতে থাকে। তবে পুষ্পপ্রেমীদের কল্যাণে এই সুন্দর ফুল, ফল হওয়া পর্যন্ত গাছে থাকতে পারে না। মে মাস পর্যন্ত গাছে ফুল ফোটে। কলম হতে বংশ বৃদ্ধি করা যায়। ■

দুলি চাঁপা

Magnolia pterocarpa Roxb

গোত্র ঃ Magnoliaceae

গণ সূচক শব্দটি উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক Piere Magnol এর নাম অনুসারে হয়েছে। Pterocarpa শব্দের অর্থ পাখা যুক্ত ফল।

এই সুন্দর বৃক্ষ জাতীয় গাছটি আসাম, বার্মা ও পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশের আদিবাসী। অনেক সময় বাগানে শোভা বর্দ্ধনকারী উদ্ভিদ হিসাবে এর চাষ করা

হয়। তবে সমতল ভূমিতে এই গাছ বিশেষ ভালো হয় না এবং সুন্দর ফুলও ফোটে না। ত্রিপুরার পাহাড় অঞ্চলে এই গাছ রয়েছে।
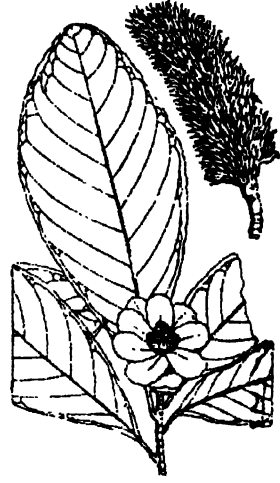
এই চিরসবুজ বৃক্ষের উপরিভাগ ডালপালা যুক্ত, অনেকটা গোলাকার, পাতা সরল, আকারে বেশ বড় ও সুন্দর,প্রকৃতি অনেকটা চামড়ার মত, বোঁটার দিকে ক্রমশঃ সরু। সুন্দর গন্ধযুক্ত সাদা ফুলে ছয়টি পাপড়ি থাকে। ফুলের ব্যাস ৫-৯ সেমি এবং তারা শাখার আগায় ছোট কিন্তু দৃঢ় বোঁটা দিয়ে যুক্ত। গুচ্ছিত ফলরাশি একটি লম্বা দণ্ডে সাজানো থাকে। এপ্রিল-মে মাসে গাছে ফুল ফোটে। বীজ কমলা রঙের।

আসামের স্থানীয় অধিবাসীরা এই গাছের মুকুলাবরণ দাঁত ও মাড়ি কাল করার জন্য ব্যবহার করে। কাঠ হাল্কা, সাদা, মোটামোটি শক্ত। বাক্স ইত্যাদি তৈরীতে ব্যবহার হয় তবে ভিজে আবহাওয়ায় এই কাঠে তৈরী জিনিস দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

চাঁপা

Michelia champaca L.

গোত্র ঃ Magnoliaceae

বৈজ্ঞানিক নামের প্রথম শব্দটি এসেছে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী পি এ মাইকেলের নাম হতে, এবং দ্বিতীয় শব্দটি এসেছে সংস্কৃত চম্পক শব্দ হতে। বিভিন্ন সাহিত্যে চম্পক

কলির সঙ্গে আঙ্গুলের তুলনা আমরা দেখতে পাই।

এ গাছের আদি জন্মভূমি ভারত ও মালয়। চির সবুজ বৃক্ষ। কচি ডালপালা রেশম কোমল। পাতা ২০-২৫ সেমি লম্বা প্রশস্থ ভল্লাকৃতি। কোন কোন গাছের ফুল সাদা রঙের হয়ে থাকে। তার নাম *Michelia champaca* var. *alba* / alba শব্দের অর্থ সাদা। ফল গুচ্ছাকার। বীজ লালচে বা বাদামী রঙের।

আগরতলা শহরের রাস্তার ধারে বা বাগানে এই গাছ দেখা যায়। পাতা গাঢ় সবুজ, উপরের দিক বেশ চক্চকে। কচিপাতা মুকুলাবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। মার্চ মাস পর্যন্ত গাছে নূতন পাতা গজায়। ফুল এপ্রিল মাস হতে জুলাই-আগষ্ট পর্যন্ত ফোটে। ফুলের লোভে আবাল, বৃদ্ধ বনিতা সবাই আকৃষ্ট হয় এবং এর ফুল পাড়তে গিয়ে মাঝে মাঝে দুর্ঘটনাও ঘটে। এর ফুল নাকি ভগবান বিষ্ণুর বেশ প্রিয়। সুগন্ধি ফুলের জন্য অনেকে এই গাছ লাগান।

এই গাছের ভেষজ গুণও রয়েছে। গাছের ছাল টনিক হিসাবে জ্বরে উপকারী। ফুল কফ ও বাতে উপকারী। ফুল হতে পাওয়া তেল বাতে মালিশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বীজ ও ফল পায়ের গোড়ালী ফাটার উপকারী।

সেদ্ধ ফুল হতে এক প্রকার হলদে রং পাওয়া যায়। এর কাঠ বেশ নরম ও বেশ পালিশ নেয় এবং দীর্ঘস্থায়ী এজন্য নানা আসবাব তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে। শ্রীলঙ্কায় বুদ্ধমূর্ত্তি তৈরীতে এর কাঠ ব্যবহৃত হয়।

বীজ হতে এর বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■
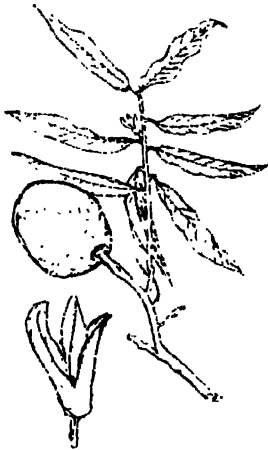
নোনা

Annona reticulata L.

গোত্র ঃ Annonaceae

অন্য নাম ঃ রাম ফল / নোনা আতা।

গণ সূচক Annona শব্দটির অর্থ বছরের ফলন। reticulata অর্থ জালিকাকার, ইহা ফলের উপরের অস্পষ্ট জালিকার দাগকে বুঝায়।

ছোট বৃক্ষ জাতীয় এই গাছটি আমেরিকার

আদিবাসী, তবে ভারতের বহু অঞ্চলে এখন এর চাষ হয়। ত্রিপুরা রাজ্যেও এই গাছ অনেক রয়েছে। আগরতলা শহরেও অনেক বাড়ীতে এই গাছ দেখা যায়।

আতা গাছের সঙ্গে এর পার্থক্য এর পাতা অনেক লম্বাটে ফলের গা সমান, অবশ্য তাতে অস্পষ্ট জালিকাকার খাঁজ রয়েছে।

অক্টোবর পর্যন্ত গাছে ফুল আসে এবং সারা শীতকাল ফুল ফোটে। অনেক সময় জুন মাসেও ফুল দেখা যায়। ফুলগুলি পাতার কক্ষ হতে বের হয়, আতার মত পাতার বিপরীত দিক হতে বের হয়না।

পাকা ফল গাঢ় বাদামী রঙের। ফলের ভেতরটা অনেকটা আতার মত তবে শাঁস অনেকটা বালির মত দানাদার এবং এর গন্ধ ততটা ভাল নয়। গরমের সময় ফল পাকে। ফলের আকার প্রাণীর হৃৎপিন্ডের মত, সেজন্য এর ইংরাজী নাম bullock's heart.

পাকা ফলে ১২.২৫ শতাংশ গ্লুকোজ ও ২ শতাংশ প্রোটিন রয়েছে। উহা পেশীর শক্তি বর্দ্ধক ও পিত্তাধিক্য প্রশমক, তবে বাত ও কফ বাড়ায়। গাছের বাকল কষায় গুণযুক্ত এবং টনিক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর পাতা, কাঁচা ফলও বীজের কীটনাশক গুণ বর্তমান।

বীজ হতে সহজে বংশ বৃদ্ধি করা যায়। ■

আতা

Annona squamosa L.

গোত্র ঃ Annonaceae

অন্য নাম ঃ সীতা ফল।

প্রজাতি সূচক squamosa অর্থ অসমান - এতে ফলে ফলের অসমান গায়ের কথা বুঝায়। এই ছোট বৃক্ষটি আমেরিকার উষ্ণ মন্ডলের আদিবাসী। বর্তমানে ভারতের অনেক স্থানে এর চাষ করা হয়। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে এই গাছ রয়েছে। আগরতলা শহরে ও অনেক বাড়ীতে আতা গাছ দেখা যায়।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই ছোট বৃক্ষটির বাকল ধূসর রঙের, পাতা সরু এবং পাতা ঘসলে তা হতে বিশেষ গন্ধ বের হয়। সবুজ রঙের ফুলগুলি ছোট বোটা হতে ঝুলতে থাকে। ফল অসমান গাত্র বিশিষ্ট গোলাকার। ফলত্বকের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উহা নরম সবুজাভ রঙের কতগুলি গোলাকার আঁশ জুড়ে যেন তৈরী। পাকা ফলে এই আঁশের মত অংশগুলি আলাধা করা যায়। ফলের মধ্যে মিষ্টি সাদা রঙের শাঁস থাকে। বীজ কাল রঙের।

এপ্রিল হতে জুলাই পর্যন্ত গাছে ফুল ফোটে। আগষ্ট হতে নভেম্বর ফলের সময়। ফলের আকর্ষণে নানা পশু পাখী গাছে জড় হয়। এজন্য পাকা ফল রক্ষায় সাবধানতা প্রয়োজন।

পুষ্টি গুণ হিসাবে এই ফলে ১৪.৫ শতাংশ গ্লুকোজ, ১৭ শতাংশ ইক্ষু শর্করা, ০.৮৭ শতাংশ প্রোটিন এবং কিছু ভিটামিন সি রয়েছে।

গাছের বিভিন্ন অংশ ঔষধি গুণযুক্ত। এর শেকড় তীব্র রেচক গুণ সম্পন্ন। পাতা ক্ষত নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। এর পাতা, বীজ ও ফলে কিছু কটু পদার্থ রয়েছে যা বিভিন্ন পোকা মাকড়ের পক্ষে বিষাক্ত। এই সব অংশ হতে কীটনাশক তৈরী হয়।

কাঠ সাদা, নরম, বিশেষ কোন কাজে ব্যবহৃত হয় না। বীজ হতে বংশ বৃদ্ধি করা হয়। ■

দেবদারু

Polyalthion longifolia(sonn) Thw

গোত্র : Annonaceae

বৈজ্ঞানিক নামের প্রথম শব্দটি এসেছে দুটি গ্রীক শব্দ হতে। Poly অর্থ অনেক, **althia** অর্থ নিরাময়। দুয়ে মিলে এই গাছের অনেক রোগ নিরাময় ক্ষমতা বুঝায়। **longifolia** অর্থ লম্বা পাতা।

এই গাছের আদি জন্মভূমি শ্রীলঙ্কা,

তবে বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন জায়গায় এর চাষ করা হয়। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে তুলনামূলক এর চাষ বেশী। আগরতলা শহরে কোথাও রাস্তার ধারে কোথাও কোন কোন বাড়ীতে এই গাছ রয়েছে। কলেজ টিলার কলেজ চত্বরে এর অনেকগুলি গাছ রয়েছে। আগরতলায় দু প্রকারের দেবদারু গাছ রয়েছে। এক জাতির গাছের কান্ডের চারদিকে ডালপালাগুলি সমকোণে বিস্তৃত। গাছের আকৃতি অনেকটা পিরামিডের মতো। অন্যটির ডালপালা নীচের দিকে ঝুলন্ত যেন প্রধান গুড়ির গায়ে লেগে রয়েছে, যাকে অবনত দেবদারু বলতে পারি। যার বৈজ্ঞানিক নাম *Polyalthia longifolia* var. *pendula.*

অনেকে দেওদার ও দেবদারুকে একই গাছ মনে করেন। কিন্তু আসলে এরা সম্পূর্ণ আলাদা। দেওদার এক প্রকার নগ্নবীজ উদ্ভিদ যা হিমালয় অঞ্চলে জন্মায়। ত্রিপুরা রাজ্যে এদের দেখা যায় না। দেবদারু আবৃতবীজ বৃক্ষ। এর কান্ড ঋজু। পাতা সুন্দর সরু ভল্লাকৃতি। কিনারা ঢেউখেলানো, হাল্কা সবুজ রঙের।

ফুল হলদেটে সবুজ, নক্ষত্রাকৃতি, বোঁটা বেশ লম্বা। সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারী হতে এপ্রিলে ফোটে। ঘন পাতার জন্য ফুল প্রায় নজরে পড়েনা। ফল ছোট ডিম্বাকৃতি, গুচ্ছাকারে একটা বড় বোঁটা হতে অনেকগুলি ফল ঝুলে থাকে। পাকা ফল হলদে বা বেগুনী রঙের। বাদুরের বেশ প্রিয় খাদ্য। ফল পাকলে গাছের তলায় শক্ত বীজ ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। বাদুরের খাদ্য হলেও দুর্ভিক্ষের সময় এই ফল মানুষের খাদ্য রূপেও ব্যবহৃত হয়।

সুন্দর ডালপালা ও পাতার জন্য এই গাছ রাস্তার ধারে লাগানো বেশ উপযুক্ত। উৎসবে বাড়ীঘর তোরণ প্রভৃতি সাজাতে এর পাতা ব্যবহৃত হয়। গাছের ছাল হতে ভাল আঁশ পাওয়া যায়।

এর কাঠ সাদা বা হলদেটে সাদা ও বেশ নমনীয়। ড্রাম, পেন্সিল, ছোটবাক্স প্রভৃতি তৈরীতে এই কাঠ ব্যবহৃত হয়।

বীজ হতে নতুন গাছের চাষ করা যায়। তবে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বেশী দিন থাকেনা। বর্ষায় বীজ হতে চারা তৈরী করে চারা একটু বড় হলে অন্যত্র লাগানো যেতে পারে। সারি করে লাগালে রোদের তাপ ও ধূলাবালি হতে বাড়ীঘরকে বাঁচায় আবার বায়ু প্রবাহ রোধক হিসাবে সুরক্ষাও দেয়। ■

কর্পূর

Cinnamomum camphora Nees & Eberm

সমার্থক নাম ঃ *Camphora offcimarum*

গোত্র ঃ Lauraceae

গণসূচক শব্দটি প্রাচীন গ্রীক নাম হতে এসেছে। Camphora শব্দটি আরবী ভাষা হতে এসেছে। Officinarum শব্দটি ল্যাটিন ভাষা হতে এসেছে, এতে শিল্পের ব্যবহার বুঝায়। এই গাছটি চীন ও জাপানের আদিবাসী। ভারতের অনেক স্থানে বাগানে কর্পূর গাছ লাগানো হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে এই গাছ রয়েছে। আগরতলার বেসিক ট্রেটিং কলেজ চত্বরে কয়েক বছর আগে একটি গাছ দেখেছি। সম্প্রতি কাঞ্চনমালায় কয়েকটি গাছ দেখেছি।

মাঝারী আকারের চিরহরিৎ বৃক্ষ। গাছের গুঁড়ি বেশী লম্বা হয়না এবং খুব নীচুহতে তাতে ডালপালা গজায়। ডালপালা ঘন সন্নিবদ্ধ। বাকল ধোয়াটে বাদামী রঙের, পাতা আকারে ছোট। উপরের দিকে চক্‌চকে সবুজ, নীচের দিকে হাল্কা রঙের, পাতায় বেশ সুন্দর গন্ধ রয়েছে। থেত্‌লানো পাতায় এই গন্ধ বেশী পাওয়া যায়। হলদে রঙের সুগন্ধি ফুলগুলি গুচ্ছবদ্ধ ভাবে পাতার কক্ষে জন্মায়। ফল বেরী জাতীয়। প্রতি ফলে একটি করে বীজ থাকে।

এই গাছের পাতা ও কাঠ হতে আসল জাপানী কর্পূর পাওয়া যায়। পাতা কাঠ বা শেকড়ের টুকরো জলে সিদ্ধ করে কর্পূর বের করা হয়। অবশ্য এই গাছ ছাড়াও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতির গাছ হতেও কর্পূর পাওয়া যায়। ঔষধ তৈরী ও পোকা মাকড় হতে বিভিন্ন দ্রব্য সংরক্ষণে কর্পূরের ব্যবহার রয়েছে। মালয় বা বোর্ণিও হতে আসা কর্পূর অন্য প্রজাতির গাছ হতে পাওয়া যায় যা ত্রিপুরা রাজ্যে জন্মায় না।

ভেষজ গুণ হিসাবে এই গাছের বিভিন্ন অংশ সর্দি, পেটের পীড়া ও হৃদযন্ত্রের পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। প্রদাহ বাত, থেতলানো বাত প্রভৃতিতে কর্পূরের বাহ্যিক ব্যবহার রয়েছে।

কাঠ শক্ত, ধুসরসাদা রঙের এবং কর্পূর গন্ধ যুক্ত। বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা হয়। ■

তেজপাতা

Cinnamomum tamcala (F. Ham) Nees & Ebern

সমার্থক নাম ঃ *Laurus cassia*

গোত্র ঃ Lauraceae

গণসূচক শব্দটি এসেছে প্রাচীন গ্রীক নাম হতে। প্রজাতি সূচক শব্দ ভারতীয় ভাষা হতে নেওয়া। এই গাছটি পূর্ব হিমালয়, বার্মা ও আসামের আদিবাসী। উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে একে বাগানে লাগানো হয়। ত্রিপুরায় এই গাছ রয়েছে। আগরতলা ও তার আশেপাশে অনেকের বাড়ীতে তেজপাতা গাছ রয়েছে। পাতা সহ গাছের ডালা অনেক সময় স্থানীয় বাজারে বিক্রি হতে দেখা যায়।

মাঝারি আকারের চির সবুজ বৃক্ষ। বাকল পাতলা বাদামী রঙের এবং একটু কোক্ড়ানো ধরনের। পত্রবিন্যাস অনেকটা বিপরীত। পাতার আকারে অনেকটা পার্থক্য দেখা যায়। তবে আগার দিকের পাতা ক্রমশঃ সরু হয়। পরিণত পাতার উপরের দিগ চকচকে সবুজ, নীচের দিক একটু হাল্কা রঙের। পাতার গোড়া হতে তিনটি প্রধান শিরা বের হয় এবং এরা বেঁকে গিয়ে পাতার আগার দিকে একত্র হয়।

শীতের সময় গাছে ফুল আসে। হলদেটে সাদা ফুলগুলি ডালার আগার দিগে গুচ্ছবদ্ধভাবে পাতার কক্ষে জন্মায়। ফল কাল রঙের, মাংসল বেরী জাতীয়। প্রতি ফলে একটি শক্ত বীজ থাকে।

পাতায় একটি বিশেষ গন্ধ রয়েছে। বিভিন্ন তবকারী রান্নার কাজে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। এই গাছের বাকল দারুচিনির সাথে ভেজাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গন্ধযুক্ত মদ্য প্রস্তুতে এর ব্যবহার রয়েছে।

পাতা ও গাছের বাকল চামড়া ট্যান করার কাজে ব্যবহৃত হয়। পাতা ও বাকল হতে পাওয়া তেল সাবান শিল্পে ব্যবহৃত হয়। কাঠ বেশ শক্ত তবে বিশেষ কোন কাজে ব্যবহৃত হয় না। ভেষজ গুণ হিসাবে পেটের ব্যাথা ও হজমের গোলমালে পাতা ও বাকলের ব্যবহার হয়ে থাকে। বীজ হতে বংশ বৃদ্ধি করা যায়। ■

দারুচিনি

Linnamomum zeylonernicum Blume

সমার্থক নাম ঃ ***C. verum***

গোত্র ঃ Lauraceae

প্রজাতি সূচক শব্দে সিংহল বা শ্রীলঙ্কা জাত বুঝায়, যা এই গাছটির আদি বাসস্থান। শ্রীলঙ্কা আদি বাসস্থান হলেও দক্ষিণ ভারতে পনেরোশ মিটার পর্যন্ত উচ্চতায় এই গাছটিকে জন্মাতে দেখা যায়। তবে নিম্নভূমিতেও এর সংখ্যা কম নয়। ভারতের অন্যান্য স্থানে এই গাছ লাগানো হয়। ত্রিপুরায় এই গাছ রয়েছে। সম্প্রতি সেকেরকোটের কাছে কাঞ্চনমালায় কয়েকটি বড় দারুচিনি গাছ দেখেছি।

চির সবুজ বৃক্ষ, গাছটি ছয় থেকে আট মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। পাতা তুলনামূলক বড়, অনেকটা ডিম্বাকৃতি, পুরু, চর্মবৎ, আগা ছুঁচালো, পাতার উপরিভাগ চকচকে সবুজ, নিম্নভাগ হাল্কা রঙের। প্রতি পাতায় তিন থেকে পাঁচটি শিরা দেখা যায়।

ফুল আকারে ছোট। রোমশ গুচ্ছে সাজানো। ফল একটু লম্বাটে বা ডিম্বাকৃতি। পাকা ফল কালচে গোলাপি রঙের। এক বীজ যুক্ত।

বড় গাছ হতে ডালা কেটে তাদের বাকল আলাদা করে শুকিয়ে নেওয়া হয়, যা দারুচিনি নামে পরিচিত। মশলা হিসাবে এর ব্যবহার রয়েছে। দারুচিনি ঔষধি গুণযুক্ত। পেটের পীড়া, বমন প্রভৃতিতে উপকারী।

বাকল হতে পাওয়া তেল দারুচিনি তেল নামে পরিচিত এবং উহাতে ভেষজগুণ আছে। হজমের গোলমাল, অম্বলের ব্যথা প্রভৃতিতে উপকারী। এছাড়া কয়েক প্রকার জীবাণু ও ছত্রাক নাশক গুণও এর রয়েছে।

পাতা হতে পাওয়া তেল সুগন্ধি প্রস্তুতে ও মিষ্টি দ্রব্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সাবান শিল্পেও এর ব্যবহার রয়েছে। বাত রোগেও এই তেল উপকারী।

আমাদের দেশে প্রচুর দারুচিনির চাহিদা রয়েছে। দক্ষিণ ভারত ছাড়াও আসামেও এই গাছ ভালো জন্মায়। ত্রিপুরার পরিবেশ ও জলবায়ুর সঙ্গে আসামের জলবায়ুর মিল থাকায় এ রাজ্যেও বাণিজ্যিক ভাবে দারুচিনি চাষের চেষ্টা করা যায়। ■

কুকুর চিতা

Litsea glutinosa (Laur) C.B. Robinson

গোত্র ঃ Lauraceae

গণ সূচক নাম জাপানী শব্দ হতে নেওয়া। প্রজাতি সূচক নামের অর্থ চটচটে পদার্থ যুক্ত, যা এই গাছের পাতা বা বাকলে পাওয়া যায়। এই গাছ ভারত সহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার উষ্ণমন্ডলের আদিবাসী। ত্রিপুরা রাজ্যের সদর ও উদয়পুর বিভাগে বিভিন্ন স্থানে এই গাছ পাওয়া যায়। আগরতলার কলেজটিলা, ইন্দ্রনগর প্রভৃতি অঞ্চলে এর কিছু গাছ রয়েছে।

ছোট আকারের চির সবুজ বৃক্ষ। বাকল কিছুটা বাদামী রঙের, পাতা সরল। পাতার আকারে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। পাতার নীচের দিক অনেকটা রূপালী রঙের। উপরের দিক সবুজ। ছোট ফুলগুলি ৪-৬ টিমিলে একটি মুন্ডকের মত পুষ্পবিন্যাস তৈরী করে, যা দেখতে একটি ফুলের মত দেখায়। ফুল একলিঙ্গ। দুজাতের ফুল আলাদা গাছে জন্মায়। ফুল আকারে ছোট হলেও ফুটলে দেখতে সুন্দর দেখায়। ফুটন্ত ফুলে হলদে রঙের পুংকেশরগুলি বাইরে বের হয়ে থাকে। ফল গোলাকার বেরী জাতীয়। পাকা ফল কালো রঙের। মে-জুন মাসে গাছে ফুল ফুটতে শুরু করে। এপ্রিলে গাছে নতুন পাতা গজায়।

ফল হতে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়। যা বিভিন্ন দেশে মোম ও সাবান তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।

কাঠ মোটামুটি শক্ত ও স্থায়ী। সহজে প্রকৃয়াজাত করা যায় এবং এতে পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়।

মৌমাছিকে এর ফুল হতে মধু সংগ্রহ করতে দেখা যায়। ভেষজ গুণ হিসাবে ফুল হতে পাওয়া তেল বাতে উপকারী। পাতা ও শেকড়ের রস মূত্রকৃচ্ছতা, পেটের পীড়া প্রভৃতি রোগে স্থানীয়ভাবে ব্যবহার করতে দেখা যায়।

রাজ্যের বন বিভাগের খবর অনুযায়ী এই গাছের বাকল ধুপকাঠি তৈরীর জন্য সাম্প্রতিককালে বর্হিরাজ্যে চালান হচ্ছে এবং অত্যধিক বাকল সংগ্রহের ফলে বেশ কিছু গাছ মারা গেছে। ■

বড় কুকুর চিতা

Litsea monopetala (Roxb) Pers

সমার্থক শব্দ ঃ *L.polyantha*

গোত্র ঃ Lauraceae

প্রজাতি সূচক শব্দে এক পাপড়িযুক্ত বা পাপড়িগুলি একে অন্যের সঙ্গে জুড়ে যাওয়া বুঝায়।

এই বৃক্ষটি ভারত, বার্মা, জাভা, চীন প্রভৃতি দেশের উষ্ণমন্ডলের আদিবাসী। ত্রিপুরা রাজ্যের চড়িলাম ও দশদা অঞ্চলে এই গাছ রয়েছে। ছোট চির সবুজ বৃক্ষ বা গুল্ম জাতীয় গাছ। গাছের কচি ডালা ও পাতার নীচের দিকে মরচে রঙের রোমে ঢাকা। বাকল মসৃণ, ধূসর রঙের। পরিণত কান্ডের বাকল ক্রমশঃ কালচে রঙের হয়ে গাছ হতে খসে পড়ে। গরমের সময় গাছে নূতন পাতা গজায়।

পাতার কক্ষে ছোট ছোট ফুলগুলি ছোট মুন্ডক পুষ্পবিন্যাসে সাজানো থাকে। ফুল একলিঙ্গ। দু জাতের ফুল আলাদা গাছে জন্মায়। ফেব্রুয়ারীতে গাছে ফুল ফোটা আরম্ভ হয়। বর্ষায় ফল পাকে। ফল ডিম্বাকৃতি, পাকা ফল কাল রঙের। থেতলানো পাতায় তেজপাতার মত গন্ধ পাওয়া যায়। পাতার নীচের দিকের শিরাগুলি বেশ স্পষ্ট।

ফল হতে পাওয়া তেল মোম ও মলম প্রস্তুতে ব্যবহার হয়। থেতলানো ফল কাটা ছেড়া ইত্যাদিতে উপকারী। শেকড় চূর্ণ ভেষজ গুণ যুক্ত।

কাঠ নরম, দীর্ঘস্থায়ী নয়। খুব তাড়াতাড়ি পোকার আক্রমণে নষ্ট হয়ে যায়। তবে কৃষির যন্ত্রপাতি তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে।

আসামে মুগা রেশম তৈরীতে রেশম কীটকে এই গাছের পাতা খাওয়ানো হয়। ■

চালতা

Dillenia indica L.

গোত্র ঃ Dilleniaceae

নামের প্রথম অক্ষর এসেছে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী জে জে ডাইলেনিয়াসের নাম হতে, আর ইন্ডিকা অর্থ ভারতীয়।

এই বৃক্ষটি পশ্চিমবাংলা, বিহার, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে প্রচুর পাওয়া যায়। ভারতের বাইরে ইন্দোচীন, বোর্নিও, জাভা, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, নেপাল প্রভৃতি দেশে এর দেখা পাওয়া যায়। ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বুনো অথবা চাষ করা অবস্থায় এই গাছ দেখা যায়। আগরতলা শহরেও কোন কোন বাড়ীতে চালতা গাছ রয়েছে। আই টি আই রোডে ইন্দ্রনগর কালীবাড়ীর কাছে রাস্তার উপর একটি গাছ রয়েছে।

মাঝারি আকারের চিরসবুজ এই গাছের গুড়ি বেশী লম্বা হয় না। তবে ডালপালা অনেকটা ছড়ানো। বাকল লালচে রঙের, মসৃণ। বাকলের টুকরা প্রায়ই গাছ হতে খসে পড়ে। পাতা বেশ চওড়া, স্পষ্ট শিরাযুক্ত, কিনারা খাজকাটা বোঁটা ছোট।

বড় আকারের সাদা ফুল একক ভাবে শাখার আগায় পাতার মাঝে হয়ে থাকে। পুরু গোলাকার বৃতিগুলি ফলকে ঢেকে থাকে। ফলে অনেক বীজ ও চটচটে শাঁস দেখা যায়।

চিরসবুজ সুন্দর গাছটি বুনো অবস্থায় ও সহজে আমাদের নজর কাড়ে। জুন জুলাই পর্যন্ত বড় সাদা ফুলে ফুলে গাছটি ঢেকে যায়। তবে সাদা পাপড়িগুলি অল্পকিছুদিনের মধ্যে ঝরে যায় এবং গোল সবুজ ফলগুলি গাছ হতে ঝুলতে থাকে।

মাংসল বৃতিগুলি অম্ল স্বাদযুক্ত। কাঁচা বা রান্না করে এদের খাওয়া যায়। এ হতে জেলীও তৈরী হয়। কোন কোন জাতের ফল বেশ মিষ্টি। তবে ছিবড়ের জন্য একে অনেকে পছন্দ করে না। সেপ্টেম্বর অক্টোবর পর্যন্ত ফল পাকে।

কাঠ বেশ শক্ত। বন্দুকের কুদা, বিভিন্ন অস্ত্রের হাতল, বরগা, নৌকা প্রভৃতি তৈরীর কাজে এর ব্যবহার রয়েছে। জলে রেখে দিলে এই কাঠ কাল রঙের হয় এবং এই অবস্থায় তারা দীর্ঘস্থায়ী হয়। এর কাঠ হতে ভাল কাঠ কয়লা পাওয়া যায়। অনেক সময় বিভিন্ন পশুর শিং, হাতির দাঁত প্রভৃতি হতে তৈরী সামগ্রী চালতা পাতায় ঘসে পালিশ করা হয়।

চালতা পাতা ও বাকল ধারক গুণ যুক্ত। ফল বিরেচক, কাশিতে এর ব্যবহার রয়েছে। এছাড়া জ্বরে ফলের রস হতে তৈরী পানীয় উপকারী।

বীজ হতে বংশ বৃদ্ধি করা যায়। আর্দ্র জমিতে এই গাছ ভাল জন্মায়। বর্ষায় বীজ লাগাতে হয়।

Dillenia গণভূক্ত অন্য একটি প্রজাতি *D. pentagyna* Roxb. এই রাজ্যের পর্ণমোচী বনে পাওয়া যায়। স্থানীয় ভাবে হাড়গাজা নামে পরিচিত এই গাছের কাঠ খুটি ইত্যাদির কাজে ব্যবহৃত হয়। ■

দেবকাঞ্চন

Bauhina purpurea L.

গোত্র ঃ Leguminosae

উপগোত্র ঃ Caesalpinoidea

গণ সূচক শব্দটি এসেছে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী জমজ ভাই জন ও কেসপার বউহিনের নাম অনুসারে। প্রজাতি সুচক purpurea শব্দের অর্থ লালচে ফুল যুক্ত।

হিমালয়ের পাদদেশে এই বৃক্ষটি তরাই অঞ্চলে অনেক দেখা যায়। ভারতের পশ্চিমে সিন্ধুনদীর তীর হতে পূর্বে আসাম অঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্র এই গাছ দেখা যায়। দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের পার্বত্য অঞ্চলেও এই গাছ রয়েছে। ত্রিপুরায়ও এ গাছ পাওয়া যায়। আগরতলায় বেশ কিছু বাড়ীতে দেব কাঞ্চন গাছ রয়েছে।

মাঝারি আকারের প্রায় চির সবুজ বৃক্ষ। বহু শাখা প্রশাখা যুক্ত এই গাছের উপরিভাগ অনেকটা গোলাকার। বাকল বেশ পুরু, অনেকটা মসৃণ, ছাই বা হাল্কা বাদামী রঙের। পাতা চওড়ার চেয়ে লম্বায় বড় এবং তা আগার দিকে দুটি অংশে বিভক্ত। উটের পায়ের পাতার মত চেহারার পাতা Bauhinia গণভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির একটি বৈশিষ্ট্য। পাতার গোড়া হতে ৯-১১ টি শিরা উৎপন্ন হয়ে ফলকের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ফুল গোলাপী বা গোলাপী মিশ্রিত বেগুনী রঙের, ফুলে পাঁচটি পাপড়ি থাকে।

কখনো বা একটি পাপড়ির নিচের দিক সাদা রঙের হয়। আগষ্ট হতে নভেম্বরে ফুল ফোটে। ফল লম্বা চ্যাপ্টা শিম্বিজাতীয়। শুকনো ফল হঠাৎ ফেটে গিয়ে বীজগুলি বেশ দূরে ছড়িয়ে পড়ে।

এই গাছের বাকল ট্যানিং ও রঙ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। কখনো কখনো বাকল হতে তন্তু উৎপাদন করা হয়। ফুল ও ফলের কলি সব্জী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মূলের বাকল বিষাক্ত, পাতা ভাল পশুখাদ্য। কাঠ বেশ শক্ত, কৃষির যন্ত্রপাতি তৈরীতে ব্যবহার হয়। তবে এই গাছটি প্রধানতঃ শোভাবর্ধনকারী উদ্ভিদ হিসাবে বাগানে বা রাস্তার ধারে লাগানোর উপযুক্ত।

এর কিছু ভেষজ গুণও রয়েছে। বাকল কষায় ক্ষত ধোয়ার জন্য এর ব্যবহার রয়েছে। ফুল রেচক। ফুল ও বাকল ফোড়ায় উপকারী। কান্ডের বাকল আমাশয়ে উপকারী।

বীজ হতে সহজে বংশবৃদ্ধি করা যায়। বর্ষার শুরুতে বীজ লাগাতে হয়। ৪-১০ দিনের মধ্যে নূতন চারা বের হয়। বর্ষার শেষ দিকে এই চারা অন্যত্র রোপণ করা যায়। জল জমে না এমন মাটিতে এ গাছ ভাল হয়। শীতের সময় ফুল পাওয়া যায় বলে অনেকে এই গাছ যত্ন করে লাগান। ■
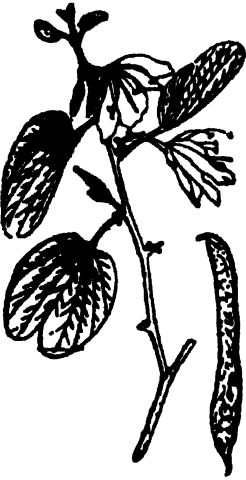
শ্বেত কাঞ্চন

Bauhinia variegata L.

সমার্থক নাম ঃ ***B candida***

গোত্র ঃ **Leguminosae**

উপগোত্র ঃ **Caesalpinoideae**

প্রজাতি সূচক Variegata শব্দে বিচিত্র রঙের ফুল বুঝায়, আর Candida শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ সাদা।

ভারতের আদিবাসী এই গাছটি আমাদের দেশে সর্বত্র পাওয়া যায়। বিশেষ করে শুকনো পাহাড়ী অঞ্চলে। ত্রিপুরা রাজ্যেও অনেককে পূজার ফুলের জন্য বাড়ীতে এই গাছ লাগাতে দেখা যায়। আগরতলা শহরে ও তার আশেপাশে অনেক বাড়ীতে এই গাছ রয়েছে।

ছোট বা মাঝারি আকারের বৃক্ষজাতীয় গাছ। এর গুড়ি বেশ ছোট। বাকল গাঢ়

বাদামী রঙের, একটু খসখসে। পাতা উপরের দিকে প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত দু ভাগে বিভক্ত। প্রতি পাতায় ১১-১৫ টি শিরা রয়েছে, যা ফলকের গোড়া হতে আরম্ভ করে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে থাকে। পাতা লম্বার চেয়ে বেশী চওড়া। শীতে গাছের পাতা ঝরে যায়। জানুয়ারীর শেষ হতে পত্রশূন্য গাছে ফুল ফুটতে শুরু করে।

ফুল সাদা রঙের, সাদা পাপড়িতে হলদে দাগ থাকে। কখনো কখনো ফুলের রঙ হাল্কা গোলাপী বা বেগুনী হয়ে থাকে। ফুলে ফুলে ভরা গাছ শীতের দিনে বেশ সুন্দর দেখায়। এই গাছের ফুলের পাপড়ি রক্ত কাঞ্চনের ফুলের পাপড়ির চেয়ে চওড়া। ফল লম্বা, সরু এবং কিছুটা বাঁকানো। প্রতি ফলে ১০-১৫টা বীজ থাকে।

এর কাঠ বেশ শক্ত। কৃষির যন্ত্রপাতি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। ফুলের কলি সব্জি হিসাবে খাওয়া যায়। বাকল রং করা, ট্যানিং ও তন্তু উৎপাদনের কাজে লাগে। কোন কোন অঞ্চলে পাতা বিড়ি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। বীজ হতে তেল পাওয়া যায়। ভেষজ গুণ হিসাবে বাকল কষায়, নানা রোগে এর ব্যবহার রয়েছে, বিশেষ করে হাঁপানী ও ক্ষত প্রভৃতি রোগে। কুড়ি ও মূল হজমের গোলমালে উপকারী। কারো কারো মতে শেকড় সাপের কামড়ে উপকারী।

বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। গাছটি দ্রুত বাড়ে। প্রথম বছরেই ৬-৮ ফুট লম্বা হয়। দ্বিতীয় বছরে গাছে ফুল ফোটে। শোভাবর্দ্ধনকারী উদ্ভিদ হিসাবে পার্কে বা খোলা জায়গায় লাগানোর উপযোগী।

আমাদের এই রাজ্যে কাঞ্চনের আরো কয়েকটি প্রজাতি জন্মায়। যেমন *Bauhinia acuminata* এবং *B. malabarica* এছাড়া লতানে কাঞ্চনের একটি প্রজাতি *B. anguine* এ রাজ্যে জন্মায়। সাধু বা ফকিরদের ব্যবহৃত বিচিত্রভাবে বাঁকানো লাঠি এই লতানে কাঞ্চনের কান্ড হতে পাওয়া যায়। ■

সোনাল

Cassia fistula L.

গোত্র ঃ Leguminosae

উপগোত্র ঃ Caesalpinoidea

অন্যনাম ঃ বানর লাঠি

Cassia একটি গ্রীক শব্দ। সম্ভবতঃ সুগন্ধি বাকলযুক্ত বুনো দারচিনি বুঝাতে

এই শব্দ ব্যবহার করা হতো। fistula শব্দের অর্থ বাঁশী, এতে বাঁশীর মত ফলকে বুঝায়। দেশের সর্বত্র পর্ণমোচী অরণ্যে এবং সমতল ভূমিতে এই ভারতীয় গাছটি জন্মায়। এর পুষ্পিত গাছের মনোরম শোভার জন্য কোন কোন শহরে রাস্তার ধারে এই গাছ লাগানো হয়েছে। বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতিতে এরূপ দেখা যায়। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে সোনাল গাছ রয়েছে। আগরতলায় কলেজটিলায় কলেজের চত্বরে কয়েক বছর আগেও বেশ কিছু সোনাল গাছ ছিল যা এখন আর নেই। ইন্দ্রনগর আই টি আই চত্বরে একটি গাছ রয়েছে। ভারত ছাড়া বার্মা, জাভা, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন প্রভৃতি স্থানে এই গাছ জন্মায়।

মাঝারি আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ। বাকল মসৃণ। কচি কান্ড ও ডাল-পালা সবুজ। পরিণত কান্ডে তা বাদামী রং ধারণ করে। পাতা বেশ বড় যৌগিক। পত্রক গুলি মধ্য শিরায় জোড়ায় জোড়ায় সাজানো। শীতে পাতা ঝরে যায়। এপ্রিলের শেষের দিকে বা মে মাসে পত্রহীন গাছে হলদে রঙের ফুলের গোছা ঝুলতে দেখা যায়। ফল নলাকার ৫০-৬০ সেমি লম্বা। পাকা অবস্থায় কালো রঙের হয়। ফলের মধ্যে অনেকগুলি চ্যাপ্টা বীজ কাল রঙের মিষ্টি শাঁসে ঢাকা থাকে। এই শাঁস জোলাপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর সার কাঠ বেশ শক্ত, দীর্ঘস্থায়ী, মাটির নীচেও অনেকদিন অবিকৃত থাকার জন্য ঘরের খুঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কাঠ হতে কৃষি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির হাতল তৈরী হয়।

গাছের বিভিন্ন অংশ বিশেষ করে ফল ভেষজ গুণযুক্ত। ফলের শাঁস রেচক গুণ সম্পন্ন। শেকড় টনিক গুণযুক্ত ও জ্বরে উপকারী। বাকল ট্যানিং-এ ব্যবহার করা হয়। ফলের শাঁস গ্রাম দেশে তামাক মাখার কাজে ব্যবহৃত হয়। ফুল ও কচি পাতা খাদ্যোপযোগী। শিয়াল, ভল্লুক, বানর প্রভৃতি এর ফল খায় এবং এদের মাধ্যমে বীজ বিস্তার লাভ করে। কোন কোন অঞ্চলে মন্দির সাজানো ও পূজার জন্য এর ফুল ব্যবহৃত হয়।

বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। তবে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা কম, এজন্য বেশী বীজ লাগানো দরকার। বীজ আবরণ শক্ত, এজন্য লাগানোর আগে পাঁচ মিনিট গরম জলে বীজ ভিজিয়ে নিলে তাড়াতাড়ি চারা গজায়। চারাতে অনেক সময় শুয়োপোকার আক্রমণ হয়। গাছ খরা সহনশীল। বৃদ্ধির হার কম। ৫/৬ বছরে গাছে ফুল আসে।

গোলাপি কেশিয়া

Cassia nodosa F.Ham ex Roxb.

গোত্র ঃ Leguminosae

উপগোত্র ঃ Caesalpinoidea

Cassia একটি গ্রীক শব্দ, গণ সূচক এই শব্দটি সম্ভবত সুগন্ধি বাকলযুক্ত বুনো দারচিনি বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রজাতি সূচক শব্দের অর্থ গ্রন্থিযুক্ত। এই প্রজাতির গাছের গুড়ি বা ডালপালা গ্রন্থিযুক্ত হওয়ায় এরূপ নামকরণ হয়েছে।

এই বৃক্ষটি মালয়, বার্মা, বাংলাদেশের সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসী। পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই গাছ দেখা যায়। ত্রিপুরাতেও এই গাছ রয়েছে। আগরতলা ও তার আশেপাশে রাস্তাঘাটে বেশ কিছু এই প্রজাতির গাছ রয়েছে।

এই সুন্দর গাছটি প্রায় চির সবুজ। খোলা জায়গায় লাগালে এই গাছের গুঁড়ি নাতিদীর্ঘ ও গ্রন্থিবহুল হয়। ডালপালা চারদিকে বেশ ছড়ানো থাকে অনেকটা খোলা ছাতার মত। ছোট ছোট ডালপালা প্রায় মাটিতে এসে পড়ে। তবে অন্য গাছের সঙ্গে ঘনভাবে লাগালে গুঁড়ি অনেকটা লম্বা হয়। বাকল ধূসর বা হলদেটে বাদামী রঙের। কচি অবস্থায় বাকল মসৃণ থাকে,পরে তাতে সরু গভীর অনুভূমিক ফাটল দেখা দেয়। পাতা যৌগিক পক্ষল, পত্রকগুলি সূচালো, যুগ্মভাবে বিন্যস্ত। গোলাপি ফুল বিশিষ্ট অন্য প্রজাতির কেশিয়ার তুলনায় এ প্রজাতির পাতা বেশ বড় আকারের।

গোলাপি রঙের ফুলগুলি বড় আকারের খোলা পুষ্পবিন্যাসে সাজানো থাকে। ফুলের রঙ গোলাপি হতে ক্রমশঃ সাদায় বদলে যায়। ফুলের পাপড়িগুলি সরু এবং এদের দুই প্রান্ত সূচালো। ফল নলাকার, শিম্বিজাতীয়। ফলের শাঁসে দুর্গন্ধ থাকে। মার্চ হতে ফুল ফোটা আরম্ভ হয় এবং সারা বর্ষায় গাছে ফুল ফোটে। অন্য প্রজাতির গোলাপী কেশিয়া এক বা দুই মাসের বেশী ফুল ফোটে না। এপ্রিল পর্যন্ত গাছে নতুন পাতা গজায়। কাঠ বেশ শক্ত। কোমল কাঠ হাল্‌কা বাদামী এবং সার কাঠ লাল রঙের।

বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। বীজ লাগানোর আগে পাথরে ঘষে বীজত্বক হাল্‌কা করে নিলে অঙ্কোরোদগম ভালো হয়। ছোট চারা প্রায় নুয়েপড়ে এজন্য খুঁটি দিয়ে তাকে রক্ষা করতে হয়। ■

বার্মার গোলাপী কেশিয়া

Cassia renigera Wall ex Benth

গোত্র ঃ **Leguminosae**

উপগোত্র ঃ **Caesalpinoidea**

প্রজাতি সূচক শব্দে এই গাছের বৃক্কাকার উপপত্রকে বোঝায়।

নাম হতে এই বৃক্ষটিকে বার্মার আদিবাসী হিসাবে চেনা যায়। আমাদের দেশেও বাগানে মাঝে মাঝে এই গাছ লাগানো হয়ে থাকে। মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুতে এই গাছ প্রায়ই দেখা যায়। ত্রিপুরা রাজ্যেও কোথাও কোথাও এ গাছ রয়েছে। ছোট পর্ণমোচী এই গাছটি প্রায় ৬ মিটার লম্বা হয়ে থাকে। ডালপালা ছড়ানো এবং ডাল অনেক সময় নীচের দিকে ঝুলতে থাকে। বাকল মসৃণ, ধূসর বাদামী রঙের এবং এতে কর্ক জাতীয় বস্তুর আস্তরণ থাকে। পাতা যৌগিক, পক্ষল, পত্রকগুলি সরু এবং তাদের অগ্রভাগ ভোঁতা। পত্রক যুগ্মভাবে মধ্য শিরায় বিন্যস্ত।

এপ্রিল হতে মে মাসে পত্রহীন শাখায় সুগন্ধি গোলাপী ফুল দেখা দেয়। কেশিয়ার অন্য প্রজাতির সঙ্গে এর পার্থক্য হল প্রতি ফুলের গোড়ায় একটি করে মঞ্জরী পত্রের উপস্থিত এবং এই প্রজাতিতে ফুলের বৃতি ও দল রেশমী রোমে ঢাকা থাকে।

ফল লম্বা নলাকার, শিম্বিজাতীয়, কাল রঙের। সুন্দর এই গাছটির ফুল অল্প কিছুদিনের জন্য দেখতে পাওয়া যায়। তুলনায় অন্য গোলাপী কেশীয়ায় অনেক দিন ফুল থাকে। শীতের শুরুর সঙ্গে গাছের পাতা ঝরে যায়। নেড়া গাছেই প্রথম ফুল ফোটা আরম্ভ হয়, পরে অবশ্য গাছে একই সঙ্গে নূতন পাতা ও ফুল দেখা যায়।

বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। গাছ লাগানোর ৪/৫ বছর পর ফুল ফোটে। গাছ দ্রুত বর্দ্ধনশীল। কিন্তু বেশীদিন বাঁচেনা।

বীজ বোনার আগে গরম জলে ভিজিয়ে নিতে হয়। কারণ, বীজত্বক বেশ শক্ত। এমনি বীজ লাগালে অঙ্কুরোদগম হয় না। ■

শ্যাম দেশীয় কোশিয়া

Cassia siamea Lamk.

গোত্র **:** ***Leguminosae***

উপগোত্র **:** **Caesalpinoideae**

প্রজাতি সূচক শব্দে শ্যাম দেশে আদি বাসস্থান বুঝায়।

এই বৃক্ষটি শ্যাম দেশ, মালয়, বার্মা ও দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী। এখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এর চাষ করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যেও বিভিন্ন স্থানে এই গাছ রয়েছে। আগরতলা শহরে অনেক রাস্তার পাশে হলদে ফুলের শ্যাম দেশীয় কেশিয়া গাছ দেখা যায়।

এই চির সবুজ বৃক্ষটি মাঝারি আকারের। এর বাকল প্রায় মসৃণ ধূসর রঙের, যাতে কখনো কখনো লম্বা, হাল্কা ফাটল দেখা যায়। পাতা যৌগিক পক্ষল। পত্রকগুলি সরু, আয়তাকার, মধ্য শিরায় যুগ্মভাবে বিন্যস্ত। হলদে ফুলগুলি শাখার আগায় প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে বিন্যস্ত। প্রতি ফুলে ১০ টি পুংকেশরের মধ্যে তিনটি বন্ধা এবং আকারে ছোট, ফল চ্যাপ্টা ধরনের লেগুম জাতীয়। প্রতি ফলে অনেকগুলি বীজ থাকে। ফুল ফোটার সময় বেশ লম্বা, জুন থেকে জানুয়ারী পর্যন্ত। তবে সবচেয়ে বেশী ফুল অক্টোবর মাসে দেখা যায়। ফেব্রুয়ারী মার্চ পর্যন্ত গাছে নূতন পাতা গজায়। তবে গাছ কখনো একেবারে পত্রশূন্য থাকে না।

এই সুন্দর গাছটি শোভাবর্দ্ধক উদ্ভিদ হিসাবে পথের পাশে বা অন্য জায়গায় লাগানো হয়। ঘনসন্নিবদ্ধ পাতার জন্য ছায়াতরু হিসেবে এর কদর রয়েছে।

কাঠ বেশ শক্ত ও মূল্যবান। তবে গাছের গুড়ি বেশী লম্বা না হওয়ায় কাঠ আকারে ছোট হয়. কোমল কাঠ সাদা কিন্তু সার কাঠ কাল রঙের। আসবাব পত্র তৈরী, বেড়ানোর লাঠি, মুগুর ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতির হাতল হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে। সার কাঠ ট্যানিং-এও ব্যবহৃত হয়। ফুল কখনো কখনো সব্জি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা হয়। গাছটি দ্রুতবর্দ্ধনশীল তবে বেশী দিন বাঁচে না। ডালপালা বেশ নরম। বর্ষায় পাতায় জমা জলের ভারে অনেক সময় ডালা ভেঙ্গে যায়। ঝড়ের সময় এই গাছের নীচে আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়। ■
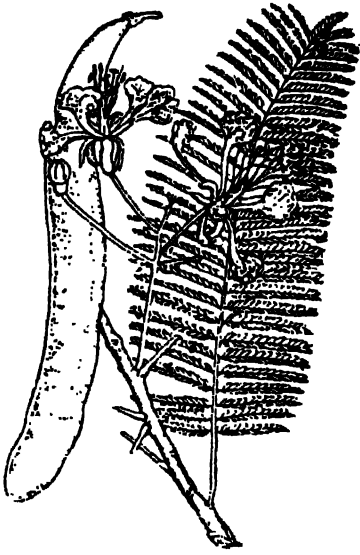
কৃষ্ণচূড়া

Delonix regia (Boj) Raf Fl.

সমার্থক নাম ঃ ***Poinciana regia***

গোত্র ঃ **Leguminosae**

উপগোত্র ঃ **Caesalpiniodea**

অন্যনাম ঃ গুলমোহর

গণ সূচক শব্দটি এসেছে দুটি গ্রীক শব্দ হতে "delos" অর্থ সুস্পষ্ট। "Onix" অর্থ নখর দুয়ে মিলে এর পাপড়ির ক্রমশঃ সরু নিম্নাংশ বোঝায়। প্রজাতি সূচক regia শব্দের অর্থ রাজকীয়। Poinciana শব্দটি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের গভর্নর উদ্ভিদ প্রেমী M.de.Poinci- র নাম অনুসারে দেওয়া হয়েছে।

এই গাছটি মাদাগাস্কারের আদিবাসী। উনবিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে মরিশাসে এই গাছ আনীত হয়। তবে ভারতে কখন এর প্রথম আগমন হয় তা সঠিক জানা যায় না। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ভারতের উদ্ভিদ উদ্যানের গাছপালার নির্দেশক তালিকায় কৃষ্ণচূড়ার নাম দেখা যায়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বোম্বাই অঞ্চলে এই গাছ জন্মানোর খবর জানা গেছে। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ পাওয়া যায়। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে রাস্তার ধারে এই গাছ রয়েছে। আগরতলায় বিভিন্ন রাস্তার ধারেও কৃষ্ণচূড়া গাছ দেখতে পাই।

এই মাঝারি আকারের বৃক্ষটি ৫-১০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। মাটির গুণাগুণের উপর এবং গাছের বয়সের সঙ্গে এর উচ্চতা, আকার প্রভৃতি নির্ভর করে। শুকনো আবহাওয়ায় এবং সমুদ্র তীরে ও এই গাছ জন্মায় তবে এ গাছের শেকড় মাটির গভীরে বেশীদূর যায় না, চারিদিকে ছড়ানো অবস্থায় থাকার জন্য ঝড়ে অনেক সময় এই গাছকে শেকড় সহ উপড়ে পড়তে দেখা যায়। গাছটি তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং প্রায় চির সবুজ। পরিণত গাছ ডালপাতা ছড়িয়ে ছাতার মত আকার ধারণ করে। পথের পাশে ছায়াতরু হিসাবে গাছটি বেশ উপযোগী।

পাতা দ্বিপক্ষল। প্রতিটি পাতা ৫০ সেমি পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে । মধ্যশিরা হতে ১০-২০ জোড়া উপশিরা বের হয় যার উপর ছোট ছোট পত্রকগুলি সাজানো থাকে। মার্চে

অল্পকিছু দিনের জন্য গাছ পত্রহীন হয়ে পড়ে। এপ্রিল হতে গাছে ফুল ফুটতে থাকে। গাঢ় লাল বা হালকা কমলা রঙের ফুলগুলি গাছটিকে ছেয়ে ফেলে। ফুলের ৫টি পাপ্‌ড়ির মধ্যে একটি আকারে একটু বড় এবং হল্‌দেটে লাল রঙের। ফুলের বৃতির বাইরের দিক সবুজ কিন্তু ভেতরের দিক গাঢ় লাল। ফুল পক্ষীপরাগী। ফল প্রায় ৫০ সেমি লম্বা, ৫-৮ সেমি চওড়া। বেশ শক্ত। বীজ আয়তাকার। পাকা ফল কাল রঙের।

শোভা বর্দ্ধক উদ্ভিদের মধ্যে কৃষ্ণচুড়া বেশ জাঁকালো ধরনের বৃক্ষ। উষ্ণমণ্ডলীর দেশে তাই এর বেশ কদর রয়েছে। ছায়াতরু হিসাবে রাস্তার ধারে লাগালে এর সুন্দর রঙিন ফুল পরিবেশের সৌন্দর্য্য আরো বাড়িয়ে তোলে। ফুলের কলি সব্জি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। কাঠ সাদা রঙের, হাল্কা তবে ভাল পালিশ নেয়। হালকা আসবাব তৈরীর উপযোগী।

বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। বীজের আবরণ শক্ত হওয়ায় অঙ্কুরিত হতে সময় লাগে। এজন্য বীজ লাগানোর আগে ৫-৮ মিনিট গরম জলে ভিজিয় নিলে তাড়াতাড়ি অঙ্কুরোদগম হয়। গাছটি দ্রুত বর্দ্ধনশীল। লাগানোর ৪/৫ বছরের মধ্যে ফুল দিতে আরম্ভ করে। ■

পেল্টোফোরাম

Peltophorum inerme (Robx) Lianos

সমার্থক নাম ঃ *P. ferrugineum / P. roxburghii*

গোত্র ঃ Leguminosae

উপগোত্র ঃ Caesalpinoidea
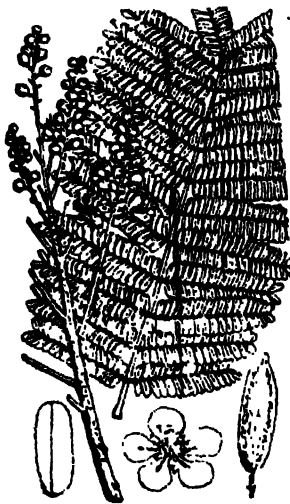
গণ সূচক শব্দ এসেছে গ্রীক শব্দ "Peltophoros" হতে যার অর্থ বর্মবহনকারী। এ হতে এই গাছের বর্মাকৃতি ফলকে বোঝায়। ferrugineum অর্থ মরচে রঙের। এতে লাল তামাটে রঙের ফলকে বুঝায়। প্রজাতি সূচক inerme শব্দের অর্থ কন্টক শূন্য। সামর্থক নামের roxburghii শব্দ এসেছে কলিকাতার উদ্ভিদ উদ্যানের

সুপারিনটেনডেন্ট উইলিয়াম রকস্‌বাগের নাম হতে।

শ্রীলংকার আদিবাসী এই গাছটি ভারতের বিহার, পশ্চিমবাংলা, পশ্চিম ঘাট অঞ্চল ও আন্দামানে পাওয়া যায়। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে রাস্তার ধারে এই গাছ রয়েছে। আগরতলা শহরে অনেক জায়গায় রাস্তার ধারে এই গাছ দেখা যায়।

প্রায় চির সবুজ এই বৃক্ষের বাকল ধূসর রঙের। পাতা গাঢ় সবুজ রঙের, দ্বিপক্ষল যৌগিক। পাতার মধ্যশিরা ও কচি ডালায় লালচে বাদামী রঙের রোম রয়েছে। হলদে ফুলগুলি ডালার আগায় পেনিকল পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। ফুলের একটা মৃদু গন্ধ রয়েছে। জানুয়ারী মাসে কিছুদিনের জন্য গাছের পাতা ঝরে যায়। ফেব্রুয়ারীতে নূতন পাতা গজায়। বছরে দুবার গাছে ফুল ফোটে। মার্চ হতে মে মাসে এবং সেপ্টেম্বর হতে নভেম্বর মাসে। ফল তামাটে রঙের। পাতলা শিম্বিজাতীয়, ফলগুলি দেখতে জুলুদের ব্যবহৃত বর্মের মত, ফুল ফোটা শেষ হয়ে যাওয়ার অনেক দিন পর্যন্ত ফলগুলি গাছে থাকে।

এই সুন্দর গাছটি রাস্তার ধারে, পার্কে লাগানোর উপযোগী। এই গাছের নীচে ঘাস বা অন্য গাছ ভালো জন্মায়। হল্‌দে ফুলের রাশির জন্য গাছকে বেশ সুন্দর দেখায়। ফুল ফোটার কিছুদিনের মধ্যে গাছ তামাটে রঙের সুন্দর ফলে ভরে যায় যা গাছকে নূতন সৌন্দর্য্য প্রদান করে।

এই গাছের সার কাঠ বেশ শক্ত, কালচে রঙের, আসবাব পত্র তৈরীর উপযোগী।

বীজ বা কাটিং হতে সহজে বংশবৃদ্ধি করা যায়। গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে। ■

অশোক

Saraca asoka (Roxb) de Wilde

সমার্থক নাম ঃ ***Saraca indica / Jonesia asoka***

গোত্র ঃ **Leguminosae**

উপগোত্র ঃ **Caesal pinoideа**

গণ সূচক Saraca শব্দটি এসেছে পশ্চিম ভারতীয় শব্দ হতে। প্রজাতিসূচক শব্দ এর সংস্কৃত নাম

অশোক হতে এসেছে। indica শব্দে ভারতে জন্মভূমি বুঝায়। Jonesia শব্দটি ইংরাজ পণ্ডিত উইলিয়াম জোন্সের নাম অনুসারে দেওয়া।

অশোক ভারত, বার্মা ও মালয়ের আদিবাসী। আসামের খাসিয়া পাহাড় ও উত্তর কাছাড়েএই গাছটি বুনো অবস্থায় পাওয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এর চাষ হয়। ত্রিপুরাতে অল্প কিছু গাছ রয়েছে। সিপাহীজলা, আগরতলার ইন্দ্রনগর, চন্দ্রপুর ও যোগেন্দ্রনগর অঞ্চলে কয়েকটি গাছ রয়েছে।

সুন্দর ছোট চির সবুজ এই বৃক্ষটির ডালপালা চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে। বাকল মসৃণ বাদামী রঙের। পাতা যৌগিক। প্রতি পাতায় ৩-৭ জোড়া বড় আকারের ঢেউ খেলানো পত্রক থাকে। কচি পাতা নীচের দিকে ঝুলন্তে থাকে এবং তার রঙ হয় তামাটে লাল। অনেক সময় পরিণত পাতাও ঝুলতে থাকে।

ফুল আকারে ছোট, মৃদু গন্ধযুক্ত। প্রথমে হল্‌দেটে বা কমলা রঙের থাকে। পরে সূর্যালোকের প্রভাবে রঙ সিন্দুরে লাল হয়। গোছা বাঁধা ফুলগুলি গাঢ় সবুজ পাতার পশ্চাৎপটে দেখতে বেশ সুন্দর দেখায়। ফুলের কোন পাপড়ি নেই। ছোট রঙিন পুষ্পপত্রই তাদের সৌন্দর্য্যের উৎস। ফেব্রুয়ারী হতে জুন ফুল ফোটার সময়। হিন্দুরা অশোক ফুলকে বেশ পবিত্র মনে করে। দুর্গাপূজায় নবপত্রিকায় অশোক পল্লব অপরিহার্য্য, অশোক অর্থ শোক রহিত। দুর্গাপূজায় অশোক অধিষ্ঠাত্রী শোক রহিতা দেবীর অর্চনা করা হয়। কোথাও কোথাও সন্তানের দুঃখ যন্ত্রণা লাঘবের জন্য মায়েরা অশোক সংস্পৃক্ত জল পান করে থাকেন। অশোক ভালোবাসার প্রতীক। অশোক ফুলকে কামদেবের পঞ্চশরের এক শর মনে করা হয় যা মনুষ্য হৃদয়ে ভালোবাসার আগুন প্রজ্জ্বলিত করে। সংস্কৃত সাহিত্যে অশোকের উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিদাসের কাব্য হতে আমরা জানতে পারি যে সুন্দরী নারীদের পাদস্পর্শে অশোক ফুল মঞ্জুরিত হয়ে ওঠে। তখনকার রাজারা অশোকের দোহাদ উৎসব পালন করতেন। রামায়ণে অশোক কাননে সীতার বন্দিনী জীবন যাপনের কথা আমরা জানি।

বুদ্ধদেব অশোক গাছের নীচে জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য বৌদ্ধেরা এই গাছকে বেশ পবিত্র মনে করেন। থাইল্যাণ্ড, বার্মা প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধমন্দির প্রাঙ্গণে অশোক গাছ লাগানো হয়। আমাদের দেশে মথুরা, সাচী প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির গাত্রের ভাস্কর্য্যে অশোক গাছ অঙ্কিত দেখতে পাই। মন্দির সাজানোর জন্য কোথাও কোথাও অশোক ফুলের ব্যবহার করা হয়। অশোক ফুলের মিষ্টি গন্ধ রাত্রিবেলা বেশ দূর হতে টের পাওয়া যায়।

এই গাছের কাঠ নরম। আমাদের দেশে উহা বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয় না। শ্রীলংকায় ঘরদোর তৈরীতে এই কাঠের ব্যবহার রয়েছে। অশোক ভেষজগুণ বিশিষ্ট।

গাছের বাকল আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ বন্ধে ব্যবহৃত হয়। বাকলের ক্বাথ গর্ভাশয় সম্বন্ধীয় পীড়ায় উপকারী। ফুলের নির্যাস আমাশয়ে উপকারী। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতেও বাকলের ব্যবহার রয়েছে। বীজ হতে সহজে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ছায়াযুক্ত স্থানে এই গাছ ভাল বাড়ে। পূর্ব ভারতের জলবায়ু এই গাছের পক্ষে বেশ অনুকূল। ■
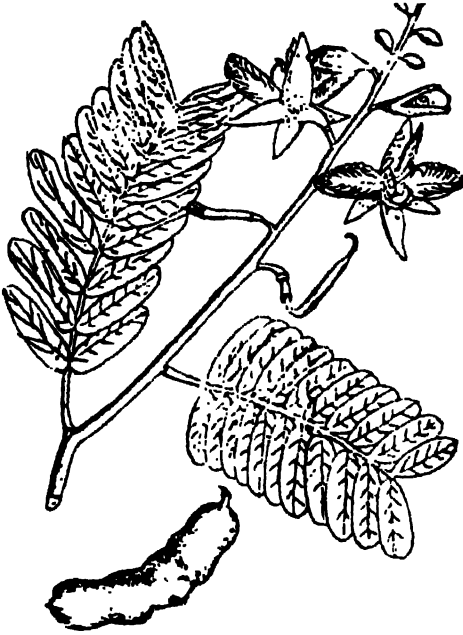
তেঁতুল

Tamarindus indica L.

গোত্র : **Leguminosae**

উপগোত্র : **Caesalpinoidea**

অন্যনাম : তেতুই / তি ন্তি রি

গণ সূচক Tamarindus শব্দটি এসেছে এই গাছের পারস্য দেশীয় নাম Tamari-Hind শব্দ হতে। মধ্য যুগে আরব দেশীয় বণিকদের মাধ্যমে ইউরোপীয়রা তেঁতুলের ভেষজ গুণের সঙ্গে পরিচিত হয়। Tamari-Hind শব্দ হতেই ইংরাজী নাম Tamarind এর উৎপত্তি এবং তা হতেই পরবর্তী কালে গণ সূচক নাম Tamarindus এসেছে। প্রজাতি সূচক নামে ভারতে জাত বুঝায়।

প্রজাতি সূচক নাম indica হলেও বর্তমানে অনেকের মতে তেঁতুলের আদি জন্মভূমি মধ্য আফ্রিকা এবং সেখান হতে বিভিন্ন উষ্ণ মণ্ডলীয় দেশে উহা ছড়িয়ে পড়েছে। তবে ভারতে এর আগমন হয় অনেক দিন আগে, কিন্তু আগমনের সঠিক সময় জানা যায় না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রাস্তার ধারে ও অন্যত্র তেঁতুলগাছ লাগানো হয়। কোথাও কোথাও একসঙ্গে অনেক তেঁতুলগাছ দেখা যায়। এ হতে এদেশে এর জন্মস্থান মনে করা ঠিক নয়। সম্ভবতঃ ঐ সব স্থানে কোন সময় মনুষ্য বসতি ছিল, যা কালক্রমে পরিত্যক্ত হয়েছে এবং সেখানকার চাষ করা গাছই ক্রমে বুনো জঙ্গলের

চেহারা নিয়েছে। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু তেঁতুল গাছ রয়েছে।

আমাদের দেশের কোন কোন স্থানে তেঁতুল গাছকে অশুভ সূচক মনে করা হয়। কারো কারো ধারণা এই গাছে হিংসুটে ভূত প্রেত থাকে এবং এই গাছের নীচে শুলে তারা মানুষের ক্ষতি করে। তেঁতুলের পাতা অম্লগুণযুক্ত এজন্য এই গাছের নীচে অন্য গাছ জন্মায় না। এই ঘটনা হতেই সম্ভবতঃ এই গাছের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বন্ধীয় সংস্কার গড়ে উঠেছে। কেউ কেউ মনে করেন এই গাছের নীচে শুলে কুষ্ঠরোগ হয়। দেখা গেছে তেঁতুল গাছের নীচে তাঁবু ফেললে আর্দ্র আবহাওয়ায় অল্পদিনের মধ্যে তাঁবু নষ্ট হয়ে যায়। দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ু রাজ্যে রাস্তার ধারে তেঁতুলের স্যারি দেখা যায়। সেখানে তেঁতুলের জনপ্রিয়তার জন্যই বোধ হয় অত গাছ লাগানো হয়েছে।

চির সবুজ এই বৃক্ষটি দেখতে বেশ সুন্দর। বাকল এবড়ো খেবড়ো ধূসর রঙের এবং তাতে অনেক ফাটল থাকে। শক্ত ছোট গুড়ির উপর ডালপালা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গাছটি আরে বেশ বড় হয় এবং অনেক দিন বেঁচে থাকে। শ্রীলংকায় একটি তেঁতুল গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে-যার গুড়ির বেড় ৪২ ফুট এবং গাছটি নাকি ২০০ বছরের বেশী বয়স্ক। যৌগিক পাতায় জোড়ায় জোড়ায় ছোট পত্রক থাকে। ফুল বেশী বড় হয় না, লালচে হলুদ রঙের ফুলগুলি রেসিম পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। এপ্রিল জুন ফুল ফোটার সময়।

ফল শিম্বি জাতীয়, শাঁস অম্লস্বাদযুক্ত। বীজ চেপ্টা। মসৃণ চকচকে। নভেম্বর ডিসেম্বরে ফল পাকে। বিভিন্ন জাতের তেঁতুলের শাঁসে অম্লত্বের তারতম্য দেখা যায়।

তেঁতুলের কাঠ অত শক্ত যে উহা দিয়ে কোন আসবাব ইত্যাদি তৈয়ারী করা যায় না। তবে এ হতে চাল গুড়া করার জন্য কাঠের মুগুর বানানো হয়। ফলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

বীজ নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। বীজের শর্করা বয়ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বীজচূর্ণ আঠার সঙ্গে মিশিয়ে কাঠ জোড়া দেওয়ার সিমেন্ট তৈরী কারা হয়। বীজের তেল বার্নিশের কাজে ব্যবহৃত হয়। কচি পাতা সব্জী হিসাবে খাওয়া হয়। ফলের শাঁস রূপা, তামা, কাশা ও পিতলের বাসন পরিষ্কারে ব্যবহৃত হয়।

ভেষজ গুণ হিসাবে বাকল কষায়, পক্ষাঘাতে উপকারী। পাতা ক্ষত ধোয়ায় ব্যবহৃত হয়। ফুলের পুলটিশ চক্ষু প্রদাহে উপকারী। শাঁস, জোলাপের কাজ করে এবং বীজ আমাশয়ে উপকারী। ■

সুইয়া বাবুল

Acacia farnasiana (L.) Willd

গোত্র ঃ **Leguminosae**

উপগোত্র ঃ **Mimosoidea**

অন্যনাম ঃ গন্ধ বাবুল / বিলাতী বাবুল।

গণ সূচক শব্দটি একটি প্রাচীন গ্রীক নাম হতে নেওয়া হয়েছে; প্রজাতি সূচক নামটি উদ্ভিদউদ্যানবিদ কার্ডিনাল ফার্নিসের নাম অনুসারে দেওয়া হয়েছে।

আমেরিকাকে এই গাছের আদিবাসভূমি হিসাবে মনে করা হয়। তবে বর্তমানে উষ্ণ মন্ডলের বহু দেশে এর চাষ হয়। ত্রিপুরাতেও অনেক সময় বাগানে এই গাছ লাগানো হয়।

কন্টকযুক্ত গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। বাকল খসখসে বাদামী রঙের। ডালপালা আঁকা বাঁকা। প্রতিটি বাঁকে একটি পাতা এবং একটি কাঁটা থাকে। পাতা আকারে ছোট, যৌগিক, দ্বিপক্ষল। পত্রগুলি গোড়ার দিক হতে উপরের দিক ক্রমশ ছোট। *কাণ্ডের প্রতি পর্ব হতে অনেকগুলি মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাস জন্মায়। যাতে ছোট উজ্জ্বল হলদে রঙের ফুলগুলি বিন্যস্ত থাকে। ফল হালকা বাদামী রঙের, এর মাংসল শাঁসে অনেক বীজ থাকে।*

খোলা জায়গায় এই গাছটি অনেকটা খোলা ছাতার মত আকার ধারণ করে। ফুলন্ত গাছ সুগন্ধি ফুলের জন্য সহজে নজর কাড়ে। প্রায় সারা বছর গাছে ফুল ফোটে তবে শীতের সময় ফুল বেশী দেখা যায়।

ফুল হতে cassie নামক সুগন্ধি দ্রব্য পাওয়া যায়। গাছের কাণ্ড হতে আঠাও পাওয়া যায়। কাঠ বেশ শক্ত তবে কাণ্ড আকারে ছোট হওয়ায় কাঠ বিশেষ কাজে লাগে না। শেকড় হতে রশুনের গন্ধ বের হয়।

বাকল কষায়, ঔষধ হিসাবে বিভিন্ন রোগে বিশেষ করে ক্ষত নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। সাপের কামড়েও এর ব্যবহার রয়েছে। অনেক সময় শিশু জন্মের পর প্রসুতিকে এর ফুল ও বাকলের ক্কাথ দেওয়া হয়।

আঁকা বাঁকা ডালপালাও সুগন্ধি ফুল দিয়ে একে সাধারণ বাবলা হতে আলাদা করা হয়। বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

আকাশ মণি

Acacia moniliformis Griesb

সমার্থক নাম ঃ *A auriculiformis*

গোত্র ঃ Leguminosae

উপগোত্র ঃ Mimosoidea

গণ সূচক শব্দটি নেওয়া হয়েছে একটি প্রাচীন গ্রীক নাম হতে। প্রজাতি সূচক শব্দের অর্থ নেকলেসের আকৃতির বা পুতির মালার মত। সম্ভবত ছোট স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে সাজানো ফুলের ধরন হতে বা সোনালী সূতার মত তন্তু হতে দোদুল্যমান বীজ এরূপ নামকরণের কারণ। সমার্থক নামের প্রজাতি সূচক শব্দ হৃদপিণ্ডের অলিন্দের আকৃতি বিশিষ্ট পত্রবৃন্তকে বুঝায়।

এই গাছটি অস্ট্রেলিয়ায় উষ্ণ মণ্ডলের আদিবাসী। সেখান হতে সাম্প্রতিক কালে ভারতে এসেছে। বর্তমানে পশ্চিমবাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও ত্রিপুরায় এই গাছ জন্মায়। বনবিভাগের কল্যাণে ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে এই গাছটির বাড়-বাড়ন্ত। তবে প্রায় পাঁচ দশক আগে যখন এ রাজ্যে আসি তখন এখানে সেখানে ২/৪ টির বেশী আকাশমণি গাছ দেখিনি।

মাঝারী আকারের বৃক্ষ জাতীয় গাছ। বাকল অমসৃণ, ধূসর বাদামী রঙের। ডালপালা কাণ্ড হতে অনেকটা ঝুলে থাকে। চির সবুজ এই বৃক্ষটির পর্ণবৃন্ত পাতা গাঢ় সবুজ রঙের। ডালার আগার দিকে পাতার মাঝে ছোট সুগন্ধযুক্ত হলদে ফুলের রাশি স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে সাজানো থাকে। ফল কাঁচা অবস্থায় সবুজ। পাকলে কালচে বাদামী রঙের। কোকড়ানো ফলগুলি জিলেপীর মত পেঁচানো। পাকা ফল ফাটার পর চক্‌চকে কাল বীজগুলি সোনালী বা কমলা রঙের তন্তুর আগায় ফলত্বক হতে ঝুলতে থাকে।

ছোট চারা অবস্থায় এ গাছে প্রথম ২/৩টি স্বভাবিক পাতা দেখা যায়, যা যৌগিক, দ্বিপক্ষল। পরবর্তী সময়ে স্বাভাবিক পাতার পরিবর্তে, পাতার বোটা লম্বা ও চেপ্টা হয়ে পাতার কাজ করে, যাকে পর্ণবৃন্ত বলে। মার্চ হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত কিছুদিন পর পর গাছে ফুল আসে। তবে সেপ্টেম্বর- অক্টোবরে সবচেয়ে বেশী ফুল দেখা যায়। ফেব্রুয়ারী- মার্চে ফল পাকে, অবশ্য অন্যসময়ও ফল পাকতে পারে, পপুয়া নিউগিনির সাভানী অঞ্চল এবং উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী এই গাছটি বেশ দ্রুত বর্দ্ধনশীল এবং অনুর্বর জমিতেও এজন্মাতে পারে। যেখানে অন্য গাছ জন্মায় না। কাগজের মণ্ড শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের এর প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া জ্বালানী হিসাবেও এর কাঠ বেশ ভালো। এরাজ্যের জ্বালানী সমস্যার সমাধানে আকাশমণি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। ভূমিক্ষয় রোধ ও পতিত জমি পুনরুদ্ধারে এ মূল্যবান অবদান রাখতে পারে।

এগাছটির প্রচুর অভিযোজন ক্ষমতা রয়েছে, এবং একবার গাছ লাগানোর পর বিশেষ পরিচর্য্যার দরকার হয় না । সব রকম মাটিতে এ গাছ জন্মায়। অনুর্বর জমিতে এই গাছ তাদের শেকড়ে জন্মানো অর্বুদ দ্বারা প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে পারে, যা অন্যান্য অনেক প্রজাতির পক্ষে সম্ভব নয়।

অষ্ট্রেলিয়ায় দেখা গেছে যে আকাশমণি ক্ষার মাটি (PH-9.0) এবং অম্লমাটি (PH-3.0) সর্বত্র ভালো জন্মায়। ইন্দোনেশিয়ার খাড়া ঢালযুক্ত জমিতে যেখানে অন্য গাছপালা জন্মায় না, সেখানে আকাশমণি গাছ লাগিয়ে ভূমিক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

পপুয়া নিউগিনিতে এক পরীক্ষায় অনুর্বর জল নিকাশ ব্যবস্থা হীন পরিত্যক্ত তৃণভূমিতে আকাশমণি গাছ লাগিয়ে দশ বছরে তাকে ভালো উৎপাদনশীল বনভূমিতে রূপান্তর করা সম্ভব হয়েছে। গাছটি এমনিতে ক্ষরা প্রবণ এলাকার উপযোগী। কিন্তু বছরে ১৮০ সেমি বৃষ্টিপাত হয় এমন জায়গাতেও এই গাছ বেশভালো ভাবে জন্মায়। অনুর্বর জমিতে জন্মানোর পর, নাইট্রোজেন সংবদ্ধন ও মাটিতে পড়া পাতা ফল ইত্যাদির পচন দ্বারা ক্রমশ জমির উর্ব্বরতা বাড়ায়।

জ্বালানী ছাড়াও এর কাঠ হতে ভাল কাঠকয়লা পাওয়া যায়। আহত কাণ্ড হতে এক প্রকার আঠা পাওয়া যায় যা বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের উপযুক্ত।

বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ছায়াতে এই গাছ ভাল জন্মায় না । রাস্তার ধার, কলকারখানা, স্কুল প্রভৃতির প্রাঙ্গণে,খেলার মাঠের ধারে, পার্কে এ গাছ লাগানো যেতে পারে। ■
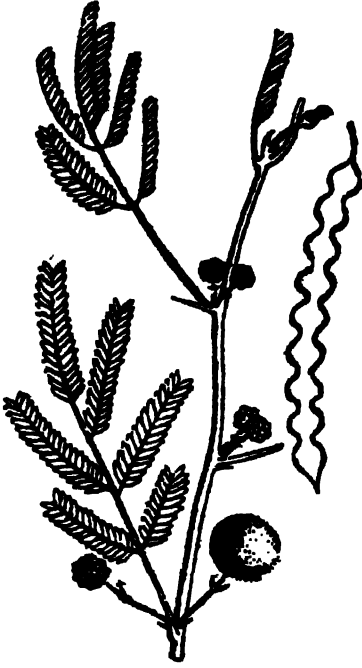
বাবুল

Acacia nilotica (L) Willd

সমার্থক নাম ঃ *A. arabica*

গোত্র ঃ Leguminosae

উপগোত্র ঃ Mimosoidea

অন্য নাম ঃ বাব্‌লা / কাঁটা নাগেশ্বর

প্রজাতি সূচক arabica শব্দটির অর্থ আরব দেশ জাত, nilotica সম্ভবত নীল নদ অঞ্চলে জাত বুঝাতে রাখা হয়েছে।

বাবুল ভারতের উষ্ণ অঞ্চল, আরব ও আফ্রিকার আদিবাসী। ভারতের কোন কোন স্থানে এই গাছের বনভূমি রয়েছে। এছাড়া অন্য অনেক স্থানে এর চাষ করা হয়। ত্রিপুরাতেও এই গাছ রয়েছে। আগরতলায় এখানে সেখানে দুএকটি গাছ রয়েছে।

কন্টকযুক্ত গুল্ম বা ছোট বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। কখনো কখনো গাছটি বড় আকারেরও হয়ে থাকে। বাকল গাঢ় বাদামী, খস্‌খসে ও লম্বা ফাটলযুক্ত। কাণ্ড গোড়ার দিকেই ডালপালায় বিভক্ত হয় এবং কচি ডালপালা ধূসর রোমে ঢাকা। পাতা যৌগিক, দ্বিপক্ষল। ছোট পত্রকগুলি জোড়ায় জোড়ায় উপশিরায় সাজানো। প্রতিটি পাতার গোড়ায় দুটি বড় কাঁটা থাকে। ছোট হলদে ফুলগুলি মুণ্ডুক পুষ্পবিন্যাসে পাতার কক্ষে সাজানো থাকে। ফল লম্বাটে, প্রতি দুটি বীজের মধ্যবর্তী অংশ বেশ চাপা।

এই গাছটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে' কাঠ বেশ ভারী ও শক্ত। বিভিন্ন কাজে যেমন গাড়ীর চাকা, কৃষি যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন যন্ত্রের হাতল, নৌকা প্রভৃতি তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে। বাকল কষায়, ট্যানিং-এ ব্যবহৃত হয়। জ্বালানী হিসাবেও এর কাঠ ভাল, গাছ হতে পাওয়া আঠা কাপড় ছাপানো ও রং করার কাজে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন স্থানে বাকলের ক্বাথ সাবানের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। কাঁচা ফল কালি তৈরীতে ব্যবহৃত হয় এবং উহা ভাল পশুখাদ্য। কচি ডালপালা ও পাতা পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পাতা ও বাকল ভেষজ গুণযুক্ত, নানা রোগে তাদের ব্যবহার রয়েছে। আঠা গলক্ষতও কাশিতে উপকারী। ফুল উন্মাদ রোগে উপকারী। কোন কোন স্থানে সাপের কামড়ে

বাকল চূর্ণের প্রলেপ ব্যবহার করা হয়।

বাবলার আঠা চিনি, মাখন ও মশলা সহযোগে এক প্রকার মিষ্টি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। দুর্ভিক্ষের সময় বাকল চূর্ণ আটার সঙ্গে মিশিয়ে রুটি তৈরীতে ব্যবহৃতহয়।

বাবলার বীজ অনেকদিন সুপ্ত থাকার পর তাতে অঙ্কুরোদগম হয়। গোমহিষাদি এর ফল খাওয়ার পর এদের মলের সঙ্গে আসা বীজের অঙ্কুরোদ্গম তাড়াতাড়ি হয়। বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা হয়। ■

রক্ত চন্দন

Adenanthera pavonia L.

গোত্র : **Leguminosae,**

উপগোত্র : **Mimosoidea**

বৈজ্ঞানিক নামের প্রথম শব্দটি এসেছে দুটি গ্রীক শব্দ হতে, aden অর্থ গ্লাণ্ড। anthera অর্থ ফুল ফোটা অর্থাৎ গ্লান্ডযুক্ত ফুল ফোটা। pavonia শব্দের অর্থ ময়ূরের মত রঙিন। শব্দ দুটি মিলে গ্লাণ্ডযুক্ত রঙিন ফুল বোঝায়। বৃক্ষজাতীয় এই গাছটি ভারত, চীন ও মালয়ের উষ্ণমণ্ডলের আদিবাসী। দক্ষিণ ভারতে অনেক স্থানে রক্তচন্দন গাছ লাগানো হয়। ত্রিপুরায় অল্প কিছু গাছ রয়েছে। মোহনপুরে ব্রহ্মকুণ্ডের আশপাশে কয়েকটি গাছ রয়েছে।

আগরতলার কলেজটিলায় বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একটি গাছ আছে।

বড় বৃক্ষ জাতীয় এই গাছের বাকল খসখসে এবং গাঢ় ধূসর রঙের। পাতা যৌগিক, দ্বিপক্ষল পত্রকগুলি একান্তরভাবে সাজানো। ছোট হলদে ক্রীম রঙের ফুলগুলি লম্বা মঞ্জরীতে বিন্যস্ত। ফল সরু লম্বাটে। প্রতি ফলে ১০-১২ টি চকচকে লাল রঙের

বীজ থাকে।

শীতের শেষে কিছুদিন গাছ পত্রশূন্য অবস্থায় থাকে। ফেব্রুয়ারী মার্চ পর্যন্ত গাছে নূতন পাতা দেখা যায়। মার্চের শেষ বা এপ্রিলে গাছে ফুল আসে। কোন কোন স্থানে সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসেও গাছে ফুল ফোটে। শীতের সময় ফল পাকে এবং কিছুদিনের মধ্যে বীজগুলি মাটিতে পড়তে থাকে। বীজের সুন্দর রঙ পাখীদের আকৃষ্ট করে এবং তাদের মাধ্যমে বীজের বিস্তার লাভ হয়।

বীজ অলঙ্কার তৈরীতে এবং সোনা রূপা ইত্যাদি ওজন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। বীজ সাধারনতঃ একই আকারের হয় এবং এদের ওজন হয় ৪ গ্রেণ। বীজ হতে পাওয়া তেল আঠা তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।

রক্ত চন্দন কাঠ বেশ শক্ত। সার কাঠ কালচে লাল রঙের। আসবাব তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে। এছাড়া রক্ত চন্দন হিন্দুদের পূজায় ও তিলক করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এর ঔষধিগুণও রয়েছে। পাতা বিভিন্ন প্রকার বাতরোগে উপকারী। বীজচূর্ণ ক্ষত নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

বীজ হতে গাছের বংশবিস্তার করা যায়। তবে বীজের আবরণ শক্ত হওয়ায় চারা গজাতে অনেক সময় লাগে।

একই গোত্রের Papilionoidea উপগোত্রের Pterocarpus santalinus L.f. গাছটিও রক্তচন্দন নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা এই গাছটিও ত্রিপুরায় রয়েছে। সম্প্রতি আগরতলার বাধারঘাট অঞ্চলে এর কয়েকটি গাছ দেখেছি।

ছোট বৃক্ষ জাতীয় গাছ। এর সার কাঠশক্ত ও লাল রঙের। পাতা যৌগিক, তিনটি পত্রক বিশিষ্ট। পত্রকের সংখ্যা কখনো ৫ দেখা যায়। পত্রকগুলি বেশ চওড়া, স্থূলাগ্র। পাতার কক্ষে শাখার আগায় অল্প সংখ্যক ফুল রেসিম পুষ্পবিন্যাসে সাজানো থাকে।

দেব পূজায় রক্তচন্দনের ব্যবহারের কথা সবাই জানেন।

ভেষজ গুণ হিসেবে এর কাঠ শীতল, ক্রিমি নাশক ও টনিক, বমন, তৃষ্ণা, চক্ষু রোগ ইত্যাদিতে উপকারী। কফ, বাত ও স্মৃতিভ্রংশে এর ব্যবহার রয়েছে।

রক্ত চন্দনের প্রলেপ শরীরকে স্নিগ্ধ রাখে এবং মাথা ধরার উপশম করে। ফলের নির্যাশ ক্রনিক পেটের পীড়ার উপকারী। ■

শিরীষ

Albizzia lebbek (L) Benth

সমার্থক নাম ঃ *Mimosa sirisa*

গোত্র ঃ Leguminosae

উপগোত্র ঃ Mimosoidea

গণ সূচক নামটি এসেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতালীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানী F.del Albizzi-র নাম অনুসারে। প্রজাতিসূচক নামটি একটি আরবী শব্দ হতে এসেছে।

Albizzia গণভুক্ত প্রায় ১০০ টি প্রজাতি এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার উষ্ণ মণ্ডলীয় অঞ্চলে পাওয়া যায়। এদের বেশ কিছু প্রজাতি যৌগিক পত্রবিশিষ্ট এবং বিভিন্ন প্রকার মাটি ও জলবায়ুতে জন্মায়। প্রাথমিক অবস্থায় এই গাছগুলি বেশ তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং এরা বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন সংবন্ধনে নিপণ। শিরীষ এইরূপ একটি প্রজাতি। এর আদি বাসভূমি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা যায়না। তবে ভারত, শ্রীলংকা, বার্মা, মালয় ও চীনের উষ্ণ মণ্ডলে এই গাছ পাওয়া যায়। এছাড়া আফ্রিকা ও আমেরিকাতেও এর চাষ হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে রাস্তার পাশে ও অন্যত্র শিরীষ গাছ রয়েছে। অবশ্য Albizzia lebbek ছাড়া অন্য কিছু প্রজাতি বিভিন্ন স্থানে শিরীষ নামে প্রচারিত।

বেশ বড় আকারের বৃক্ষ জাতীয় গাছ। ডালপালা বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকে। বাকল বাদামী ধূসর রঙের এবং তাতে অনেক ফাটল দেখা যায়। পাতা যৌগিক, দ্বি পক্ষল। মধ্যশিরার দুই পাশে উপশিরাগুলি থাকে যার উপর ছোট ছোট পত্রকগুলি জোড়া জোড়ায় বিন্যস্ত। ফুলে সুন্দর গন্ধ রয়েছে। Albizzia-র অন্য প্রজাতির তুলনায় ফুল আকারে বড় এবং অনেকগুলি ফুল একটি মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাসে সাজানো থাকে। মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাসগুলি শাখার আগায় পাতার কক্ষে থাকে। ফুলের সাদাটে ধূসর রঙের পুংকেশরগুলো পাপড়ির তুলনায় বেশ লম্বা। ফল লম্বা, সরু, পাতলা। পাকা ফল হলদেটে রঙের।

ফেব্রুয়ারী -মার্চে ফুল ফোটে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে আছে কি? " প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখে/ ফাগুন মাসে কি উচ্ছাসে/ ক্লান্তি বিহীন ফুল ফোটানোর খেলা।"

খোলা জায়গায় জন্মালে শিরীষ গাছ ডালপালা ছড়ানো বিলেতী শিরীষের (*Sammania saman*) মত দেখায়। কিন্তু বনে ঘনভাবে লাগানো গাছের গুড়ি বেশ লম্বা হয় এবং তা উচ্চতায় প্রায় ৩০ মিটার এবং পরিধি ২-৩ মিটার হয়ে থাকে।

প্রায় সবরকম মাটিতে এই গাছ ভালভাবে বাড়ে। উত্তর ভারতে বিভিন্ন স্থানে একে দীর্ঘ শুষ্ক ও ঠাণ্ডা শীত সহ্য করতে হয়। আবার শুষ্ক ও আদ্র বনভূমিতে ৬০ সে.মি হতে ২৫০ সে. মি পর্যন্ত বাৎসরিক বৃষ্টিপাতে এই গাছ নিজেকে সহজে খাপ খাইয়ে নেয়। এই গাছ দ্রুতবর্দ্ধনশীল, আমাদের দেশে দশ বছরে ১৮ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা গেছে। বনে, রাস্তার ধারে, নদী ও খালের কিনারায়, পতিত জমিতে, খোলা প্রাঙ্গনে, চা ও কফি বাগানে ছায়াতরু হিসাবে এ গাছ ভালভাবে বাড়ে।

জ্বালানী কাঠ হিসাবে এই গাছ বেশ মূল্যবান। একবার ডালাপালা কেটে দিলে কিছুদিনের মধ্যে সহজে নতু ন ডালপালা গজায়। এর কাঠ বেশ শক্ত ও স্থিতিস্থাপক। ঘর গৃহস্থলীর নানা আসবাবপত্র তৈরীতে শিরীষ কাঠ বেশ উপযোগী। পূর্বভারতের ওয়ালনাট হিসাবে এর কাঠ বাইরে রপ্তানী হত। পাতা ও কচি ডালপালা উট বেশ পছন্দ করে।

এর ভেষজ গুণও রয়েছে। শেকড় কষায়, চক্ষুরোগের উপকারী। বাকল চর্মরোগ, ব্রঙ্কাইটিস, দন্তরোগ, ও ইঁদুরের কামড়ে উপকারী, পাতা রাত্রান্ধতায় উপকারী। গাছের আঠা বাবলার আঠার মত নানা কাজে লাগে। পাতা সবুজ সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। বীজ হতে এবং কাটিং দ্বারা বংশবৃদ্ধি করা যায়। বীজ সরাসরি লাগানো যায় অথবা চারা তৈরী করে তা রোপণ কার যায়। ■

শিল করই

Albizzia lucida (Roxb) Benth

গোত্র ঃ **Leguminosae,**

উপগোত্র ঃ **Mimosoidea**

অন্যনাম ঃ সুন্ধি

প্রজাতি সূচক lucida শব্দের অর্থ উজ্জ্বল বা চক্চকে। এটি এই প্রজাতির পাতার বৈশিষ্ট্য। এই গাছ হিমালয়ের নিম্নাঞ্চল, আসাম বার্মা, ও মালয়ের আদিবাসী। কোন কোন স্থানে এর

চাষ করা হয়। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে এই গাছ ছড়িয়ে রয়েছে।

বড় বৃক্ষ জাতীয় এই উদ্ভিদটি দেখতে বেশ সুন্দর। বাকল মসৃন বাদামী রঙের, পাতা গাড় সবুজ চক্‌চকে। যৌগিক,প্রতি পাতার পত্রক সংখ্যা ৮-১২ হয়ে থাকে। মধ্য শিরা হতে ২টি উপশিরা বের হয়। প্রতি উপশিরায় দুই বা তিন জোড়া পত্রক থাকে পাতার আগার পত্রক অন্য পত্রক হতে আকারে বড় হয়। ছোট মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাসে ছোট ছোট ফুলগুলি সাজানো থাকে।

ফল হালকা বাদামী রঙের, পাতলা ও নমনীয়। ১৫-২০ সে.মি লম্বা এবং প্রায় ৩ সে.মি. চওড়া। প্রতি ফলে ৬-৮টি বীজ থাকে। এপ্রিল হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গাছে ফুল ফোটে।

শীতকাল হতে পরবর্তী গরমের সময়ে ফল পাকে। এপ্রিল হতে জুন পর্যন্ত গাছে নূতন পাতা গজায়। পাতা অনেক সময় লাল্‌চে রঙের হয়ে থাকে। কাঠ বেশ ভাল এবং শক্ত। নানা কাজে যেমন ঘর দরজা তৈরী, আসবাব তৈরী প্রভৃতিতে এই কাঠের ব্যবহার হয়। এই গাছ লাক্ষা কীটের ভাল পোষক। বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

করই

Albizzia procera (Roxb.) Benth

সামর্থক নাম ঃ ***Mimosa elata***

গোত্র ঃ Leguminosae,

উপগোত্র ঃ Mimosoidea

প্রজাতি সূচক procera এবং elata-র অর্থ লম্বা। এই শব্দ দ্বারা লম্বা আকৃতির বৃক্ষ বুঝায়। হিমালয়ের নিম্নাংশের আদিবাসী এই গাছ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়। ইহা ত্রিপুরার একটি প্রধান দারু উৎপাদনকারী বৃক্ষ।

আগরতলা শহরে ও এখানে সেখানে, বিশেষতঃ কলেজটিলায় বেশ কয়েকটি করই গাছ রয়েছে।

এই লম্বা বৃক্ষটি প্রায় ২৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। গুড়ির বেশ উপরের দিকে ডালপালা বের হয় এবং ডালপালা ঘন সন্নিবদ্ধ নয়। বাকল সাদাটে বা হালকা ধূসর রঙের এবং তাতে অনুভূমিক ফাটল রেখা থাকে। পাতা যৌগিক, পত্রকগুলি আকারে ছোট। পত্রকের মধ্যশিরার দু'পাশের অংশ অসমান। ছোট সাদা ফুলগুলি গোলাকার মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাসে সাজানো এবং মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাসগুলো ডালপালার আগায় গোছা বেঁধে থাকে।

ফল পাতলা, সরু লম্বা ও চেপ্টা। পাকা ফল বাদামী রঙের। মে হতে সেপ্টেম্বরে ফুল ফোটে। গরমের সময় গাছে নূতন পাতা গজায়। এই গাছ বেশ অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষতঃ ত্রিপুরার পক্ষে। এ রাজ্যে করই কাঠ নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে এর সার কাঠ ঘরদোর তৈরী, আসবাব তৈরী প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়।

পাতা কীটনাশক গুণ সম্পন্ন। ক্ষত নিরাময়ে এর ব্যবহার রয়েছে। কারো কারো মতে এর বাকল বিষাক্ত।

বীজ হতে সহজে বংশবৃদ্ধি করা যায়। নদীর তীর বা ভিজে মাটিতে এই গাছ বেশ ভাল জন্মায় এবং বাড়েও বেশ তাড়াতাড়ি। ■

ব্রাউনিয়া

Brownia coccinea Loeff.ex Griseb

গোত্র ঃ **Leguminosae**

উপগোত্র ঃ **Mimosoidea**

নামের প্রথম শব্দটি ইংরেজ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী পি ব্রাউনের নাম হতে এসেছে। Coccinea শব্দের অর্থ রক্তিম, যা এর লাল্‌চে রঙের ফুলকে বুঝায়।

এই গাছটির আদি বাসস্থান ভেনিজুয়েলা। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এর চাষ হয়। ত্রিপুরায় আমাদের জানা মত একমাত্র সিপাহীজলায় একটি গাছ রয়েছে, কিন্তু এর উল্লেখ ত্রিপুরার উদ্ভিদকূল সম্বন্ধে প্রকাশিত কোন বইতে নাই। কয়েক মাস আগে সিপাহীজলার বনদপ্তরে কর্মরত এক ভদ্রলোক ফুলসহ একটি

ডাল নিয়ে আসেন যা হতে অনুসন্ধানের পর এর পরিচয় জানা যায়।

ছোট আকারের এই বৃক্ষ ৮-১০ ফুট লম্বা হয়। ডালপালা গুড়ির একটু নীচু হতেই আরম্ভ হয়। পাতা যৌগিক, সূক্ষ্মাগ্র। পত্রকগুলি মধ্যশিরার দুপাশে জোড়ায় জোড়ায় সাজানো। কচি পাতা গোলাপী পত্রাবরণে ঢাকা থাকে, যা ঝরে পাতাটি বের হয়ে আসে। পাতা প্রথমে লাল্‌চে বা গোলাপী থাকে পরে চক্‌চকে সবুজ রঙের হয়। গরমের সময় দিনের বেলা পাতাগুলি একটু নুয়ে পড়ে। ফুলগুলি ছোটডালপালার নীচের দিকে মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাসে সাজানো থাকে। প্রতিটি পুষ্পবিন্যাসে ৩০-৫০ টি ফুল থাকে। এর পুষ্প বিন্যাস রডোডেন্ড্রন পুষ্পগুচ্ছের কথা মনে করিয়ে দেয়। অনেক সময় ফুলের ভারে ডালপালা নুয়ে পড়ে। ফল চ্যাপ্টা আকৃতির। ফুল আসার আগে এই গাছকে অশোক গাছের মত মনে হয়। তবে ফুল আসার পর দু গাছের তফাৎ ধরা পড়ে। সাধারণতঃ মার্চে ফুল ফোটে তবে কখনো সেপ্টেম্বরেও ফুল ফুটতে দেখা যায়। আর্দ্র আবহাওয়ায় গাছটি ভালোভাবে বাড়ে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই সুন্দর গাছটির চাষ করা যেতে পারে। দাবা কলম হতে সহজে এর বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

বিলাতী শিরীষ

Enterolobium saman (Jacq) Merr

সমার্থক নাম ঃ *Pithecolobium saman / Mimosa saman / Samania saman*

গোত্র ঃ Leguminosae,

উপগোত্র ঃ Mimosoidea

গণ সূচক শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ হতে এসেছে। "Enteron" শব্দের অর্থ অন্ত্র এবং "Lobes" অর্থ শিম জাতীয় ফল। দুয়ে মিলে অন্ত্রের মত আকৃতির শিম জাতীয় ফলকে বুঝায়, প্রজাতি সূচক "Saman" শব্দটি দঃ আমেরিকার স্থানীয় শব্দ হতে নেওয়া।

ইংরাজীতে এই গাছের নাম 'raintree" কোন কোন অঞ্চলে এই গাছ cicada নামক পতঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হয়। যাদের শরীর হতে কখনো কখনো বৃষ্টি
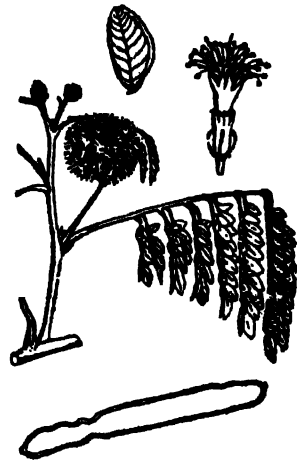
বিন্দুর আকারে তরল পদার্থ বের হয়, যাকে অনেকে গাছ হতে ঝরা বৃষ্টি বিন্দু বলে মনে করে, তাই এই গাছের নাম দিয়েছেন *'rain tree.'*

এই সুন্দর বৃক্ষটির আদি বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলা, তবে বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শোভা বর্দ্ধনকারী ছায়াতরু হিসাবে এর চাষ করা হয়। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে রাস্তার পাশে এই গাছ রয়েছে। আগরতলায় কলেজটিলার কলেজ চত্বরে, শহরের অন্য রাস্তার ধারে কিছু গাছ রয়েছে।

গাছটি খুব দ্রুত বর্দ্ধনশীল। গুড়ির নীচ হতে গজানো ডালপালা অনেকটা জায়গা জুড়ে বড় ছাতার মত ছড়িয়ে পড়ে। ৪০/৫০ বছরে গাছের উপরিভাগ ডালপালার ভারে বেশ ভারী হয়ে উঠে, ফলে ঝড়ে ডালপালা ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা থাকে। ত্রিনিদাদে প্রায় ১০০ বছর বয়সের একটি বিলিতী শিরীষ গাছ রয়েছে যার গুড়ির ব্যাস ২.৫ মিটার, উচ্চতা ৪৫ মিটার এবং এর ডালপালা প্রায় ৫৫ মিটার জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে।

বড় আকারের এই বৃক্ষটির বাকল খসখসে, গাঢ় ধোঁয়াটে রঙের। গুড়ি বেশি লম্বা হয় না।

পাতা গাঢ় সবুজ, যৌগিক, দ্বিপক্ষল। মধ্যশিরার দুপাশ হতে জোড়ায় জোড়ায় বের হওয়া উপশিরায় ছোট ছোট পত্রকগুলি সাজানো থাকে । লেগুমিনোসী গোত্রের অন্য অনেক গাছের মত এর পত্রকগুলি ঠান্ডা আবহাওয়ায় এবং রাত্রিবেলায় ভাজ হয়ে নীচের দিকে ঝুলে পড়ে। গরম আবহাওয়ায় এবং দিনের বেলা পত্রকগুলি খুলে ছড়িয়ে থাকে যাতে বেশী করে সূর্য্যের আলো শোষণ করতে পারে। এই ঘটনা পাতার 'রাত ঘুম' নামে পরিচিত।

ছোট গোলাপী রঙের ফুলগুলি মুণ্ডুক পুষ্পবিন্যাসে সাজানো থাকে। গোলাপী রঙের পুংকেশরগুলি ফুলের অন্য অংশের তুলনায় বেশ বড় এবং এদের জন্যই ফুলকে বেশ সুন্দর দেখায়। মার্চ হতে আগষ্ট পর্যন্ত গাছে ফুল ফোটে। শীতের শেষে গাছের পাতা ঝড়ে যায়। মার্চ পর্যন্ত নূতন পাতা গজায় এবং ঐ সময়েই গাছে প্রথম ফুল দেখা যায়।

ফল সরু, লম্বা, চ্যাপ্টা। ফলের শাঁসে বীজগুলি ঢাকা থাকে। স্বচ্ছ পর্দা দিয়ে বীজগুলি একে অন্য হতেআলাদা থাকে। গাছের শেকড় মাটির বেশী নীচে যায় না। কিন্তু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এদের প্রভাবে গাছের কাছাকাছি অন্য বড় গাছ জন্মায় না। লেগুমিনোসি গোত্রের তেঁতুলের মত বিলেতী শিরীষের ফলও খাদ্যেপযোগী। পাকা ফলের শাঁস বেশ মিষ্টি এবং এর সুন্দর গন্ধও রয়েছে। এজন্য ছোটরা এ ফল বেশ পছন্দ করে। তবে এর বীজ সহজে হজম হয় না। শুকনো ফল গুড়া করে পশুখাদ্য হিসাবে

ব্যবহার করা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন দেশ হতে এই পশুখাদ্য বিদেশে রপ্তানী কার হয়।

শোভাবর্দ্ধনকারী উদ্ভিদ হিসাবে বিলাতি শিরিষ সত্যি অতুলনীয়। রাস্তার পাশে লাগানো এই গাছের ডালপালা অনেক সময় পুরো রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে থাকে।

শুকনো ও ভিজে দুরকম মাটিতেই এই গাছ বেশ ভাল বাড়ে। অনুর্বর জমিতেও এ গাছ সহজে বাড়ে। খোলা জায়গায় চারিদিকে ডালপালা ছড়িয়ে গেলেও ঘনভাবে লাগানো গাছের গুড়ি বেশ লম্বা হয় এবং তা হতে ভাল কাঠ পাওয়া যায়। কাঠ মোটামুটি শক্ত এবং উষ্ণমণ্ডলীয় দেশে এর বেশ চাহিদা রয়েছে। দেখতে এই কাঠ অনেকটা কাল ওয়ালনাট (Juglans regia) কাঠের মত। শুকালে এই কাঠ সামান্যই সংকুচিত হয় ফলে কাঁচা কাঠ হতে তৈরী আসবাবপত্র ইত্যাদিতে পরে ফাটল দেখা যায় না। দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় কোন কোন স্থানে নৌকা তৈরীতে এই কাঠের ব্যবহার রয়েছে। ■

সো বাবুল

Leucana leucocephala (Lamk) de Wit.

সমার্থক নাম ঃ ***L. glauca***

গোত্র ঃ **Leguminosae,**

উপগোত্র ঃ **Minosoidea**

Leucana শব্দটি গ্রীক শব্দ Leukania থেকে নেওয়া যার অর্থ সাদা করা, glauca অর্থ সমুদ্রনীল।.

এই গাছটি মধ্য আমেরিকার আদিবাসী। মায়া ও জোনোটেক সভ্যতার দৌলতে এই বৃক্ষটি কয়েক হাজার বছর আগে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয়দের মেক্সিকো জয় করার পর ফিলিপাইনের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ গড়ে উঠে। তারপরই সম্ভবতঃ পশুখাদ্য হিসাবে মেক্সিকো হতে ফিলিপাইনে সো বাবুলের আগমন ঘটে। সেখান হতে পরে

ইন্দোনেশিয়া, পুপুয়া, নিউগিনি, মালেয়শিয়া ও অন্যান্য দেশে এর বিস্তার ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীতে হাওয়াই, ফিজি, উত্তর অষ্ট্রেলিয়া, ভারত,পূর্বোত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তা ছড়িয়ে পরে। ভারতে প্রধানতঃ ছায়াতরু বা শোভাবর্দ্ধক উদ্ভিদ হিসাবে এর চাষ হয়ে থাকে। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে এর গাছ রয়েছে। আগরতলা শহরে বনমালীপুর ও কলেজটিলা প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি গাছ রয়েছে।

এই ছোট গাছটির বাকল অনেকটা মসৃণ, ধূসর বাদামী রঙের। গাছের গুড়ির নীচ হতেই ডালপালা গজায়। পাতা যৌগিক, দ্বিপক্ষল। পত্রকগুলি সরু লম্বাটে, ১০-৩০ টি পত্রক একটি উপশিরায় জোড়ায় জোড়ায় সাজানো। আবার উপশিরাগুলি জোড়া বেঁধে মধ্যশিরার দু পাশে থাকে। সাদা বা হলদেটে সাদা রঙের ছোট ফুলগুলি গোলাকার ছোট মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাসে সাজানো থাকে। প্রতি পাতার গোড়ায় এক বা একাধিক পুষ্পবিন্যাস দেখা যায়। ফল লম্বা চ্যাপ্টা। প্রতিটি ফলে অনেকগুলি শক্ত চকচকে বীজ থাকে। কচি ফল সবুজ ও স্বচ্ছ এবং তার বীজগুলি বাহির হতে পরিষ্কার দেখা যায়। পরিণত ফল লাল্‌চে রঙের।

বীজের আবরণ বেশ শক্ত, এজন্য বীজ বোনার আগে ভিজিয়ে না নিলে ভাল অঙ্কুরোদগম হয় না। সাধারণতঃ অনেক দিন পর্যন্ত বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বজায় থাকে। সো বাবুলের বিভিন্ন জাত রয়েছে। হাওয়াই জাতের গাছে এক বছরে ফুল ও ফল ধরে এবং প্রায় সারা বছর গাছে ফুল ও ফল দেখা যায়। এজন্য এই জাতটি অন্য জাতের চেয়ে তাড়াতাড়ি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং অল্প দিনের মধ্যে নিবিড় বনের সৃষ্টি করে। স্যালভাডোর বা পেরু জাত আস্তে বাড়ে এবং তাতে ফুল ফলও কম হয় এবং এই জাতের গাছ আকারে বড় হয়।

দ্রুতবর্দ্ধনশীল গাছ হলেও সো বাবুলের চারা প্রথম দিকে আস্তে বাড়ে, একটু বয়স হওয়ার পর তাদের বৃদ্ধির হার দ্রুত হয় এবং বাড়ন্ত গাছ এমন ভাবে ডালপালা ছড়ায় যে তাদের নীচে আলোর অভাবে অন্য গাছ পালা জন্মাতে পারে না। বড় গাছের ডালপালা কেটে দিলে, গুড়ি হতে সহজে নূতন ডালপালা গজায়। এই ক্ষমতার জন্য সো বাবুল গাছ হতে প্রতি বছর ভাল জ্বালানী কাঠ পাওয়া যায়।

উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে সমতলভূমি হতে ৫০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত স্থানে সর্বত্র এ গাছ ভালভাবে জন্মায়। এ গাছ বৃষ্টিপাত, সূর্যালোক, মাটির লবণাক্ততা, ভূ-পৃষ্ঠের ঢালের তারতম্য প্রভৃতির বিভিন্নতা সহ্য করতে পারে। তবে ছায়া অপেক্ষা খোলা জায়গায় এদের বৃদ্ধির হার অনেক বেশী।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব হিসাবে সো বাবুল প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ। এই গাছের পাতা, ফুল ফল, কচি ডালা প্রভৃতি বিভিন্ন অংশ উত্তম পশুখাদ্য। তবে এই গাছের জাতের ও

আবহাওয়া তারতম্যের উপর পশুখাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভরশীল। তবে প্রতি একরে এ গাছ হতে বছরে মোটামুটি ৬-১০টন পশুখাদ্য পাওয়া যায়, যাতে ৮০০ হতে ৪৩০০ পাউণ্ড প্রোটিন থাকে।

সো বাবুলের কিছু জাত যেমন স্যলভাডোর জাত ভাল দারু উৎপাদনক্ষম। ফিলিপাইনে পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, দ্রুত বর্দ্ধনশীল গাছ যেমন গামাই, ইউক্যালিপ্টাস, কদম, ইত্যাদির তুলনায় সো বাবুল হতে উৎপন্ন কাঠের পরিমাণ অনেক বেশী। এর কাঠ মণ্ড শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে বেশ উপযোগী। এছাড়া এই কাঠ হতে ভাল প্লাইউড হয়। শিল্পের কাঁচামাল ছাড়াও এই কাঠ, খুঁটি ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

বর্তমান পৃথিবীর জ্বালানী সমস্যা সমাধানে এই গাছ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। জ্বালানী হিসাবে হাওয়াই জাতের সো বাবুল অন্য জাত হতে উৎকৃষ্ট। এই কাঠ হতে বেশ উচ্চমানের কাঠকয়লা ও পাওয়া যায়। যা হতে ধূঁয়াহীন তাপ পাওয়া যায়। বিভিন্ন কাজে এই কাঠ কয়লার ব্যবহার হতে পারে।

বর্তমানে যেভাবে বনভূমি দ্রত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, সেখানে দ্রুত বনায়নে সো বাবুল সাহায্য করতে পারে। এই গাছ তাড়াতাড়ি বেড়ে একদিকে ভূমিক্ষয় রোধ করে, অন্যদিকে প্রতি বছর এর ডালপালা কেটে নানা কাজে ব্যবহার করা যায়।

জাভার কফি বাগানে ছায়াতরু হিসাবে এর চাষ করা হয়। কফি ছাড়া কোকো, চা ও সিঙ্কোনা চাষেও ছায়াতরু হিসাবে এ গাছ লাগানো যেতে পারে। কলা বাগানে সাধারণতঃ ছায়াতরুর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পোর্টোরিকোতে কলা বাগানে পরীক্ষামূলক ভাবে ছায়াতরু হিসাবে সো বাবুল লাগিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, এতে কলার ফলন প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যায়। বিভিন্ন ফসলের চাষে এই গাছের পাতা, ডাল, সবুজ সার হিসাবে কাজ করে। মধ্য আমেরিকায় ও ইন্দোনেশিয়ায় এই গাছের কচি পাতা ও ফল সবজী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পরিণত বীজ ভেজেও খাওয়া যায়। এই গাছের ফল ও কাঠ জলে সেদ্ধ করে এক প্রকার রঙ পাওয়া যায় যা কার্পাস বস্ত্র ও উল ইত্যাদি রাঙানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।

অষ্ট্রেলিয়া ও হাওয়াইতে নূতন জাতের সো বাবুল উদ্ভাবিত হয়েছে, যার ফুল বা ফল হয় না, এরূপ গাছ শোভাবর্দ্ধক উদ্ভিদ হিসাবে বিভিন্ন স্থানে লাগানো হয়েছে।

এই গাছের ভেষজগুণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না তবে আসামে ব্যথা উপশমে এই গাছের বাকলের ব্যবহারের কথা জানা যায়।

এর কোন কোন জাত আগাছার মত মাঠ-ঘাট ইত্যাদি তাড়াতাড়ি ছেয়ে ফেলে। এজন্য এগাছ লাগানোর সময় প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে সঠিক জাত নির্বাচন করা উচিত। ■

পুইক্কা তেতই

Parkia javonica (Lamk.) Mero

সমার্থক নাম ঃ *P. roxburghii / Mimosa biglobosa*

গোত্র ঃ Legominosae

উপগোত্র ঃ Mimosoidea.

অন্যনাম ঃ শিম বৃক্ষ/কুকি তেতই

এই গাছটির আদি বাসভূমি সম্ভবতঃ বাংলাদেশের সিলেট ও তার সন্নিহিত অঞ্চল। ভারতের আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, ও ত্রিপুরা রাজ্য এবং ভারতের বাইরে বার্মা ও মালয়ে এই গাছ জন্মায়। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে এই গাছ রয়েছে। সিপাহীজলায় কয়েকটি গাছ দেখেছি। চিরসবুজ বৃক্ষ জাতীয় গাছ। লম্বায় ২০-২৪ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাতা পক্ষল, যৌগিক। ফুলগুলি প্রায় গোলাকার মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাসে সাজানো থাকে। ফুল আকারে ছোট, হল্‌দেটে সাদা রঙের । ফল লম্বা সীমের মত। এক গোছায় ২০-৪০ টি ফল একটি লম্বা শক্ত বোঁটা হতে ঝুলতে থাকে। প্রতি ফল ১৫-৪০ সে.মি. লম্বা এবং ২-৪ সে.মি. চওড়া। প্রতি ফলে ১৫-৩০ টি বীজ থাকে। বীজ ডিম্বাকার। পরিণত বীজ কাল রঙের।

এর ফুল ও ফল সব্‌জী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মণিপুরীরা এর ফলকে মূল্যবান সব্‌জী হিসাবে মনে করেন। এই প্রজাতির বিভিন্ন জাতে ফলের আকার ও ফলনের সময় ইত্যাদির পার্থক্য দেখা যায়। পাহাড় অঞ্চলে জুলাই-আগষ্টে গাছে ফুল হয়, সমতলে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ফুলের সময়। বৃষ্টি বহুল স্থানে এই গাছ ভাল জন্মায়। সাধারণতঃ ৭-৮ বছরে গাছে ফুল আসে এবং একটি গাছ ৮০-৯০ বছর বেঁচে থাকে। ফলে ৩০-৩৬ শতাংশ প্রোটিন ও ৮-১২ শতাংশ অ্যামিনো এসিড থাকে। ফল ও পরিণত বীজ দুইই সব্জী হিসাবে খাওয়া হয়।

কাঠ আসবাবপত্র তৈরী ও অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়। ■

বিলাতী আমলী

Pithecolobium dulce (Roxb) Benth

সামার্থক নাম ঃ *Inga dulcis*

গোত্র ঃ **Leguminosae,**

উপগোত্র ঃ **Mimosoidea**

গণ সূচক শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ হতে এসেছে। "Pithekos" অর্থ বানর, "Lobos" অর্থ শিম জাতীয় ফল, সম্ভবতঃ বানর এই শিম জাতীয় ফল ভালবাসে বলেই এই নাম। প্রজাতি সূচক "Dulce" শব্দের অর্থ মিষ্টি, যা ফলের মিষ্টি শাঁসকে বুঝায়।

দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী এই কষ্টসহিষ্ণু বৃক্ষটি বর্তমানে ভারতের উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে বিশেষ করে তামিলনাড়ু রাজ্যে প্রচুর দেখা যায়। ত্রিপুরা রাজ্যে কোথাও কোথাও রাস্তার পাশে এই গাছ রয়েছে।

চির সবুজ বৃক্ষ জাতীয় গাছ। বাকল ধূসর। গাছটির কাণ্ড বেঢপ, সামঞ্জস্যহীন, অনেক সময়ে আঁকাবাঁকা। প্রায়ই গাছের গুড়ির নীচ হতে ছোট শাখা বের হয়। কোন কোন সময় এই গাছ গুল্মের মত হয় এবং বাড়ীর বেড়ার কাজে একে ব্যবহার করা হয়। আগরতলায় মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের সামনের বাগানে চারদিকে এক সময় বিলাতি আমলি গাছের বেড়া ছিল এবং সময়মত বাগানের বেড়া না ছাঁটায় এরা বেশ বড় বড় গাছে পরিণত হয়েছিল।

এই গাছের শাখায় পাতার গোড়াতে লম্বা কাঁটা জন্মায়। পাতা যৌগিক, দ্বিপক্ষল। পাতার মধ্যশিরা হতে দুটি শাখা বা উপশিরা বের হয় এবং প্রতি উপশিরায় দুটি করে পত্রক থাকে। অর্থাৎ যৌগিক পত্রক হলেও পত্রকের সংখ্যা মাত্র ৪। পত্রকগুলি ধূসর সবুজ রঙের, সূলাগ্র এবং প্রত্যেকের মধ্যশিরার দুপাশ অসমান। একটু দূর হতে পত্রকগুলি ছোট ছোট পাতার মত মনে হয়। ছোট আকারের সাদাটে ফুলগুলি ছোট ছোট গোলাকার পুষ্পবিন্যাসে সাজানো থাকে। লম্বা, কোঁকড়ানো, পাতলাটে ফলগুলোকে অনেক সময় পেঁচিয়ে থাকতে দেখা যায়। প্রতি ফলে ৬-৮ টি বীজ থাকে। বীজ মিষ্টি শাঁসে ঢাকা থাকে। জানুয়ারী হতে এপ্রিলে গাছে ফুল হয়। জানুয়ারীতে গাছে নূতন পাতা গজায় যা অনেক সময় তামাটে রঙের হয়ে থাকে। ফল পাকার সময় এপ্রিল হতে জুলাই।

ঠিক মত ছেঁটে রাখলে এই গাছ বাড়ীর বেড়ার কাজ দেয়। গাছে কাঁটা থাকায় এরা গরু ছাগল ইত্যাদির আক্রমণ কিছুটা প্রতিরোধ করে।

ফল খাদ্যোপযোগী, শাঁস মিষ্টি ও পুষ্টিকর। পাতা ও ফল ভাল পশুখাদ্য। কাঠের প্যাকিং বাক্স, গরুর গাড়ী প্রভৃতি কাজের জন্য ব্যবহার করা যায়। দ্রুত বর্দ্ধনশীল হওয়ায় জ্বালানীর কাজে ব্যবহারের জন্য অনেক জায়গায় এর চাষ করা হয়।

কোন কোন সময় গাছের বাকল জ্বরের ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

বীজ হতে সহজে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

পলাশ

Butea monosperma (Lamk) Taub

সমার্থক নাম ঃ *B. frondosa*

গোত্র ঃ Leguminosae

উপগোত্র ঃ Papilionoidea

নামের প্রথম শব্দ এসেছে বুটির তৃতীয় আর্ল জুন স্টুয়ার্টের সম্মানার্থে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী রকস্‌বার্গ এই নামকরণ করেন। monosperma শব্দের অর্থ এক বীজযুক্ত।

ছোট হতে মাঝারি আকারের পর্ণমোচী এই বৃক্ষটি ভারতের আদিবাসী এবং দেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। ঘাসজমি, জলা জমির কিনারা এবং লবণাক্ত জমিতে এই গাছ ভাল জন্মায়। মধ্য ভারতের পর্ণমোচী অরণ্যে প্রচুর পলাশ গাছ রয়েছে। গুজরাট ও সৌরাষ্ট্রের বালুকাময় অঞ্চলে এবং মহারাষ্ট্রের কোন কোন স্থানে প্রচুর পলাশ গাছ আছে। ভারতের বাইরে পাকিস্তান,বার্মা ও শ্রীলংকায় এই গাছ পাওয়া যায়। ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু পলাশ গাছ রয়েছে। আগরতলার ইন্দ্রনগর এলাকায় দু একটি গাছ রয়েছে। ত্রিপুরার বনভূমিতে *Butea parviflora* নামক একটি

বড় কাষ্ঠল লতা পাওয়া যায়। যা লতানে পলাশ নামে পরিচিত।

পলাশ গাছের কাণ্ড ও ডালপালা বাঁকানো ও গ্রন্থিযুক্ত। বাকল হাল্কা বাদামী বা ধূসর বর্ণের। পাতা যৌগিক ও ত্রিফলক যুক্ত। পত্রকগুলি আকারে বেশ বড়, কচি পাতা রেশমী রোমে ঢাকা থাকে। পরিণত পাতা রোমহীন, চর্মবৎ। শীতে পাতা ঝরে যায়। পত্রহীন গাছে ফেব্রুয়ারী হতে মার্চে ফুল ফোটে।

ফুল বেশ বড়, উজ্জ্বল লালচে কমলা রঙের, এর বৃতি কাল। ফুল ফুটলে গাছ ফুলে ফুলে লাল হয়ে যায়, যে জন্য পলাশকে 'বনের অগ্নিশিখা' বলা হয়। ভারতে কোন কোন অঞ্চলে হলদে রঙের পলাশ দেখা যায়। যার বৈজ্ঞানিক নাম *Butea monosperma* var. *lutea* এক মাত্র ফুলের রঙ ছাড়া দু-জাতের পলাশের মধ্যে অন্য অমিল দেখা যায় না। ফুলের কুঁড়ি ছোট রোমে ঢাকা।

এপ্রিল হতে জুন মাসে গাছে ফল আসে। এক বীজ বিশিষ্ট ফলগুলি কচি অবস্থায় সবুজ এবং সাদা রোমে ঢাকা থাকে। পাকা ফল বেশ হাল্কা এবং বাতাসে অনেক দূর ছড়িয়ে পড়ে।

খরা সহনশীল এই গাছ বুনো অবস্থায় জন্মালেও এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। এর কাঠ ভাল জ্বালানী, বাকল ট্যানিং-এ ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পলাশ কাঠ যজ্ঞে ব্যবহৃত হয়। পলাশ পাতা হতে তৈরী প্লেট, বাটি ইত্যাদি খাদ্য পরিবেশনে ব্যবহৃত হয়। বাকল কাটার পর গাছ হতে লালচে রঙের রস বের হয় যা " বেঙ্গল কিনো" নামে পরিচিত। শুকনো এই রস লালচে রঙের, পুরানো উদরাময় নিবারণে এর ব্যবহার রয়েছে। বীজে ১৭ থেকে ১৮ শতাংশ তেল থাকে। এই তেল স্বাদহীন। সাবান প্রস্তুতে এর ব্যবহার রয়েছে। আমাদের দেশে খর তেলের অভাব রয়েছে এজন্য সরিষা বা চীনাবাদাম তেলে নাইট্রোজেন যোগ করে বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার করা হয়। সামান্য প্রচেষ্টায় পলাশ জাতীয় গাছের বীজ হতে খর তেলের উৎপাদন বাড়ানো যায়। ভারতের কয়েকটি রাজ্যে যেমন তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে সামান্য পরিমাণ পলাশ তেল উৎপন্ন হয়। পলাশ বীজের তেল গোল ক্রিমি ও ফিতা ক্রিমির আক্রমণে উপকারী। কোন কোন অঞ্চলে পলাশ পাতা বিড়ি বাধার কাজে ব্যবহৃত হয়। ফুল হতে রঙ পাওয়া যায় এবং শিকড়ের বাকল হতে দড়ি তৈরী হয়।

টাটকা বীজ হতে নতুন গাছ জন্মায়। তবে বীজের চারা গজানোর ক্ষমতা বেশীদিন থাকে না। ছোট চারা অপেক্ষা ২/৩ বছর বয়স্ক চারা সহজে বাঁচে। তবে গাছটির বৃদ্ধির হার খুব কম। ■

চাকেম দিয়া

Dalbergia lanceolaria L.f.

গোত্র ঃ Leguminosae

উপগোত্র ঃ Papilionoidea
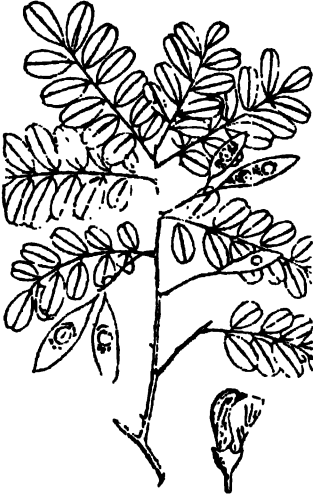
গণ সূচক নামটি এসেছে সুইডেনের উদ্ভিদ বিজ্ঞানী নিকোলাস ডালবার্গের নাম অনুসারে। প্রজাতি সূচক Lanceolaria শব্দের অর্থ শল্য চিকিৎসকের ছুরির মত। এতে ফলের আকৃতিকে বুঝায়।

এই গাছটি ভারতের সিকিম, তরাই অঞ্চল, বিহার প্রভৃতি স্থানের আদিবাসী। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে কখনো কখনো রাস্তার ধারে এ গাছ লাগানো হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের সোনামুড়া অঞ্চলে এ গাছ রয়েছে। আগরতলার কলেজটিলার পুরানো দু'নম্বর ছাত্রাবাসের পিছনে একটি গাছ রয়েছে।

লম্বা সুন্দর পর্ণমোচী গাছটির ডালপালা অনেকটা অবনত ধরনের। বাকল ধূসর রঙের। গাছ হতে মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো বাকল খসে পড়ে। পাতা যৌগিক, পক্ষল সচূড়, পত্রক ছোট আকারের। প্রতি পাতার শীর্ষ পত্রক অন্য পত্রক হতে একটু বড়। পত্রকগুলি নীচের দিকে ক্রমশঃ সরু এবং আগার দিক একটু খাঁজ যুক্ত।

ছোট ফিকে লাল রঙের ফুলগুলি এক পার্শ্বীয় স্পাইক পুষ্প বিন্যাসে সাজানো। পুষ্প বিন্যাসগুলি ডালার আগায় গোছা বেঁধে থাকে। বসন্তকালে গাছের পাতা ঝরে যায় এবং মে মাস পর্যন্ত গাছে নূতন পাতার সঙ্গে ফুলও দেখা দেয়। পুষ্পিত গাছের শোভা বেশ মনোরম। ফল চ্যাপ্টা, তীক্ষ্ণাগ্র এবং বোঁটা বেশ লম্বা। পাকা ফল হলদে রঙের। প্রতি ফলে এক-তিনটি বীজ থাকে।

কাঠ সাদা, বেশ শক্ত তবে দীর্ঘস্থায়ী নয়। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির হাতল, কৃষি সরঞ্জাম প্রভৃতির উপযোগী। কোন কোন সময় নির্মাণ কাজেও এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

বীজ হতে পাওয়া তেল বাতে উপকারী। বাকলের নির্যাস পেটের অসুখে উপকারী। ম্যাদী জ্বরে এর বাহ্যিক ব্যবহার হয়ে থাকে। ■

শীত শাল

Dalbergia latifolia Roxb.

গোত্র : **Leguminosae,**

উপগোত্র : **Papilionoidea**

গণ সূচক নামটি এসেছে নিকোলাস ডালবার্গের নাম অনুসারে। প্রজাতি সূচক শব্দের অর্থ চওড়া পাতাযুক্ত।

এই গাছটির আদি বাসস্থান বহির্হিমালয়, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত। ভারতের অনেক রাজ্যে কোন কোন সময় এই গাছ লাগানো হয়। ত্রিপুরায় এই গাছ রয়েছে। সিপাহীজলার বন প্রশিক্ষণ বিভাগের সামনে কয়েকটি গাছ রয়েছে।

পর্ণমোচী এই বৃক্ষটির বাকল ধূসর রঙের এবং তাতে মাঝে মাঝে ফাটল থাকে। অনেক সময় বাকলের টুকরা গাছ হতে খসে পড়ে। দক্ষিণ ভারতে এই গাছ বেশ লম্বা হয় কিন্তু উত্তর ভারতে ততটা লম্বা হয় না। পাতা যৌগিক, পক্ষল, সচূড়। পত্রকের অগ্রভাগ ভোঁতা। মধ্যশিরার উপর পত্রকগুলি একান্তরভাবে সাজানো থাকে।

ফুল ছোট, সাদাটে রঙের। আকৃতি মটর ফুলের মত। ফলগুলি পাতার মাঝে গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় থাকে। ফল চ্যাপ্টা, চ্যামটির মত। পাকা ফলের রঙ বাদামী। প্রতি ফলে এক থেকে তিনটি বীজ থাকে। গরমের সময় গাছে নূতন পাতা গজায়। এপ্রিল-আগষ্টে ফুল ফোটে।

শীতশালের কাঠ বেশ মূল্যবান। নানা প্রকার আসবাবপত্র তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে। বাঁকানো হাতল ইত্যাদি যুক্ত চেয়ার তৈরীতে এই কাঠ বেশ উপযোগী। কাঠ বেশ শক্ত, কালচে গোলাপী রঙের এবং ভাল পালিশ নেয়।

পাতা ঘন হওয়ায় ছায়াতরু হিসাবেও এই গাছ বেশ উপযোগী।

ভেষজ গুণ হিসাবে এই গাছ তিক্ত স্বাদ যুক্ত এবং অগ্নিবর্দ্ধক। কুষ্ঠ, স্থূলতা ও ক্রিমির উপদ্রবে এর ব্যবহার রয়েছে। ■

শিশু

Dalbergia sisso Roxb ex Dc.

গোত্র : Leguminosae.

উপগোত্র : Papilionoidea

প্রজাতি সূচক শব্দটি বাংলা ভাষা হতে নেওয়া। এই গাছটির আদি বাসস্থান বহিঃ হিমালয়। কিন্তু বর্তমানে ভারতের প্রায় সর্বত্র এই গাছ পাওয়া যায়। ভারত ছাড়া নেপাল, পাকিস্তান, প্রভৃতি দেশেও এই গাছ জন্মায়। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই গাছ রয়েছে। আগরতলায় মঠ চৌমুহনী হতে কলেজ রোড দিয়ে একটু দক্ষিণে গেলে রাস্তার পশ্চিম পাশে একটি শিশু গাছ ছিল। রাস্তার পাশের সব গাছ কাটায় বর্তমানে ঐ গাছটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

নাম শিশু হলেও এটি একটি পর্ণমোচী বড় বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। এর বাকল ধূসর রঙের এবং তা হতে লম্বা সরু টুকরা খসে পড়ে। পাতা যৌগিক, পক্ষল সচূড়। আঁকা বাঁকা মধ্য শিরায় পত্রকগুলি একান্ত ভাবে সাজানো থাকে। শীর্ষ পত্রক অন্যদের তুলনায় আকারে বড়। পাতার কক্ষে শাখান্বিত পুষ্টগুচ্ছে ছোট ছোট ফুলগুলি সাজানো থাকে। উপগোত্রীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফুলের আকার মটর ফুলের মত। এই প্রজাতিতে প্রতি ফুলে নয়টি পুংকেশর যুক্ত অবস্থায় থাকে। ফল পাতলা ফিতার মত লেগিউম বা শিম্বি জাতীয়। প্রতি ফলে অল্প কয়েকটি চ্যাপ্টা বীজ থাকে।

শীতে গাছের পাতা ঝরে যায়। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত গাছে নূতন পাতা গজায়। তখনই গাছে ফুল আসে। ফুলে বেশ সুন্দর গন্ধ রয়েছে। নভেম্বর মাস পর্যন্ত ফল পাকে। পাকা ফল ফেটে বীজ বের হয় না পাতলা ফল বাতাসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মাটিতে পড়ার পর ফলত্বক সহজে পচে যায় এবং বীজের অঙ্কুর বের হয়। বুনো অবস্থায় অনেক সময় নদী নালার পাশে জন্মায়। তখন জলের সাহায্যে ফলের বিস্তার ঘটে।

দারু উৎপাদনকারী উদ্ভিদ হিসাবে আমাদের দেশে সেগুনের পরই শিশুর স্থান। শুকনো আবহাওয়ার জন্য যেখানে সেগুন গাছ লাগানো যায় না, সেখানেও শিশু গাছ ভাল জন্মায়। উষর বনভূমিতে যেখানে অন্য গাছ সহজে জন্মায় না সেখানেও শিশু

গাছ লাগানো যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে এরিজানো ও ফ্লোরিডাতে ছায়াতরু হিসাবে রাস্তার ধারে এ গাছ লাগানো হয়েছে।

এর কাঠ দীর্ঘস্থায়ী এবং সহজে পরিপক্ক ও ব্যবহার উপযোগী করা যায়। আসবাবপত্র, খেলার সামগ্রী, ঘরের মেঝে, নৌকা তৈরী প্রভৃতি কাজে এর ব্যবহার রয়েছে।

কচি ডালপালা ও পাতা পশুখাদ্য। বীজ হতে পাওয়া তেল চর্মরোগে উপকারী। কাঠের গুঁড়া কুষ্ঠও অন্য চর্মরোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। বনে চাষ ছাড়াও রাস্তার পাশে, পার্কে, নদীর তীরে বা বাঁধের ধারে এ গাছ লাগানো যেতে পারে। লবণাক্ত মাটিতেও এ গাছ ভাল জন্মায় তাপমাত্রার তারতম্য সহ্য করতে পারে এবং কীট পতঙ্গের আক্রমণও প্রতিরোধ করতে সক্ষম। এজন্য এর চাষে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় না।

বীজ হতে সহজে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

পলিতা মাদার

Erythrina variegata L.

সমার্থক নাম ঃ *E. indica.*

গোত্র ঃ Leguminosae

উপগোত্র ঃ Papilionoidea.

অন্য নাম ঃ রক্ত মাদার / পল্‌তে মাদার।

গণসূচক Erthrina শব্দটি গ্রীক ভাষা হতে এসেছে। এর অর্থ লাল। লাল রঙের ফুল বুঝাতে এই শব্দ নেওয়া হয়েছে। প্রজাতি সূচক শব্দের অর্থ ভারতীয়।
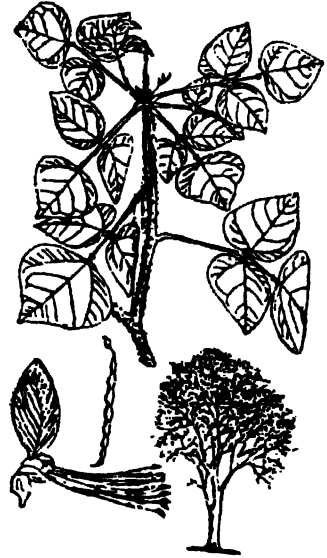
ভারতের উপকূল প্রদেশ ও মালয়ের আদিবাসী এই গাছটি পশ্চিম বাংলা, বিহার আন্দামান নিকোবর এবং উপকূলীয় বনভূমিতে পাওয়া যায়। ভারত ছাড়া বার্মা, জাভা, পলিনেশিয়া ও বাংলাদেশে এই গাছ রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে একে দেখা যায়। আগরতলা শহরেও এখানে সেখানে এই গাছ রয়েছে।

মাঝারি আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ। কাণ্ড নরম। বাকল চক্‌চকে। হলদেটে বা সবুজাভ ধূসর রঙের বাকল হতে কাগজের মত পাতলা টুকরা প্রায়ই খসে পড়ে। কাণ্ড ও ডালপালায় কাল গাত্র কন্টক রয়েছে। তবে কয়েক বছর পর এগুলি ঝরে পড়ে। পাতা যৌগিক, তাতে তিনটি বড় বড় পত্রক থাকে। বোঁটার নীচের দিকের পত্রক অপেক্ষা অগ্রপত্রক আকারে বড় হয়। শীতে গাছের পাতা ঝরে যায় এবং পরবর্তী ফেব্রুয়ারী-মার্চ পর্যন্ত গাছ পত্রশূন্য অবস্থায় থাকে। বড় আকারের উজ্জল রক্তিম ফুলগুলি পত্রশূন্য ডালার আগায় জন্মায়। ফুল আসার পর গাছে নূতন পাতা আসে। ফুলের আকৃতি উপগোত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হলেও ধ্বজ আকারে অনেকটা বড় এবং পুং কেশরগুলি পাপড়ির তুলনায় বেশ লম্বা। ফল লম্বাটে এবং এতে আটটি পর্যন্ত বীজ থাকে। বীজগুলির মধ্যে ব্যবধায়ক পর্দা বিদ্যমান। কাঠ বেশ নরম। হালকা। কথায় বলে মাদার কাঠ কোন কাজের নয়, তবে হাল্‌কা জিনিসপত্র তৈরীতে মাঝে মাঝে এর ব্যবহার দেখা যায়।

ভেষজগুণ হিসাবে বাকল পেটের অসুখ ও জ্বরে ব্যবহার হয়। পাতার রস গাঁটের বেদনা ও কান ও দাঁতের ব্যথার উপকারী।

কাটিং হতে সহজে বংশবৃদ্ধি করা যায়। বাড়ীর বেড়ার খুঁটি বা লতানো গাছের বাহক হিসাবে এর ব্যবহার দেখা যায়। কচিপাতা ও ফল খাদ্যোপযোগী। পাতা ভাল পশুখাদ্য ফুল হতে লাল রং পাওয়া যায়। বাকল ট্যানিং এ ব্যবহার হয় এবং দড়ি তৈরীর উপযোগী। পুষ্পিত গাছ দেখতে বেশ সুন্দর। সাদা ফুল যুক্ত এক জাতের মাদার গাছ পাওয়া যায় যার নাম *Erythrina indica* var. *alba.* ■
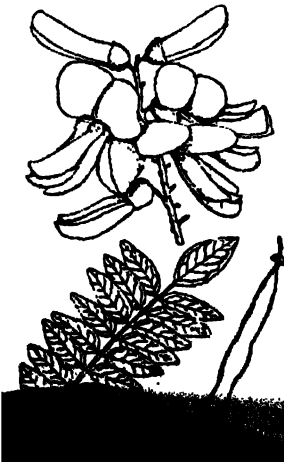
গ্লাইরিসিডিয়া

Glyricidia maculata H.B.K.

সমার্থক নাম ঃ *G. sepiun*

গোত্র ঃ Leguminoae

উপগোত্র ঃ Papilionoidea

গণ সূচক শব্দটি এসেছে দুটি ল্যাটিন শব্দ হতে "Ilis" অর্থ dormouse বা কাঠবিড়ালীর প্রাণী, "Caedre" অর্থ মারা। প্রসঙ্গত

এই গাছের বীজ ইঁদুর মারার বিষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রজাতি সূচক Maculata শব্দের অর্থ দাগ যুক্ত এতে পাতার নীচের দিকে ছোট গ্রন্থি এবং কচি ডালার সাদা দাগকে বোঝায়। Sepium শব্দের অর্থ বাড়ী বা বাগানের বেড়া, এই গাছের ডালা একাজে ব্যবহৃত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণ মণ্ডলের আদিবাসী এই গাছটি বর্তমানে অনেক দেশে জন্মায়। ভারতের মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ও কেরালায় এই গাছ প্রচুর রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য রজ্যেও এই গাছ কিছু কিছু রয়েছে। ত্রিপুরায়ও কেউ কেউ বাড়ীর বেড়ার জন্য এই গাছ লাগিয়ে থাকেন। আগরতলা ও তার আশে পাশে এই গাছ অনেক রয়েছে। কলেজ টিলার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বেশ কয়েকটি বড় গাছ রয়েছে। ফেব্রুয়ারী-মার্চ পর্যন্ত পত্রশূন্য গাছগুলি যখন ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় তখন দেখতে বেশী সুন্দর লাগে। এই বৃক্ষজাতীয় গাছটির গুড়ি বেশী লম্বা হয় না। বাকল ধূসর রঙের, নরম, তাতে লম্বা ফাটল থাকে। গুড়ি হতে ডালগুলি বের হয়ে সোজা উপরের দিকে উঠে। কচি ডালায় ছোট ছোট সাদা দাগ দেখা যায়। পাতা লম্বা, যৌগিক, পক্ষল, সচূড়, শীতে সব পাতা ঝরে যায় এবং ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত নেড়া গাছ সাদা বা হাল্কা বেগুনী রঙের ফুলে ছেয়ে যায়। ফুলের আকৃতি মটর ফুলের মত। ফুল আসার পর গাছে নতুন পাতা গজায়। ফল লম্বা, চ্যাপ্টা, এবং তাতে এক সারি বীজ থাকে।

গাছটি দ্রুত বর্দ্ধনশীল। প্রতি বছর ডালপালা ছেটে দিলেও গাছের কোন ক্ষতি হয় না। ডালা কাটার অল্প কিছুদিন পরেই গুড়ি হতে নূতন ডাল গজায়। প্রতি বছর ডাল না ছেটে দিলে ছড়ানো ডালপালা হতে গাছের চেহারা বিশ্রী হয়ে দাঁড়ায়।

সুন্দর ফুলের জন্য শোভা বর্দ্ধনকারী উদ্ভিদ হিসেবে বা কোন কোন অঞ্চলে ছায়াতরু হিসাবে এই গাছ লাগানো হয়। এর পাতা নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ এজন্য সবুজ সার হিসাবে এর ব্যবহার রয়েছে। বাড়ী বা বাগানোর বেড়ার জন্য এই গাছ উপযোগী। বীজ ইঁদুর নাশক। আমেরিকায় এই গাছের বাকলও ইঁদুর নাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কাটিং বা বীজ প্রথম বর্ষার পর লাগাতে হয়। কাটিং ঘন করে লাগালে গাছ ডালপালা না ছড়িয়ে সোজা উপরের দিকে উঠে যাতে বেড়ার কাজ চলে। গাছ যে কোন মাটিতে হতে পারে, তবে মাটি অনুর্বর হলে একটু বড় গর্ত করে কাটিং লাগানো উচিত। গাছ একটু বড় হলে ডালপালা ছেঁটে দিতে হয়, না হলে গাছে এত পাতা হয় যে তাতে অনেক সময় ডাল ভেঙ্গে পড়ে। ■

করঞ্জ

Pongamia pinnata (L.) Pierre

সমার্থক নাম ঃ *P. glabra*

গোত্র ঃ Leguminosae

উপগোত্র ঃ Paplionoidea

নামের প্রথম শব্দটি এসেছে এই গাছের তামিল নাম পোঙ্গম হতে, আর Pinnata গাছের পক্ষল যৌগিক পাতাকে বুঝায়, glabra অর্থ রোমহীন।

ভারতের আদিবাসী এই বৃক্ষটি হিমালয়ের পাদদেশ হতে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত দেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। তৈলবীজ হিসাবে অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যে এর চাষ হচ্ছে। ভারতের অন্য রাজ্যে এই গাছ পাওয়া গেলেও তেলবীজের জন্য চাষ হয় না। ত্রিপুরা রাজ্যেও এ গাছ রয়েছে। আগরতলায় সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু করঞ্জ গাছ লাগানো হয়েছে। এদের মধ্যে আখাউড়া রোডে মন্ত্রী অফিসের সামনে ও কলেজটিলায় বেশ কিছু গাছ রয়েছে।

বৃক্ষজাতীয় এই গাছ মাঝারি ধরনের উচ্চতা বিশিষ্ট। পাতা যৌগিক পক্ষল, ৫-৯ টি পত্রক বিশিষ্ট। অনেক সময় পাতায় বিভিন্ন পোকার আক্রমণ দেখা যায়।

ফুল রেসিম পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। গোলাপী বা লাইলাক রঙের ফুলগুলি এপ্রিলের শেষ হতে জুন মাস পর্যন্ত ফোটে। ফল ৪-৬ সেমি লম্বা এবং প্রায় ২সেমি চওড়া। ফল পাকতে ৭/৮মাস সময় লাগে।

করঞ্জ কাঠ দীর্ঘস্থায়ী নয় এজন্য জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ছায়াতরু হিসেবে রাস্তার ধারে এই গাছ লাগালো যেতে পারে। পাতা হতে সবুজ সার হয়। করঞ্জ বীজের তেল বেশ মূল্যবান। বীজে ২৯ শতাংশ তেল থাকে। পরিশুদ্ধ তেল নিম তেলের মত অর্দ্ধখর, গন্ধযুক্ত ও তিক্তস্বাদের। সাবান তৈরী, চামড়ার কারখানা ও মেশিনে এর ব্যবহার রয়েছে। ঔষধ তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে। তেল চর্মরোগ প্রতিষেধক ও ক্ষত নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। এর খইল অনেকটা নিম খইলের মত কাজ করে। বহুবর্ষজীবী তেলবীজ হিসাবে এই গাছ জনপ্রিয় হতে পারে।

বর্ষায় বীজ হতে নূতন গাছ গজানো যায়। কাটিং হতেও বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

বকফুল

Sasbania grandiflora (L.) Poir.

সমার্থক নাম ঃ *S. aegyptiaca / Aeschymomene grandiflora*

গোত্র ঃ Leguminosae

উপগোত্র ঃ Papilionoidea

গণসূচক শব্দটি আরবী শব্দ হতে নেওয়া। প্রজাতি সূচক শব্দের অর্থ বড় ফুল। এ গাছটির আদি বাসস্থান মালয়, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশ। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রাস্তার ধারে বাড়ীর বাগানে, ধান ক্ষেতের আইলে প্রভৃতি নানা স্থানে একে দেখা যায়। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এ গাছ অনেক রয়েছে। আগরতলা শহর ও তার আশপাশে অনেকের বাড়ীতে বকফুল গাছ রয়েছে।

ছোট বৃক্ষজাতীয় গাছটি বেশ দ্রুত বর্দ্ধনশীল। চারা লাগানোর দুবছরের মধ্যেই এটি ৩ মিটারের বেশী লম্বা হতে দেখা গেছে। দ্রুত বর্দ্ধনশীল বৃক্ষ দ্বারা বনায়নে এই গাছ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করতে পারে। ইন্দোনেশিয়ায় বক ফুলের চাষ করে দেখা গেছে যে, এ হতে হেক্টর প্রতি তিন বছরে ২০-২৫ ঘন মিটার কাঠ পাওয়া যায়।

নরম কাণ্ডের এই বৃক্ষটির বাকল হাল্‌কা বাদামী। সরল কাণ্ডের উপর ডালপালা ছড়ানো থাকে। পাতা যৌগিক, এক পক্ষল। উজ্জ্বল সবুজ রঙের পত্রকগুলি মধ্যশিরায় জোড়ায় জোড়ায় বিন্যস্ত। বড় ফুলগুলি গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় পাতার কক্ষে জন্মায়। ফুলের আকৃতি মটর ফুলের মত। সাধারণতঃ প্রতি ফুলে ৫টি পাপড়ি থাকলেও বেশী পাপড়ী বিশিষ্ট ফুল ও কোন কোন সময় দেখা যায়। ফুলের রং সাদা, হাল্‌কা গোলাপী বা লাল্‌চে হয়ে থাকে। সাধারণতঃ সেপ্টেম্বর হতে নভেম্বরে গাছে প্রথম ফুল দেখা যায় এবং সমস্ত শীতকাল ও গরমের সময়ও ফুল ফোটে।

ফল লম্বা,, চতুষ্কোণাকার এবং তাতে অনেক বীজ থাকে। মে-জুন পর্যন্ত ফল পাকে। পাকা ফলের রং হলদে।

কচি পাতা ও ফুল সবজী হিসাবে খাওয়া হয়। পাতায় প্রায় ৩৩ শতাংশ প্রোটিন, প্রচুর খনিজ লবণ ও ভিটামিন রয়েছে।

ফুলে বেশ শর্করা থাকে। কোন কোন স্থানে কচি ফল ও সবজী হিসাবে খাওয়া

হয়। এর বীজ বেশ প্রোটিন সমৃদ্ধ।

গাছের কচি ডালা ও পাতা উত্তম পশুখাদ্য। জাভাতে পশুখাদ্যের জন্য এই গাছের চাষ করা হয় এবং গাছ ছেটে ছোট রাখা হয় যাতে গরু ইত্যাদি তা সহজে খেতে পারে। এই গাছের পাতায় পশুর পক্ষে ক্ষতিকারক কোন রাসায়নিক পদার্থ নেই এবং সুষম খাদ্যে পশুর যেরূপ বৃদ্ধি হয়, খড়ের সঙ্গে দৈনিক ১.৮ কেজি বকফুল পাতা খাওয়ালে অনুরূপ বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

এই গাছের পাতা সবুজ সার হিসাবেও উৎকৃষ্ট। দক্ষিণ এশিয়ার কিছু দেশে এজন্য ধান ক্ষেতের পাশে এই গাছ লাগানো হয়। এই গাছ হতে পাওয়া সবুজ সারের পরিমাণ সবুজ সারের জন্য সাধারণতঃ চাষ করা ধনচে বা বুনো নীল হতে বেশী।

এই গাছের কাঠ নরম হওয়ায় দারু উৎপাদনকারী উদ্ভিদ হিসাবে ততটা মূল্যবান নয়। তবে জ্বালানী হিসাবে এর কাঠ অনেক দিন হতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে কাগজের মণ্ড তৈরীতে এই কাঠের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। দেখা গেছে যে, এর তন্তুর দৈর্ঘ্য, রাসায়নিক গঠন প্রভৃতি এ কাজের জন্য বিশেষ উপযোগী।

তাইওয়ান ও ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিক্ষয়ে বিনষ্ট পাহাড়ের বনায়নে এই গাছ ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া গেছে। এর বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতাও বেশী এবং এর চারা সব রকম মাটিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে এবং বিভিন্ন আগাছা এর চারার বিশেষ ক্ষতি করতে পারে না।

দক্ষিণ এশিয়ার কিছু দেশে রাস্তার ধারে বকফুল গাছ লাগানো হয়েছে যা শোভাবর্দ্ধনকারী এবং ছায়াতরু হিসাবে কাজ করে। কোথাও কোথাও গোলমরিচ ও পানের লতার বাহন হিসাবে এই গাছ লাগানো হয়, যারা বাহনের কাজ করা ছাড়াও ঝরা পাতা দিয়ে জমির উর্বরতা বাড়ায়। ইন্দোনেশিয়ায় চন্দন চাষে প্রাথমিক পোষক হিসাবে বকফুল গাছ লাগানো হয়।

এই গাছের বাকল হতে এক প্রকার পরিষ্কার আঠা পাওয়া যায়। যা নানা কাজে ব্যবহৃত হয়।

ভেষজগুণ হিসাবে এর বাকল কষায় এবং বসন্ত রোগে প্রাথমিক অবস্থায় উপকারী। বোম্বাই অঞ্চলে মাথাধরা ও সর্দিতে পাতা ও ফুলের রস ব্যবহৃত হয়। লাল বকফুলের শেকড় বাতে উপকারী।

বীজ বা কাটিং হতে সহজে বংশবৃদ্ধি করা যায়। চারার বিশেষ যত্ন নিতে হয় না। সব রকম মাটি এর চাষে উপযোগী। ■
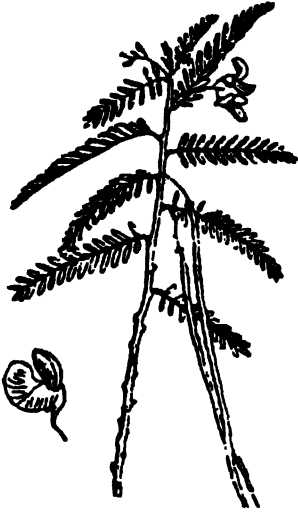
জয়ন্তি

Sesbania sesban Weight & Arn

সমার্থক নাম ঃ ***Aeschy nomene sesban***

গোত্র ঃ **Leguminonae**

উপগোত্র ঃ **Papilionoidea**

নাম ও প্রজাতি সূচক শব্দ দুটি আরবী ভাষা হতে এসেছে।

এই গাছের আদি বাসভূমি আফ্রিকার উষ্ণ মণ্ডল, ভারতের পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরাতেও এই গাছ পাওয়া যায়। আগরতলায় কৃষ্ণনগর ও ইন্দ্রনগরে এই জাতের কিছু গাছ রয়েছে।

দ্রুত বর্দ্ধনশীল গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ জাতীয় এই গাছটি বেশী দীর্ঘজীবী হয় না। বাকল হাল্‌কা বাদামী রঙের। পাতা যৌগিক, এক পক্ষল। এর ছোট ছোট পত্রকগুলি মধ্যশিরার দু-পাশে জোড়ায় জোড়ায় বিন্যস্ত। হলদে বা লালচে রঙের ফুলগুলি গোছা বেঁধে লম্বা বোঁটা হতে ঝুলতে থাকে। ফুলের আকৃতি মটর ফুলের মত। প্রতি ফুলে দশটি পুংকেশর দুটি গুচ্ছে (৯ +১) থাকে। সরু লম্বা ফলগুলি গাছ হতে ঝুলতে দেখা যায়। প্রতি ফলে অনেকগুলি বীজ থাকে। শীতে ও বর্ষায় গাছে ফুল ফোটে।

এই প্রজাতির মধ্যে বিভিন্ন জাত রয়েছে। এদের প্রধান পার্থক্য ফলের রং। যেমন লাল, হলদে, মেরুন, হলদে গোলাপী মিশ্রণ, চকলেট রং প্রভৃতি।

বাড়ী বা জমির বেড়ার কাজে অনেক সময় এ গাছ লাগানো হয়ে থাকে। তবে ছেঁটে না রাখলে এক বছরে গাছ ৩-৪.৫ মিটার লম্বা হয়ে যেতে পারে।

কাঠ খুব নরম, সাদা। এই গাছের কাঠ কয়লা আগে বারুদ তৈরীতে ব্যবহৃত হত। আসামে এর ডাল চিরে তা দিয়ে মাদুর বা চাটাই বোনা হয়। বার্মায় এর কাঠ হতে খেলনা তৈরী করা হয়। বাকল হতে পাওয়া তন্তু দড়ি ইত্যাদি তৈরীতে কাজে লাগে। পাতা ও কচি ডালা ভাল পশুখাদ্য।

এর ভেষজ গুণও রয়েছে। বীজ পেটের অসুখ, চর্মরোগ, প্লীহার পীড়া,ক্ষত প্রভৃতিতে উপকারী। পাতার পুলটিস ক্ষত ফুলায় উপকারী। শেকড় বিছার কামড়ে উপকারী। হিন্দুদের পূজাতেও জয়ন্তীর ব্যবহার রয়েছে। দুর্গাপূজায় জয়ন্তীর ডালা নব পত্রিকার একটি উপাদান।

গাছটি ২/৩ বছরের বেশী বাঁচে না। বীজ হতে সহজে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

ঝাউ

Casuarina equisetifolia Forst

গোত্র : Casuarinaceae
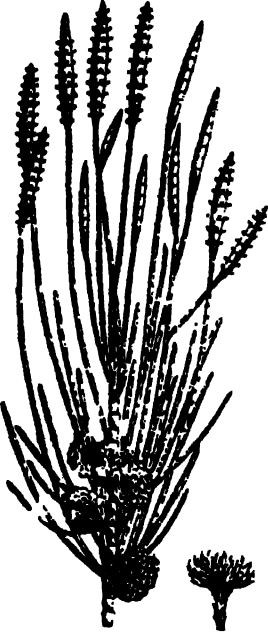
গণ সূচক শব্দটি ল্যাটিন Casuarinus শব্দ হতে এসেছে। যাতে এই গাছের ডালার পালকের সঙ্গে সাদৃশ্য বোঝায়। প্রজাতি সূচক শব্দে equisetum এর মত পাতা বোঝায়।

এই বৃক্ষটির আদি বাসস্থান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম হতে পূর্বদিকে ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলি হতে আরম্ভ করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ ও অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সলেণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। ভারতবর্ষের সাগর উপকূলের বিভিন্ন জেলায় বর্তমানে এর চাষ হয়। শিবপুরের জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে ১৭৯৮ সালে ফ্রান্সিস হ্যামিলটল চট্টগ্রাম অঞ্চল হতে এনে এর প্রথম চাষ করেন। বর্তমানে ভারতের পূর্ব উপকূলে মাদ্রাজ হতে পুরী পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে এবং পশ্চিম উপকূলে দক্ষিণ কান্নাড়া, রত্নগিরি ও বোম্বাই অঞ্চলে প্রচুর ঝাউবন দেখা যায়। মূলতঃ সমুদ্রোপকূলের গাছ হলেও ত্রিপুরায় এই গাছ কিছু পরিমাণে রয়েছে। আগরতলার কলেজটিলায় এর বেশ কিছু গাছ লাগানো হয়েছিল, যার দু একটি এখনো টিকে রয়েছে।

এই চির সবুজ গাছটি দ্রুত বর্দ্ধনশীল। ৩০ মিটার বা তার চেয়ে বেশী লম্বা হয়। কাষ্ঠল শাখার আগায় ছোট ছোট সবুজ শাখা থাকে যার পর্ব হতে ছোট ছোট শল্কপত্র জন্মায়। দূর হতে দেখলে গাছটিকে পাইন গাছের মত দেখায়। তবে পাইনের পাতা ঝাউর সবুজ শাখা হতে ছোট।

ফুল একলিঙ্গ, খুব ছোট, প্রায় দেখাই যায় না। পুং পুষ্পে একটি পুং কেশর ও দুটি শল্ক থাকে এবং এরা ছোট মঞ্জুরী বিন্যাসে সাজানো। স্ত্রী ফুল বর্তুলাকার মঞ্জুরীতে সাজানো। এই মঞ্জুরী পরিপক্ক হয়ে কাষ্ঠল প্রকৃতির হয়। বীজ খুবই ছোট পক্ষল।

কাঠ শক্ত হলেও আমাদের দেশে আসবাব ইত্যাদি তৈরীতে ব্যবহৃত হয় না। তবে জ্বালানী হিসাবে খুবই ভাল। দ্রুত বর্দ্ধনশীল হওয়ায় জ্বালানী সমস্যা সমাধানে এর চাষ করা যায়। কাঠ খনিতে খুটি বা স্তম্ভের কাজে বেশ উপযোগী। সমুদ্রোপোকূলে ভূমিক্ষয় নিবারক ও বায়ু প্রবাহ রোধক হিসাবে এই গাছ বেশ উপযোগী। শোভাবর্দ্ধনকারী উদ্ভিদ হিসাবে বাগানে এর চাষ করা যায়। রাস্তার ধারে ছায়াতরু হিসাবে এই গাছ লাগানো

যায়। টাটকা বীজ হতে নার্সারীতে প্রথমে চারা তৈরী করে নিতে হয় এবং এক বছর বয়সের চারা অন্যত্র রোপণ করতে হয়। ছায়াযুক্ত স্থানে এই গাছ ভাল বাড়ে না। দশ বছরের গাছ জ্বালানীর জন্য কাটা যায়। ৫০ বছরের বেশী পুরানো গাছ নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ■

বন নাইচ্চা

Trema orientales (L) BI

গোত্র ঃ Ulmaceae

অন্যনাম ঃ চিকুম

গ্রীক শব্দ Trema অর্থ ছিদ্র। এই দিয়ে এই গাছের ছিদ্রযুক্ত বীজের কথা বোঝায়। Orientales অর্থ পূর্বদেশীয়। দুয়ে মিলে পূর্বাদেশীয় ছিদ্রযুক্ত বীজের গাছ।
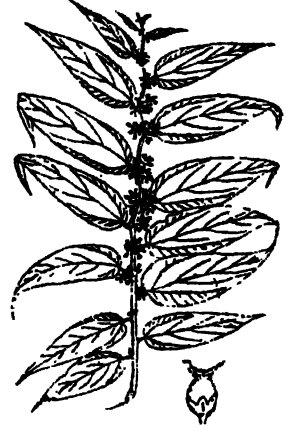
এই বৃক্ষটি ভারতের আর্দ্র অঞ্চলের আদিবাসী। বনাঞ্চলে এই গাছ আপনা হতেই প্রচুর জন্মায়। ত্রিপুরা রাজ্যেও এই গাছ বেশ রয়েছে। আগরতলা শহরে ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আনাচে কানাচে এই গাছ অনেক রয়েছে।

ছোট বৃক্ষ জাতীয় এই গাছটি দ্রুত বর্দ্ধনশীল তবে অন্য বৃক্ষের তুলনায় স্বল্পায়ু। ডালাপালা ছড়ানো। বাকল ধূসর বাদামী। পাতা সরল অনেকটা সরু, কিনারা দন্তুর, উপরের দিক খসখসে, নীচের দিক সাদাটে।

ফুল সাদাটে রঙের, আকারে ছোট। ফল কাল, কাণ্ডে পাতার বোটার কাছ হতে ফুল জন্মায়। ডিসেম্বর হতে এপ্রিলে ফুল ফোটে। আবার বছরের অন্য সময়ও ফুল ফুটতে দেখা যায়।

গাছের বাকলের ভিতরের দিগ হতে পাওয়া তন্তু দড়ি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। এবং এ হতে মোটা কাপড় ও বোনা যায়। ফল ছোট, খাদ্যোপযোগী, তবে দুর্ভিক্ষের সময় ছাড়া অন্য সময় সাধারণতঃ উহা খাওয়া হয় না। কাঠ হাল্কা নরম, জ্বালানী ছাড়া অন্য কোন কাজে লাগে না। তবে আগে এই গাছের কাঠ কয়লা বারুদ তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হত। প্রকৃতিতেই এই গাছ প্রচুর জন্মায়। ■

চামল

Artocarpus chaplasa Roxb

গোত্র ঃ **Moraceae**

অন্যনাম ঃ চাঁপলাস কাঁঠাল

গণ সূচক নামটি এসেছে দুটি গ্রীক শব্দ হতে "artos" অর্থ রুটি, "Karpos" অর্থ ফল। দুয়ে মিলে রুটি ফলের গাছ।

প্রজাতি সূচক শব্দটি স্থানীয় শব্দ হতে এসেছে। ভারতের আদিবাসী এই বৃক্ষটি নিম্ন হিমালয়ের নেপাল হতে আরম্ভ করে পূর্বদিকে বাংলা ও আসাম পর্যন্ত সর্বত্র পাওয়া যায়। এছাড়া আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেও এ গাছ রয়েছে। ভারতের বাইরে বার্মাও বাংলাদেশে এই গাছ জন্মায় । ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে এই গাছ রয়েছে। আগরতলায় শিবনগর ও ইন্দ্রনগর অঞ্চলে কয়েকেটি গাছ রয়েছে।

লম্বা পর্ণমোচী এই বৃক্ষ ৩০-৩৫ মিটার উঁচু হয়ে থাকে। গুঁড়ি সোজা, ১৮-২১ মিটার লম্বা। গোড়ার দিকে ডালপালা প্রায় থাকে না। বাকল ধোঁয়াটে বাদামী রঙের। গাছ হতে সাদা তরুক্ষীর বের হয়। পাতা সরল, আকারে বড়, উপরের দিকে গাঢ় সবুজ।

ফুল একলিঙ্গ, পুং ও স্ত্রী পুষ্প আলাদা পুষ্পবিন্যাসে জন্মায়। স্ত্রী পুষ্প বিন্যাস ফলে পরিণত হয়। ফল দেখতে কাঁঠালের মত । তবে আকারে বেশ ছোট, এবং এরা কাঁঠালের মত গাছের গুড়ি হতে বের না হয়ে উপরের ছোট ডালপালা হতে ঝুলতে থাকে। মাংসল পুষ্পপুট খাদ্যোপযোগী। তবে অম্লস্বাদ যুক্ত। বীজও কাঁঠালের বীজের মত খাদ্যোপযোগী, কিন্তু আকারে ছোট।

কাঠ হলদে বাদামী রঙের। খোলা অবস্থায় থাকলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে তা বাদামী বা গাঢ় বাদামী রঙের হয়ে উঠে। কাঠ দৃঢ় তবে এর উপরের দিকে ফাটল বা চীর ধরে। পাকা কাঠ দীর্ঘস্থায়ী। উঁই ও অন্যান্য পোকার আক্রমণ প্রতিরোধক্ষম। বিভিন্ন নির্মাণ কাজ যেমন জাহাজ তৈরী, আসবাব তৈরী ও চায়ের বাক্স তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে। প্লাইউড তৈরীতে এর ব্যবহার হয়।

বীজ হতে বংশবৃদ্ধি হয়। ■

কাঁঠাল

Artocarpus heterophylla Lamk

সমার্থক নাম **:** ***A. integra / A. integrifolia***

গোত্র **: Moracea**

প্রজাতি সূচক heterophylla অর্থ বিভিন্ন ধরনের পাতা। অনেক সময় কাঁঠাল গাছে চারা অবস্থায় পাতার কিনারা পরিণত গাছের পাতার মত অখণ্ড না হয়ে খণ্ডিত দেখা যায়। গণ সূচক শব্দে যদিও এ গাছকে রুটি ফল গাছ বা bread fruit tree বুঝায় প্রকৃত bread fruit tree-র বৈজ্ঞানীক নাম *Artocarpus incisus* বা *A. communis* যার বাসস্থান নিউগিনি অঞ্চলে এবং ত্রিপুরায় ঐ গাছ পাওয়া যায় না।

কাঁঠাল পশ্চিমঘাট পর্বতমালার আদিবাসী। তবে বর্তমানে ভারতের সর্বত্র এবং ভারতের বাইরে বাংলাদেশ ও বার্মাতে এই গাছ প্রচুর পাওয়া যায়। আমাদের দেশে ইতিহাসের আদিকাল হতে কাঁঠালের উল্লেখ পাই। গ্রীক ঐতিহাসিক থিওফ্রেটাসের খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দের লিখিত বিবরণে মিষ্টি ও বৃহৎ ফলযুক্ত এই বৃক্ষের কথা জানতে পারি, যার ফল ভারতীয় ঋষিরা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করত। ত্রিপুরার সর্বত্র এই গাছ জন্মায়। অনেক সময় জঙ্গলেও বুনো অবস্থায় কাঁঠাল গাছ দেখা যায়। বর্হিরাজ্যেও ত্রিপুরার কাঁঠালের সুনাম রয়েছে।

মাঝারি আকারের এই বৃক্ষটির কাণ্ড বেশ মোটা, বাকল গাঢ় বাদামি বা লালচে রঙের। ডালপালা ছড়ানো গাছের উপরিভাগ প্রায় গোলাকার। পাতা গাঢ় সবুজ। পাতা অনেকটা ডিম্বাকৃতি ও উপরের দিক চক্‌চকে। নীচের দিক একটু খস্‌খসে। বোঁটা ছোট, মধ্যশিরা বেশ দৃঢ় এবং তা হতে ৭-১০ জোড়া উপশিরা বের হয়।

ফুল আকারে ছোট, একলিঙ্গ। স্ত্রী ও পুং পুষ্পগুলি আলাদা পুষ্পবিন্যাসে সাজানো থাকে। একই গাছে দু প্রকার ফুল হয়। পুষ্পবিন্যাস বেলনাকার মুণ্ডক জাতীয়। পুং পুষ্পবিন্যাস ২-১০ সেমি লম্বা, অনেকটা মানুষের বুড়ো আঙ্গুলের মত। ফুলগুলি এত ঘন সন্নিবদ্ধ যে. তাদের আলাদা করে চেনাই যায় না। প্রথম এই পুষ্পবিন্যাসগুলি সবুজ রঙের থাকে, পরে বাদামী রঙের হয়ে গাছ হতে ঝরে যায়। স্ত্রী পুষ্পবিন্যাস হতে ফলের উৎপত্তি হয়। ফল যৌগিক, ফুলের মাংসল পুষ্পপুট খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

শীতের শেষে গাছে ফুল আসে। গ্রীষ্মে ফল পাকে, ছোট চারায় প্রথম দু এক বছর কেবল পুং পুষ্প দেখা যায়, পরে পুং ও স্ত্রী উভয় প্রকার পুষ্পবিন্যাস দেখা যায়। কোন কোন বয়স্ক গাছে মূল হতেও ফল জন্মায়।

কাঁঠালের ফল অন্য ফলের তুলনায় আকারে বড়, কোন কোন সময় একটি ফলের ওজন ৭০- ৮০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। ফল কাঁচা ও পাকা দু-ভাবেই খাওয়া যায়। কাঁচা ফল এচোড় নামে পরিচিত এবং সব্জি হিসেবে এ বেশ জনপ্রিয়, কোন কোন স্থানে একে গাছ পাঠাও বলা হয়। পাকা ফল গরীব ধনী নির্বিশেষে জনপ্রিয়। কেউ কেউ পাকা ফলের বিশেষ গন্ধের জন্য একে পছন্দ করে না। পাকা ফলে খাদ্যোপযোগী অংশের প্রকৃতি অনুযায়ী কাঁঠাল খাজা (শক্ত) বা গলা (রসালো) দু প্রকার হয়ে থাকে। ফলের বীজও বিভিন্ন ভাবে খাওয়া যায়।

কাঠ হলদে রঙের, বেশ ভাল। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও আসবাবপত্র তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে।

পাতা ভেষজ গুণযুক্ত। গ্রন্থি স্ফীতিতে পাতার রস উপকারী। অনেক সময় ক্ষত নিরাময়ে পাতার সেক দেওয়া হয়। বার্মার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা কাঁঠাল কাঠ হতে পাওয়া রঙ কাপড় রাঙানোতে ব্যবহার করেন। তরুক্ষীর হতে পাখী ধরার আঠা পাওয়া যায়।

এই গাছ প্রায় সব রকম মাটিতে জন্মায়। বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা হয়। গাছের মূল শিকড় সহজে নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য নির্বচিত স্থানে জমি তৈরী করে একবারে বীজ লাগানো উচিত। এই গাছ মাটিতে জল জমা সহ্য করতে পারে না। স্থান নির্বাচনে একথা মনে রাখা উচিত। ■

ডেউয়া

Artocarpus lakoocha Roxb

গোত্র ঃ Moraceae

অন্যনাম ঃ ডিফল/চাম

প্রজাতি সূচক শব্দটি সংস্কৃত ভাষা হতে এসেছে।

এই বৃক্ষটি ভারত, মালয় ও শ্রীলংকার আর্দ্র

সমতলভূমির আদিবাসী। পশ্চিম বাংলা ও বর্তমান বাংলাদেশের গ্রামের নিকটবর্তী ঝোপঝাড়ে এই গাছ বেশ পাওয়া যায়। ত্রিপুরা রাজ্যেও বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ রয়েছে। আগরতলা কলেজটিলায় বিজ্ঞান ভবনের পূর্বদিকে একটি গাছ রয়েছে।

মাঝারি আকারের সুন্দর গাছটির গুড়ি বেশী বড় হয় না গাছের উপরের অংশ প্রায় গোলাকার। কচি ডালপালার বাকল মসৃণ কিন্তু গুড়ির বাকল এবড়ো খেবড়ো। পাতা আকারে বড়, চামড়ার মত। পাতার উপর দিক মসৃণ, নীচের দিক রোমযুক্ত। বোঁটা ছোট এবং বোঁটার গোড়ার দিক লাল্‌চে রঙের। গোলাকার পুষ্পবিন্যাসে ছোট ছোট ফুলগুলি সাজানো থাকে। ফুল একলিঙ্গ। একই গাছে ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পবিন্যাসে স্ত্রী ও পুং পুষ্প জন্মায়। পুং পুষ্পবিন্যাস কমলা রঙের, স্পঞ্জের মত এবং তা গাছ হতে ঝরে পড়ে। ছোট বেলায় শ্লেট মোছার জন্য অনেকে হয়ত এর ব্যবহার করে থাকবেন। স্ত্রী পুষ্পমুণ্ডক হতে অসমান আকৃতির ফল জন্মায়। ফলের খোসা মসৃণ, রঙ হলদে। শীতের সময় গাছের পাতা ঝরে যায়। মার্চ পর্যন্ত নূতন পাতা গজায়। একই সময় গাছে ফুলও আসে। বর্ষায় ফল পাকে। অনেক সময় জুলাই মাসে গাছে আবার পুং পুষ্প দেখা যায়।

পাকা ফলের একটা বিশেষ গন্ধ রয়েছে। বেশী অম্ল স্বাদের জন্য কাঁচা অবস্থায় ফল খুব কমই খাওয়া হয়। তবে চাটনী বা আচার হিসাবে অনেক সময় তা খাওয়া হয়। অনেক সময় পুং পুষ্পমুণ্ডক আচার তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।

কাঠ দীর্ঘস্থায়ী, বিভিন্ন প্রকার পোকার আক্রমণ প্রতিরোধক। ঘরের খুঁটি, বীম, বরগা ও নৌকা তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে। মূল হতে এক প্রকার হলদে রঙ পাওয়া যায়। বীজ রেচক। বীজ ও গাছের আঠা রেচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ফল যকৃতে উপকারী। বাকল চর্মরোগ নাশক।

বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ৫/৬ বছরে গাছে ফল ধরে। ■

বট

Ficue benghlensis L.

গোত্র : Moraceae

গণ সূচক Ficus শব্দটি এসেছে ডমুরের প্রাচীন ল্যাটিন নাম হতে। প্রসঙ্গতঃ ডুমুর ও Ficus গণভূক্ত গাছ। Ficus গণের অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৬০০ প্রজাতি এই পৃথিবীতে

পাওয়া যায়। আমাদের ত্রিপুরাতেও এর প্রায় ২৪টি প্রজাতি রয়েছে। প্রজাতি সূচক benghlensis দ্বারা বঙ্গদেশে জাত বুঝায়।

বট গাছ চেনে না এমন লোক সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে পাওয়া যাবে না। এর ইংরাজী নাম banyan tree-র উৎপত্তি বেশ কৌতহলোদ্দীপক। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দিতে ইউরোপীয় বণিকরা পারস্যোপসাগরের তীরবর্তী কোন অঞ্চলে এই প্রজাতির কোন বৃক্ষের নীচে ভারতীয় হিন্দু বণিকদের সঙ্গে মিলিত হত। ব্যবসায়িক কথাবার্তা ছাড়াও হিন্দু বণিকরা এই গাছের নীচে নিজেদের পূজা ইত্যাদির কাজও করত। হিন্দু বেনিয়াদের প্রিয় গাছ পরবর্তী সময়ে banyan tree নামে পরিচিতিলভে করে।

বট গাছের আদি জন্মভূমি সম্ভবতঃ নিম্ন হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল বা দক্ষিণ ভারতের পাহাড়ী অঞ্চল। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন স্থানে রাস্তার পাশে, মন্দির প্রাঙ্গণে বা গ্রামের নিকটস্থ খোলা মাঠে বটগাছ দেখতে পাওয়া যায়। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে বটগাছ রয়েছে। আগরতলার বিভিন্ন স্থানে বটগাছ থাকলেও বটতলার গোল চক্করের গাছটি কিন্তু বটগাছ নয়।

বড় বৃক্ষ জাতীয় এই গাছটির শাখা হতে শেকড় বা ঝুরি মাটিতে নেমে এসে স্তম্ভমূলে পরিণত হয় এবং তা মূল কাণ্ডের মত শাখা পল্লবকে ধরে রাখতে সাহায্য করে। পাতা বড় আকারের। ডিম্বাকৃতি, মসৃণ এবং তাদের উপরের দিক বেশ চকচকে। সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে গাছে নূতন পাতা গজায়। ফুল খুবই ছোট, উদম্বুর পুষ্পবিন্যাসে থাকে এজন্য বাইরে থেকে দেখা যায় না। সম্পূর্ণ পুষ্পবিন্যাস একটি ফলে পরিণত হয়। এপ্রিল হতে জুন পর্যন্ত ফল পাকে। বিভিন্ন পাখী ও বানর এই ফল পছন্দ করে। পাখীর মলের সঙ্গে বের হয়ে আসা এর বীজ হতে পুরানো দালান কোঠা বা অন্য গাছের উপর বটের চারা জন্মায়। পরজীবী হিসাবে জীবন শুরু করলেও শীঘ্রই তারা স্বাধীন বৃক্ষ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শিবপুরের ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের বিশাল বটগাছটির আরম্ভ নাকি এভাবে হয়েছিল। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে একটি খেজুর গাছে এর জীবন আরম্ভ

হয়। এর মূল কাণ্ডটি অনেক দিন নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমানে এর ঝুরি হতে গজানো সরু, মোটা প্রায় ১৮২৬ টি স্তম্ভমূল রয়েছে। এর উচ্চতা ২৪.৫ মিটার এবং এই বৃক্ষ অরণ্যটি ৩.৪ একর জমি জুড়ে অবস্থান করছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু বড় বটগাছ রয়েছে। আমাদের দেশে বট ও অশ্বত্থ দালান কোঠার বেশ ক্ষতি করে। পাখীর মাধ্যমে আনা বীজ হতে ছাদ বা দেওয়ালে গাছ গজায় এবং তাদের শেকড় ইটের ফাঁকে ঢুকে দালানের অনেক ক্ষতি করে। বনের অন্য গাছের উপর পরজীবী হিসাবে জন্মে তারা সেসব গাছের বিনাশ সাধন করে।

বটের আঠার নানা ভেষজ গুণ রয়েছে। টনিক হিসাবে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। কচি পাতা নাকি কুষ্ঠ রোগে উপকারী। পাতার পুলটিশ ফোড়া উপশম করে। বাকলের ক্বাথ বহুমূত্রে উপকারী।

বটের ফল গরীবরা দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। এর পাতা হাতীর প্রিয় খাদ্য। কাঠ বেশ শক্ত, তবে বিশেষ কাজে লাগে না। জলের নীচে এই কাঠ দীর্ঘস্থায়ী এছাড়া তাবুর খুঁটি, ছাতার হাতল প্রভৃতি তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে। ■

কৃষ্ণবট

Ficus Krishnae

গোত্র ঃ **Moraceae**

উদ্ভিদ বিজ্ঞানী C. de Candolle ১৯০১ সালে এই বৃক্ষটিকে নূতন প্রজাতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী সময় দেখা যায় যে এই বৃক্ষটি বট গাছেরই প্রকারভেদ। তাই কৃষ্ণবটের বর্তমান নাম *Ficus benghalensis* var. *Krishnea.*

সাধারণ গাছের সঙ্গে এর পার্থক্য এর পাতাগুলির তলার দিগ জুড়ে ঠোঙ্গার মত দেখতে হয়। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ নাকি ছোট বেলায় ননী চুরি করে এতে রাখতেন। বিভিন্ন স্থানে শোভা বর্দ্ধনকারী উদ্ভিদ হিসাবে এর

চাষ করা হয়।

পঞ্চাশের দশকে কলিকাতা হতে চারা এনে একটি কৃষ্ণবট গাছ কলেজটিলায় মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের ছেলেদের কমন রুমের পিছনে লাগানো হয়, যা কালক্রমে বেশ বড় বৃক্ষে পরিণত হয়। কলেজে থাকাকালীন প্রতি বছর ছাত্রদের এই সুন্দর গাছটি দেখাতাম। বছরখানেক আগে জানতে পারি কে বা কারা গাছটি নিশ্চহ্ন করে দিয়েছে। আমার জানা মতে, ত্রিপুরায় বর্তমানে আর এই জাতের গাছ নেই।

বীজ হতে এই গাছ জন্মায়। এই সুন্দর গাছটির এই রাজ্যে চাষের উদ্যোগ নেওয়া উচিত। ■

ডুমুর

Ficus hispida L.

গোত্র ঃ **Moraceae**

প্রজাতিসূচক শব্দের অর্থ শক্ত রোমযুক্ত .

এই গাছটি বাংলা, মধ্য বার্মা, শ্রীলংকা, চীন ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী। আমাদের দেশে বিভিন্ন স্থানের জঙ্গলে বা বাড়ীর আনাচে কানাচে এই গাছ দেখা যায়। ত্রিপুরায় এই গাছ অনেক রয়েছে।

ছোট বৃক্ষ বা বড় গুল্ম জাতীয় গাছ। বাকল ধূসর। পাতা আকারে বড়, শক্ত রোমযুক্ত। সাধারণতঃ অভিমুখ পত্রবিন্যাসে সাজানো। পাতার নীচের দিকের শিরাগুলি বেশ স্পষ্ট এবং কিনারা অনেকটা করাতের মত খাঁজ কাটা।

এর ফল Ficus গণভুক্ত অন্য প্রজাতির তুলনায় আকারে বড় এবং এরা গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় শাখায় ঝুলতে থাকে। মার্চ হতে জুলাই পর্যন্ত গাছে প্রচুর ফল হয়। অন্য সময়ও ফল হতে পারে তবে সংখ্যায় কম। কচি ডুমুর সব্জী হিসাবে খাওয়া হয়। পাতা পশুখাদ্য, এর বাকল হতে মোটা তন্তু পাওয়া যায়।

এর কাঠ হাল্‌কা ও অর্থনৈতিক গুরুত্বহীন। ডুমুরের ভেষজগুণও রয়েছে। ফল, বীজ ও গাছের বাকল বমনকারক। ফল চূর্ণ জলের সঙ্গে সেদ্ধ করে পুলটিশ হিসাবে

ব্যবহৃত হয়। গরুর দুধ ডুমুর খেলে শুকিয়ে যায়। মানুষের প্রয়াস ছাড়াই প্রকৃতিতে পাখী ইত্যাদির মাধ্যমে ছড়ানো বীজ হতে যত্রতত্র এই গাছ জন্মায়। ■

ভারতীয় রবার

Ficus elastica Roxb

গোত্র ঃ Moraceae
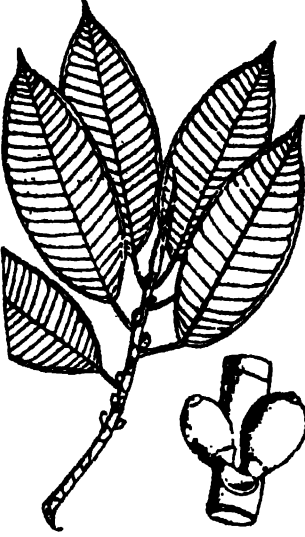
প্রজাতি সূচক elastica শব্দের অর্থ ভারতের রবার উৎপাদনকারী গাছ।

এই বৃক্ষের আদি বাসস্থান বহির্হিমালয়ের নেপাল হতে পূর্বদিকে আসাম, বার্মার উত্তরাঞ্চল। অন্যত্রও এ গাছের চাষ করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে কোথাও কোথাও এগাছ রয়েছে। আগরতলার কলেজটিলায় এর একটি বড় গাছ রয়েছে।

এই বৃক্ষের বাকল অনেকটা মসৃণ, লাল্‌চে বাদামী রঙের। পাতা আকারে বেশ বড়, সুন্দর, চক্‌চকে, চামড়ার মত। পাতা লম্বায় চওড়ার প্রায় তিনগুণ। মধ্যশিরা হতে উপশিরাগুলি সমকোণে উৎপন্ন হয়ে সমান্তরালভাবে ফলকে বিস্তৃত। মুকুলাবরণ হলদেটে গোলাপী বেশ লম্বা। অনেক সময় গাছের গোড়া হতে অধিমূল বের হয়। এই গাছের বায়বীয় মূল খুবই কম এবং বটের মত তাদের স্তম্ভমূলে পরিণত হতে দেখা যায় না। পাতার কক্ষে জোড়ায় জোড়ায় পুষ্পবিন্যাস, ফল দেখা যায়। ফল অনেকটা লম্বাটে। উজ্জ্বল হল্‌দেটে সবুজ রঙের।

আমাদের দেশে রাবারের উৎস হিসাবে এক সময় এর চাষ হত। আসামের উপজাতীয়রাই প্রথমে এজন্য এর চাষ আরম্ভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ পর্যন্ত সারা আসামে এর চাষ বিস্তৃত হয়। তবে আজকাল Hevea রাবারের চাষ প্রবর্তন হওয়ায়, রাবারের জন্য ভারতীয় রাবার গাছের চাষ বন্ধ হয়ে গেছে। কাঠ সাদা, তবে জ্বালানী ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হয় না। শোভাবর্দ্ধক উদ্ভিদ হিসাবে বিভিন্ন স্থানে এর চাষ হয়। ■
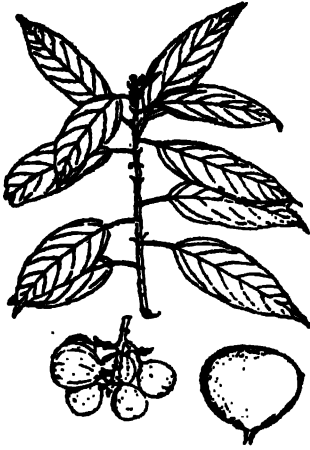
যজ্ঞ ডুমুর

Ficus racenosa L.

গোত্র ঃ **Moraceae**

প্রজাতি সূচক শব্দে পুষ্পবিন্যাসের বিশেষত্ব বুঝায়। ভারতের আদিবাসী এই বৃক্ষটি বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া যায়। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই গাছ রয়েছে। আগরতলা শহরে বনমালীপুর, ইন্দ্রনগর ও কলেজটিলায় কিছু গাছ রয়েছে। মাঝারি আকারের এই বৃক্ষটির বৈশিষ্ট্য হল এর ফল। ফলগুলি শাখা হতে গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় ঝুলতে থাকে। পাকা ফল লাল্‌চে রঙের। গাছের বাকল মসৃণ, লালচে বাদামী বা মরচে সবুজ। বাকলে মাঝে মাঝে ফাটল দেখা যায়। পাতা লম্বাটে সূক্ষ্মাগ্র। এপ্রিল হতে জুলাই পর্যন্ত ফল পাকে।

এই গাছের রস হতে পাখী ধরার আঠা তৈরী হয়। বাকল হতে এক ধরনের কাল রঙ পাওয়া যায়।

ফল অনেক সময় সব্জী হিসেবে খাওয়া হয়। তবে এর ফলে প্রায়ই বোলতা জাতীয় পোকার ডিম বা শূককীট থাকায় উহা খাদ্যোপযোগী থাকে না। শুকনো ফলের গুঁড়া ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে কেক ইত্যাদি তৈরী করা যায়। পাতা ও ফল পশুখাদ্য।

হিন্দুদের যজ্ঞের জন্য এর কাঠ প্রয়োজন। পাতা, বাকল ও ফল ভেষজ গুণযুক্ত। পাতায় হওয়া 'গল'(gall) দুধ ও মধু সহযোগে বসন্তের দাগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। বাকল গবাদি পশুর রিণ্ডার পেস্ট(Rinder pest) রোগের উপকারী। ■
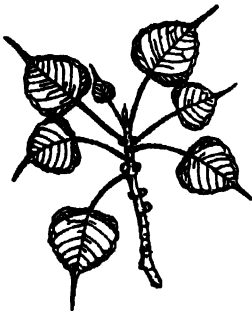
অশ্বত্থ

Ficus religiosa L.

গোত্র ঃ **Moraceae**

প্রজাতি সূচক শব্দে পবিত্র বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বুঝায়।

এই গাছের আদি বাসস্থান হিমালেয়ের পাদদেশ সন্নিহিত বঙ্গদেশ ও বার্মা অঞ্চল। ভারতের শুষ্ক মরু অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র এর চাষ হয়ে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামে বা রাস্তার পাশে এই গাছ লাগানো হয়ে থাকে।

আবার পাখির মাধ্যমে নিজ থেকেই এই গাছ বিভিন্ন স্থানে গজায়। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই গাছ রয়েছে। আগরতলা শহরেও এখানে সেখানে এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

বেশ বড় আকারের বৃক্ষ জাতীয় এই গাছটির বাকল মসৃণ, ধূসর রঙের। কাণ্ড হতে মাঝে মাঝে বাকলের টুকরা খসে পড়ে। ছোট আকারের গাছের কাণ্ড খর্বাকার এবং উপরিভাগ গোলাকার। তবে গাছ আকারে বড় হয়ে গেলে এই আকৃতি বজায় থাকে না। তখন মূল কাণ্ড হতে অনেক ডালা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

পাতা বেশ চওড়া, চক্‌চকে এবং পাতার অগ্রভাগ হতে লম্বা লেজের মত উপবৃদ্ধি দেখা যায়। পাতার বোটা ও বেশ লম্বা। পাতার উপরের দিক গাঢ় সবুজ রঙের। নীচের দিকের রঙ অনেকটা হাল্‌কা, মৃদু হওয়ায় দুলতে থাকা পাতার আগাগুলি অন্য পাতার সঙ্গে লেগে মৃদু শব্দের সৃষ্টি করে যার সঙ্গে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির শব্দের মিল রয়েছে।

পাতার আগার এই লম্বা লেজের মত উপবৃদ্ধি বৃষ্টিবহুল স্থানের অধিবাসী গাছের একটা অভিযোজন, যার দ্বারা বৃষ্টির জল পাতা বেয়ে সহজে ঝরে পড়ে। ফলে পাতা বেশী সময় ভিজে না থেকে স্বাভাবিক গ্যাসীয় বিনিময়ে অংশগ্রহণ করতে পারে।

প্রতি পাতার গোড়া হতে ছোট ফলগুলি জোড়ায় জোড়ায় বের হয়। পাকা ফল কালচে গোলাপী রঙের। মে-জুনে ফল পাকে। ফেব্রুয়ারী হতে এপ্রিল পর্যন্ত গাছে নূতন পাতা বের হয়।

বটের মত অশ্বত্থের বীজ ও পাখীর মাধ্যমে অন্য গাছে বা বাড়ীর দেওয়ালে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানে নূতন গাছ জন্মায়। কিছুদিনের মধ্যে এইসব নূতন চারা গাছের শেকড় আশ্রয়দাতা গাছকে এমন আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে ধরে যে তাদের মৃত্যু হয়। তবে পরাশ্রয়ী হলেও বট বা অশ্বত্থ পরজীবি নয়। এরা নিজেরাই নিজেদের খাদ্য তৈরী করে। আবার দেওয়ালে বা ছাদে জন্মালে অশ্বত্থ গাছ দালান কোঠার প্রচুর ক্ষতি করে।

হিন্দুদের কাছে এই গাছ খুব পবিত্র হিসাবে বিবেচিত হয়। গীতার মতে, সব গাছের মধ্যে অশ্বত্থ গাছে ভগবানের বিভূতি বেশী বিদ্যমান। আবার কেউ কেউ অশ্বত্থকে দূর্গার বাসস্থান হিসাবে মান্য করে। বরাহমিহিরের মতে, সুখ ও উন্নতি কামনায় মানুষের বাসস্থানের সামনে বট ও অশ্বত্থ লাগানো উচিত। বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কারের জন্য অশ্বত্থগাছ কাটা পাপ বলে মনে করা হয়। ফলে দালান কোঠা ইত্যাদিতে গজানো অশ্বত্থ গাছ

আমাদের অনেক ক্ষতি করে থাকে। কোথাও কোথাও অশ্বত্থ গাছের সঙ্গে নিম গাছ লাগানো হয় এবং এই বৃক্ষ যুগলকে ঘিরে বিবাহের অনুষ্ঠান পালন কার হয়।

নানা সংস্কারের জন্য না কাটায় অন্য গাছের তুলনায় অশ্বত্থ বেশী দীর্ঘজীবি। সবচেয়ে দীর্ঘজীবি অশ্বত্থের উদাহরণ বোধ হয় ভারত হতে খৃষ্টপূর্ব ২৮৮অব্দে নিয়ে সিংহলে লাগানো গাছটি, যা এখনো বহাল তবিয়তে বেঁচে রয়েছে। অশ্বত্থের জমাট বাঁধা আঠা অনেক সময় গালার মত ব্যবহার করা হয়, এছাড়া পাখী ধরার আঠা হিসাবেও এর ব্যবহার রয়েছে। লাক্ষা কীটের পোষক হিসাবে এই গাছ বেশ উপযোগী। এর বাকল হতে পাওয়া তন্তু আগে কাগজ তৈরীতে ব্যবহৃত হত।

কাঠ হাল্কা ও নিম্নমানের। প্যাকিং বাক্স তৈরী ও জ্বালানী কাঠ হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে।

গাছের কিছু ভেষজগুণও রয়েছে। এর বাকল কষায়। বিভিন্ন ঔষধ তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে। ফল ও কচি পাতার কুড়ি দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পাতা হাতী ও গো মহিষাদির খাদ্য।

পাখীর মাধ্যমে বংশ বিস্তার ছাড়াও বীজ বা কাটিং হতে সহজে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ছায়াতরু হিসাবে রাস্তার ধারে এগাছ লাগানো যায়। তবে যেসব জমিতে জলস্তর বেশী গভীর নয়, সেখানে এদের শেকড় বেশী নীচে যায় না, ফলে ঝড়ে সেসব গাছ সহজে পড়ে যায়। ■
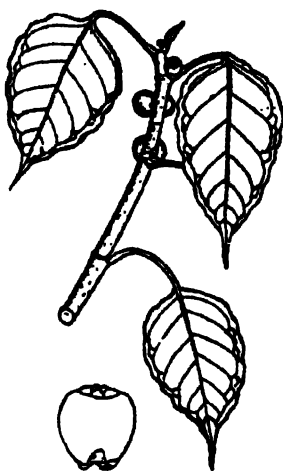
গাইয়া অশ্বত্থ

Ficus reumphii Bl.

গোত্র : Moraceae

প্রজাতি সূচক নামটি এসেছে ওলন্দাজ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী G.E.Rumph এর নাম অনুযায়ী।

ভারতের বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের আদিবাসী এই গাছটি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও রয়েছে। তবে অশ্বত্থ গাছের তুলনায় এর সংখ্যা খুব কম। আগরতলায় এখানে সেখানে দু-একটি গাছ রয়েছে। কলেজটিলায় লেইকের পাশে রাস্তায় একটি গাছ রয়েছে।

মাঝারি আকারের বৃক্ষ জাতীয় এই গাছটির ডালপালা অনেক সময় বাঁকানো হয়ে থাকে। বাকল মসৃণ, ধূসর রঙের এবং বেশ ভারী। ডালপালা চারিদিকে ছড়ানো। পাতার কিনারা একটু ঢেউ খেলানো। পাতার আগা লম্বাটে ছোট লেজের মত। শীতের শেষে গাছের পাতা ঝরে যায় এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যে গাছে নূতন পাতা গজায়। প্রায় সারা বছর গাছে ফল হয়, পাকা ফল কাল রঙের।

অশ্বত্থ গাছের সঙ্গে এর অনেকটা মিল রয়েছে। তবে অশ্বত্থের পাতা বেশ চওড়া এবং পাতার অগ্রভাগ অনেকটা লম্বা, ফলকের প্রায় অর্ধেক। কিন্তু এই গাছটির পাতা তুলনায় সরু এবং আগাও ততটা লম্বা হয় না - মোটামোটি সম্পূর্ণ পাতার এক ষষ্ঠাংশ। এই গাছের পাতার মধ্যশিরা হতে তিন হতে ছয় জোড়া উপশিরা বের হয় কিন্তু অশ্বত্থ পাতার উপশিরা আট জোড়া বা তার বেশী।

বট অশ্বত্থের মত এই গাছের বীজও পাখীর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং এরাও পরাশ্রয়ী হিসাবে অন্য গাছ বা দালান কোঠার ক্ষতি করে।

কাঠ বেশ নরম, স্পঞ্জের মত। জ্বালানী ছাড়া অন্য কাজে লাগে না। আসামে লাক্ষা কীটের পোষক হিসাবে এই গাছকে ব্যবহার করা হয়। পাকা ফল খাদ্যোপযোগী হলেও এর ব্যবহার খুবই কম। পাতা ভাল পশুখাদ্য।

ফলের রস বমনকারক ও ক্রিমি নাশক। ■
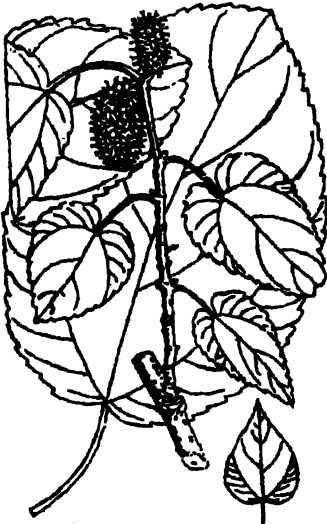
তুঁত

Morus australis Poir

সমার্থক নাম : *M.indica*

গোত্র : Moraceae

গণসূচক শব্দটি তুঁতের প্রচীন ল্যাটিন নাম হতে এসেছে। প্রজাতি সূচক শব্দে ভরেতের বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসস্থান বুঝায়।

গাছটি উত্তর ও পশ্চিম এশিয়ার আদিবাসী। তবে রেশম কীটের খাদ্য হিসাবে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই গাছে চাষ করা হয়। পশ্চিম ভারতে ও কাশ্মীরে এটি রেশম কীটের প্রধান

খাদ্য। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে রেশম কীট পালনের জন্য তুঁতের চাষ হয়ে থাকে।

ছোট মাঝারি আকারের বৃক্ষ জাতীয় গাছ। বাকল অনেকটা বাদামী রঙের। পাতা বেশ চওড়া এবং পাতার আকারের অনেক পার্থক্য দেখা যায়। তবে পাতার-কিনারা সব সময় খাঁজ কাটা এবং পাতা সূক্ষ্মাগ্র।

ফুল সবুজ রঙের একলিঙ্গ। দুজাতের ফুল একই সময় ভিন্ন ভিন্ন ডালায় জন্মায়। পুং পুষ্প আকারে ছোট, স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে থাকে। স্ত্রী পুষ্প নলাকার বা ডিম্বকার মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাসে থাকে এবং তা হতে পুঞ্জিত বেরী জাতীয় ফল জন্মায়।

ফেব্রুয়ারী-মার্চে গাছে ফুল হয়। ফল বেশ তাড়াতাড়ি পাকে। পাকা ফল সাদাটে, লাল বা কাল্‌চে রঙের হয়। শীতের শেষে গাছ অল্প কিছুদিন পত্রশূন্য অবস্থায় থাকে।

বিভিন্ন জাতের তুঁতের ফলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কাশ্মীর ও আফগানিস্তানে এই ফলকে মূল্যবান খাদ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। পাতা রেশম কীটের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় গরুর দুধের পরিমাণ বাড়াতে তাকে তুঁতের পাতা খাওয়ানো হয়।

কাঠ বেশ শক্ত। নৌকা ও কৃষির যন্ত্রপাতি তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে। সস্তা দামের টেনিস র‍্যাকেট ও ক্রিকেট স্ট্যাম্প তৈরীতেও এই কাঠ বব্যহৃত হয়।

ফল ভেষজগুণ যুক্ত। গলক্ষত, পেটের পীড়া প্রভৃতির উপশমে এর ব্যবহার রয়েছে। বাকল রেচকগুণযুক্ত। শেকড় স্নায়বিক দৌর্বল্যে উপকারী।

বীজ বা কাটিং হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। গাছ বেশ কষ্ট সহিষ্ণু। শীতের সময় ডালপালা কেটে দিতে হয়। ■

শেওড়া

Streblus asper Lour

গোত্র : Moraceae

গ্রীক শব্দ Strebrus অর্থ বাঁকা, asper অর্থ খস্‌খসে। দুয়ে মিলে খস্‌খসে পাতার বাঁকা গাছ।

ভারতের আদিবাসী ছোট বৃক্ষজাতীয় এই গাছটি আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে

জন্মায়। ত্রিপুরা রাজ্যে বন জঙ্গলে ও ঝোপে ঝাড়ে এই গাছ জন্মায়। আগরতলা শহরের আশেপাশে ঝোপ ঝাড়ে এই গাছ রয়েছে। রোগা গ্রন্থিল বৃক্ষজাতীয় গাছ। গাছে সাদা তরুক্ষীর রয়েছে। পাতা ছোট, গাঢ় সবুজ। ফুল ছোট, এক লিঙ্গ। পুং ও স্ত্রী পুষ্প আলাদা গাছে হয়। পুং পুষ্প গুচ্ছ গোলাকার। স্ত্রী পুষ্পগুচ্ছ এককভাবে বা ছোট গোছায় থাকে। বাকল নরম, ধূসর রঙের। ফল মটর বীজের মত আকারের। খাদ্যোপযোগী। তবে মানুষ খুব কমই খায়। পাখীরা এই ফল বেশ পছন্দ করে। ফেব্রুয়ারী-মার্চে গাছে ফুল আসে। এই সময়ই গাছে নূতন পাতা গজায়।

পাতা ছাগলের প্রিয় খাদ্য। অনেক সময় ছাগলের উপদ্রবে এই গাছ বড় হতে পারে না।

এই গাছের বিভিন্ন অংশ ভেষজগুণযুক্ত। বাকলের ক্বাথ জ্বর ও উদরাময়ে উপকারী। শেকড় ক্ষত উপশম করে। তরুক্ষীর কষায় ও জীবাণুনাশক। পায়ের গোড়ালি ফাটায় ও হাত ফাটায় উপকারী।

গাছের ডাল দাঁতন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উহা পায়োরিয়ায় উপকারী। খস্‌খসে পাতা কাঠ ও হাতীর দাঁতের সামগ্রী পালিশে ব্যবহৃত হয়। কাঠ হতে কাগজ তৈরী করা যায়।

কাঠ সাদা রঙের, বেশ শক্ত এবং স্থিতিস্থাপক। অনেক সময় গরুর গাড়ীর চাকা তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। জ্বালানী হিসাবেও ভাল। কাঠ সহজে জলে নষ্ট হয় না।

দক্ষিণ ভারতে কোথায়ও বাজপড়া আটকাতে কুড়েঘরের চালের সঙ্গে এই গাছের ডাল বেঁধে দেওয়া হয়।

বংশবৃদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ পাখীর মাধ্যমে বীজ হতে বংশবৃদ্ধি হয়। ■

লটকন

Bixa orellana L.

গোত্র ঃ Bixaceae

Bixa শব্দটি এই গাছের জন্মভূমি দক্ষিণ আমেরিকার দেশীয় শব্দ হতে এসেছে

দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী হলেও এই গাছটি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বর্তমানে চাষ করা হয়। দক্ষিণ ভারতে তুলনামূলক ভাবে এর চাষ বেশী হয়। ত্রিপুরার আগরতলার বনমালীপুরে এর একটি গাছ রয়েছে। চির সবুজ ছোট আকারের বৃক্ষ জাতীয় গাছ। বাকল ধূসর ও মসৃণ। ডালপালা কম। পাতা তাম্বুলাকার এবং লম্বা বোঁটা যুক্ত। ফুল মাঝারী আকারের গোলাপী বা সাদা রঙের, ডালের আগায় গুচ্ছাকারে সাজানো। ফল সবুজ বা বাদামী রঙের ক্যাপসুল জাতীয়। ফলের গায়ে নরম কাঁটা থাকে। ছোট বীজগুলি লাল আবরণে ঢাকা। অক্টোবর - নভেম্বরে গাছে ফুল আসে, কোথাও বা গরমের সময়ও ফুল দেখা যায়।

পেকে আসা ফল সংগ্রহ করে তা হতে বীজ বার করে নেওয়া হয়। এই বীজ সেদ্ধ করে চাপ দিয়ে কেকের মত করে নেওয়া হয় অথবা রঙিন আবরণ সহ বীজ শুকিয়ে নেওয়া হয়। এই দুভাবে পাওয়া বীজই কাপড় রাঙ্গানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া মাখন, মিষ্টি দ্রব্য প্রভৃতি রং করার কাজেও এর বীজের ব্যবহার রয়েছে। ভারত হতে ইউরোপীয় দেশে প্রচুর পরিমাণ এই বীজ রপ্তানী করা হয়।

আগে রেড ইণ্ডিয়ানরা শরীর রাঙ্গানোর জন্য এই বীজ ব্যবহার করত। এই বীজের মশা তাড়ানোর ক্ষমতা রয়েছে।

ভেষজ গুণেরও অধিকারী এই গাছ। এর পাতা, বীজ, শেকড় জ্বর উপশম ক্ষমতা সম্পন্ন। আয়ুর্বেদ মতে এই গাছ কফ, বাত, মাথা ধরা, কুষ্ঠ, বমন, রক্ত দুষ্টি ও পিত্তের পীড়ার উপকারী।

বীজ হতে বংশ বিস্তার করা হয়। ■
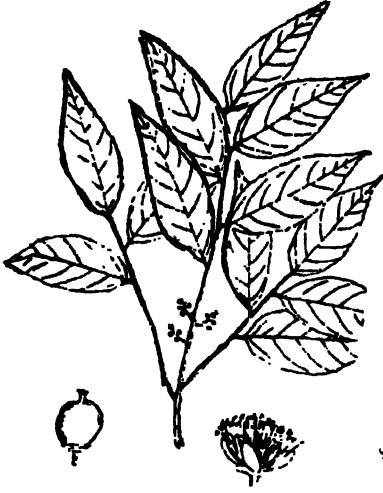
পানিয়ালা

Flacourtia jangomus (Lour) Raeosch

সমার্থক নাম ঃ ***F. cataphracta***

গোত্র ঃ **Flacourtiaceae**

অন্যনাম ঃ পেয়ালা

Flacourtia শব্দটি এসেছে ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর Ede Flacourt এর নাম হতে। jangomas শব্দটি দক্ষিণ ভারতীয় শব্দ হতে নেওয়া, Cataphracta শব্দটি এই গাছের কাঁটা যুক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা বোঝায়।

এই গাছটি উত্তর পূর্ব বাংলা ও চট্টগ্রামের আদিবাসী। ভারতের কোন কোন স্থানে এর চাষ হয়। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ রয়েছে। আগরতলায় শিবনগর ও বড়দোয়ালী অঞ্চলে কোন কোন বাড়ীতে এই গাছ রয়েছে। ছোট আকারের বৃক্ষ বা গুল্ম জাতীয় এই গাছ বুনো ও চাষ করা দুই অবস্থায়ই এ রাজ্যে পাওয়া যায়। বাকল হাল্‌কা বাদামী রঙের। অনেক সময় গাছ হতে বাকল টুকরা টুকরা হয়ে ঝরে পড়ে। গাছে প্রচুর শক্ত কাঁটা রয়েছে। পাতা সরু আগা বিশিষ্ট এবং কিনারা করাতের মত খাঁজ কাটা। পাতলা পাতাগুলি ছোট প্রশাখার দুদিকে সাজানো কিন্তু পত্রবিন্যাস বিপরীত নয়। ছোট ফুলগুলি গুচ্ছাকারে পাতার মাঝে সাজানো থাকে। স্ত্রী এবং পুং পুষ্প আলাদা গাছে হয়। ফল লালচে বা খয়েরী রঙের, ছোট প্লামের মত।

বর্ষার সুরুতে গাছে ফুল আসে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্যন্ত ফল পাকে। স্থানীয় বাজারে ফল বিক্রী হয়। একটু কষায় টক মিষ্টি ফলগুলি খাওয়ার আগে একটু হাতে ঘসে নিলে বেশ ভালই লাগে। ফল কাঁচা খাওয়া ছাড়া মার্মালেট ইত্যাদি তৈরী করে খাওয়া যায়।

এই গাছের পাতা ও কচি ডালা কষায় ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং ভেষজ গুণযুক্ত। পাতার গুড়া কাশি, ব্রঙ্কাইটিস, প্রভৃতিতে উপকারী, গলা ভাঙ্গায় বাকল ব্যবহৃত হয়। ফল পিত্তাধিক্যে উপকারী।

এর কাঠ শক্ত। ভাল পালিশ নেয় তবে ভঙ্গুর। চাষের যন্ত্রপাতি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

চাল মোগরা

Hydnocarpvs Kurzii (King) Warb.

সমার্থক নাম ঃ *Teractogenos kurzii*

গোত্র ঃ Flacourtiaceae.

এই গাছটির আদি বাসস্থান পূর্ব ভারত, বার্মা ও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চল। ত্রিপুরার জম্পুই পর্বত শ্রেণীতে এই গাছটি অনেক পাওয়া যায়। চিরসবুজ বৃক্ষজাতীয় গাছটি প্রায় পনের মিটার লম্বা হয়। কোন কোন সময় একে এর চেয়েও বেশী লম্বা হতে দেখা যায়। গাছের গুড়ি হতে শাখাগুলি নীচের দিকে ঝুলে থাকে পাতা প্রায় বিশ সেমি লম্বা। চর্মবৎ, আগা সূচালো। পাতার বোটা স্ফীত এবং আগার দিক জানুর আকৃতির।

ছোট হল্‌দে ফুলগুলি গুচ্ছাকারে পাতার কক্ষে সাজানো থাকে। ফল গোলাকার, বাদামী রঙের। ফলের খোসা ভেলভেটের মত। প্রতি ফলে অনেকগুলি বীজ থাকে। পাকা টাটকা ফলের বীজ হতে চাল মোগরা তেল পাওয়া যায়, যা কুষ্ঠ রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। গাছের বাকল হতে এক প্রকার ট্যানিন জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়, উহা জ্বরে উপকারী। বীজ হতে তেল বের করার পর যে খৈল পাওয়া যায় তা সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। কিছু বন্যপ্রাণী এই গাছের ফল খেয়ে থাকে। ঐ সকল প্রাণীর মাংস খাদ্যের অনুপযোগী। চালমোগরার ফল জলাশয়ে ছড়িয়ে মাছকে নিশ্চল করে তাদের ধরা হয়। তবে ঐসব মাছ খেলে বিষক্রিয়া হতে পারে।

ত্রিপুরা রাজ্যের জম্পুই পাহাড়ে Flacortiaceae গোত্রের একটি গাছ পাওয়া যায়, উহা ও চালমোগরা নামে পরিচিত। ঐ গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Gynocordia odorata* এই বৃক্ষ জাতীয় গাছটি আসল চালমোগরা গাছ হতে অনেক বড় হয়। এর কাণ্ডের বাদামী রঙের বাকলে এবড়ো-খেবড়ো উপবৃদ্ধি দেখা যায়। এর পাতার বোঁটা আসল চালমোগরার মত স্ফীত নয়। এই উদ্ভিদটি ভিনবাসী, এবং পুং ও স্ত্রী পুষ্প ভিন্ন ভিন্ন গাছে হয়। এর ফলও আকারে বড় এবং এরা গাছের কাণ্ড হতে ঝুলতে থাকে। ফলত্বক বেশ পুরু ও শক্ত। আসল চালমোগরার চেয়ে এই গাছটির ঔষধিগুণ অনেক কম। তবে অন্য কাজে এই গাছের ব্যবহার রয়েছে। কাঠ খুঁটি ও আসবাবপত্র তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। বিষ প্রয়োগে মাছ মারার জন্য এর ফল ব্যবহার হয়ে থাকে। ■

অগুরু গাছ

Aquilaria malaccensis Lamk.

সমার্থক নাম ঃ *A. agallocha*

গোত্র ঃ Thymelaceae

অন্যনাম ঃ আগর

পূর্ব হিমালয় হতে বাংলাদেশ পর্যন্ত ভুখণ্ডে, সিকিম, আসাম, খাসিয়া ও গারো পাহাড়, কাছাড় সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলে এই গাছের বাসভূমি। ভারতের বাইরে বার্মা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্য দেশে ও এই গাছ পাওয়া যায়। আগে ত্রিপুরার কৈলাসহর ও ধর্মনগর বিভাগে আগর গাছ পাওয়া যেত। বর্তমানে রাজ্যের অন্যান্য বিভাগেও এই গাছ লাগানো হয়েছে। আগরতলার কলেজটিলায় কলেজ চত্বরে বেশ কিছু আগর গাছ রয়েছে।

আগরতলার নামকরণ সম্বন্ধীয় একটি প্রবাদ অনুযায়ী অগরবন পরিষ্কার করে এই স্থানের পত্তন হয়। এই প্রবাদ ঠিক হউক বা না হউক, এখানে এক সময়ে আগর গাছের উপস্থিতি সূচিত করে।

চিরসবুজ এই গাছটি প্রায় ১০-১৫ মিটার লম্বা হয়ে থাকে। এর কচি ডালপালা রেশমের মত চকচকে। বাকল পাতলা ও খস্‌খসে। ভেতরের বাকল পার্চমেন্ট কাগজের মত। প্রাচীন আসাম দেশীয় রাজারা লেখার কাজে এর ব্যবহার করতেন। পাতা সরল, একান্তর, ৫-১০ সেমি লম্বা, উজ্জ্বল, চামড়ার মত। পাত্‌লা পাতার আগা সরু, শিরাবিন্যাস অস্পষ্ট সমান্তরাল, জুন মাসে গাছে ফুল হয়। ছোট ছোট সবুজাভ ফুলগুলি মঞ্জুরীদণ্ডে এমন ভাবে সাজানো থাকে যে পুষ্পবিন্যাসকে ছাতার মত দেখায়। আগষ্ট মাসে গাছে ফল হয়, ফল ৩-৫ সেমি লম্বা, মখমলের মত নরম।

অগুরু কাঠ সাদা রঙের। গাছ একটু বড় হলে এই কাঠে নানা আকারের খণ্ড খণ্ড সার জন্মায়। সার কাল রঙের সুগন্ধিযুক্ত। এই সারই অগুরু নামে পরিচিত।

কোন গাছে অগুরু রয়েছে তা বিশেষজ্ঞ ছাড়া বুঝতে পারেন না। সাধারণতঃ যে গাছের অগুরু হয় তাতে কাল রঙের একপ্রকার পিঁপড়ে দেখা যায় এবং ঐ গাছ হতে মধুর মত গন্ধ বের হয়। ভাল অগুরু কাঠ কাল রঙের, বেশ শক্ত এবং ওজনেও ভারী। উহা জলে ডুবে যায় কষায় ও তিক্ত স্বাদযুক্ত।

আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে অগুরুর ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহাভারতের সভাপর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কিরাত রাজার দেওয়া উপহার সামগ্রীর মধ্যে অগুরুর উল্লেখ রয়েছে। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশেও আসাম রাজ্যে অগুরু উৎপন্ন হওয়ার কথা জানা যায়।

অগুরুর ধুপ দেবপূজায় ব্যবহৃত হয়। শিলায় ঘসেও চন্দনের মত অগুরুর ব্যবহার হয়ে থাকে। অগুরু হতে আতর, তেল সাবান ইত্যাদি তৈরী করা হয়। অগুরুর সার কাঠ জলে সেদ্ধ করে তা হতে আতর তৈরী করা হয়।

অগুরুর সুগন্ধি কাঠ গহনার বাক্স, বেড়াবার ছড়ি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। গাছের বাকল হতে পার্চমেন্টের মত কাগজ পাওয়া যায়।

অগুরুর ভেষজ গুণও রয়েছে। আয়ুর্বেদের মতে উহা তিক্ত, উষ্ণ ঝাঁঝালো ও কটু গন্ধযুক্ত। কফ, বাত, বায়ু, হিক্কা , কর্নপীড়া, শ্বেতী গেঁটে বাত প্রভৃতিতে উপকারী। অগুরু অতিশয় উত্তেজক। উহা মাথাধরা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, পক্ষাঘাত ও বমন নিবারণ করে। কাপড়ে অগুরু কাঠের গুড়া লাগালে তাতে পোকা ধরে না। স্বল্পমাত্রায় উহা বলকারক ঔষধের কাজ করে।

গাছের বাকল দড়ি তৈরীর কাজেও ব্যবহৃত হয়। ■

সিলভার ওক

Grevillea robusta Cunn·ex. R. Br.

গোত্র : Proteaceae

গণ সূচক শব্দটি এসেছে রয়েল সোসাইটির এক সময়কার উপাধ্যক্ষ ও উদ্ভিদ প্রেমী C.F. Greville এর নাম অনুসারে। প্রজাতি সূচক শব্দে বুঝায় বড় বা দৃঢ় আকৃতি, যা এই প্রজাতির বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য।

গাছটির আদি বাসস্থান অষ্ট্রেলিয়া। বর্তমানে উষ্ণমণ্ডলীয় অনেক দেশে এর চাষ হয়ে থাকে। দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলংকায় ছায়াতরু হিসাবে এ গাছ প্রচুর লাগানো হয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও এ

গাছ রয়েছে। তবে সংখ্যায় কম। ত্রিপুরা রাজ্যে বেশ কিছু সিলভার ওক গাছ রয়েছে। *আগরতলা শহরে কোন কোন রাস্তার পাশে এ গাছ দেখা যায়। চিলড্রেন পার্কের কিনারায়* কয়েকটি গাছ রয়েছে।

লম্বা ধরনের এই বৃক্ষটি দেখতে বেশ সুন্দর । বাকল অমসৃণ। ডালপালা আকারে ছোট। পাতা ফার্ণ পাতার মত খণ্ডিত। পাতার উপরের দিক গাঢ় সবুজ। নীচের দিক রূপালী রঙের। এজন্য গাছটি সিলভার ওক নামে পরিচিত। গাছের কচি ডালপালা মরচে রঙের রোমে ঢাকা।

লালচে কমলা রঙের ফুলগুলি গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় ছোট ছোট শাখায় জন্মায়। ফুলে ফুলে ছাওয়া গাছটি দেখতে বেশ সুন্দর দেখায়।

কাঠ বেশ শক্ত। অষ্ট্রেলিয়ায় এর কাঠ বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরীতে প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

ছায়াতরু হিসাবে গাছটি রাস্তার পাশে লাগানো যেতে পারে। স্থান বিশেষে বায়ুপ্রবাহ রোধক হিসেবে এই গাছ কাজ করে। ■

সজনে

Moringa oleifera (L.) Lamk.

সমার্থক নাম ঃ ***M. pterigosperma***

গোত্র ঃ **Moringaceae**

অন্যনাম ঃ সজিনা

Moringa শব্দটি এসেছে এই গাছের তামিল নাম Morunga হতে, oleifera অর্থ তেল উৎপাদনকারী, গ্রীক শব্দ Pterigosperma-র অর্থ পক্ষল বীজ। পশ্চিম হিমালয়ের আদিবাসী এই গাছটি বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মায়। ত্রিপুরায় এই গাছ অনেক রয়েছে। ডাল হতে সহজে গাছ হওয়ায় আগরতলায়ও অনেকের বাড়ীতে সজনে গাছ দেখা যায়।

মাঝারি আকারের দ্রুত বর্দ্ধনশীল পর্ণমোচী এই বৃক্ষটির কাণ্ড বেশ নরম। বাকল

বেশ ভারি, বাদামী রঙের এবং তাতে লম্বা ফাটল থাকে। পাতাগুলি দেখতে বেশ সুন্দর, যৌগিক ত্রিপক্ষল। পত্রকের উপরের দিক উজ্জ্বল সবুজ, নীচের দিক ফ্যাকাসে সবুজ। ফুল আসার আগে গাছ পত্রহীন হয়ে যায়। ফেব্রুয়ারী মার্চ পর্যন্ত গাছে ফুল আসে। প্রায় একই সময় গাছে নূতন পাতা বের হয়। ক্রীম সাদা সুগন্ধি ফুলগুলি বড় খোলামেলা গোছায় সাজানো থাকে। ফল লম্বা, পরিণত ফল অনেকটা ত্রিকোণাকৃতি প্রতি ফলে বহু পক্ষল বীজ থাকে।

এই গাছের ফল, ফুল, পাতা বাকল সব্জি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সজনে ডাটা মুখ রোচক ও জীবাণু নাশক। সজনে ডাটার চচ্চড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রিয় ছিল।

বীজ হতে এক প্রকার তেল পাওয়া যায়, যা ঘড়ি প্রস্তুতকারীরা ব্যবহার করে। এছাড়া প্রসাধন সামগ্রীতেও এর ব্যবহার রয়েছে। এ গাছ হতে পাওয়া আঠা অনেক সময় রঞ্জন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। সজনের কচি মূল কোন কোন সময় মশলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এর কাঠ নরম, স্পঞ্জের মত, সহজে পচে যায়। এজন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হয় না। তবে বাকল হতে নীচুমানের তন্তু পাওয়া যায়। যা দড়ি তৈরীতে ব্যবহার করা যায়।

এই গাছের ভেষজগুণও রয়েছে। বীজ হতে পাওয়া তেল বাতে বাহ্যিক প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়। থেতলানো পাতা সাপ, কুকুর, বিড়াল, বানর প্রভৃতির কামড়ে উপকারী। মূল গলাক্ষত ও সর্দিতে উপকারী।

বীজ ও কাটিং দুভাবেই বংশবৃদ্ধি করা যায়। তবে ভিজে মাটিতে ডাল পুতলে অল্প কিছুদিনের মধ্যে তা হতে শেকড় বের হয়। এজন্য সাধারণতঃ এভাবেই সজনের বংশবৃদ্ধি করা হয়। ■

বরুন

Crataeva nurvala F. Ham.

গোত্র ঃ Capparaceae

নামের প্রথম শব্দটি এসেছে গ্রীক উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ক্রিটেভাসের নাম হতে। দ্বিতীয় শব্দটি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা হতে এসেছে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই বৃক্ষটি বুনো অথবা চাষ করা অবস্থায় পাওয়া যায়,

তবে উত্তর প্রদেশে এর সংখ্যা একটু বেশী। ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ জন্মায়। আগরতলার প্রতাপগড় অঞ্চলে এবং কলেজটিলার রবীন্দ্র হলের পশ্চিম দিকে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের পুরানো বাগানে ২/৩ টি গাছ রয়েছে। ভারত ছাড়া বার্মা, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশে এই গাছ পাওয়া যায়।

ছোট বা মাঝারি আকারের বহু শাখা যুক্ত পর্ণমোচী বৃক্ষ। বাকল মসৃণ, হাল্কা ধূসর রঙের। পাতা যৌগিক। তিনটি পত্রক যুক্ত করতলাকার। শীতে পাতা ঝরে যায়। মার্চ পর্যন্ত নূতন পাতা গজায়।

ফুল প্রথমে সাদা, পরে হাল্কা হলদে রঙের বা লালচে হলদে রঙের হয়। ডালার আগায় গোছা ভরা ফুল দেখা যায়। ফুলের লাল্‌চে বেগুনী রঙের বড় পুংকেশরগুলি সহজে নজরে পড়ে। নূতন গজানো পাতার মধ্যে এর সুন্দর ফুলগুলি গাছের শোভা বেশ বাড়িয়ে দেয়। কোন কোন সময় পত্রহীন গাছেও ফুল আসতে দেখা যায়। ফল বেরী জাতীয়। গোলাকার বা একটু লম্বাটে, ফলত্বক শক্ত ও খসখসে। ফলে অনেক বীজ থাকে।

কাঠ বেশ শক্ত হলেও দীর্ঘস্থায়ী নয়। ড্রাম, দেশলাই কাঠি, খেলনা , চিরুনী প্রভৃতি তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে। ফলের ত্বক রঞ্জন শিল্পে রং বন্ধনকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ফুল ও ফল সব্জি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পাতা ও গাছের ছাল ভেষজ গুণযুক্ত। গাছের ছালে ট্যানিন ও সেপনিন রয়েছে। উহা রেচক, ক্ষুধা বর্দ্ধক। আয়ুর্বেদ মতে কাণ্ড ও মূলের ছাল পাথুরী রোগ নিবারক। পাতা বাতে উপকারী।

রাস্তার পাশে বা পার্কে এই গাছ লাগানো যেতে পারে। এরা বেশ খরা সহ্য করতে পারে এজন্য শুকনো জায়গায় লাগানো যায়।

বর্ষায় বীজ হতে নূতন গাছ হয়। এছাড়া মূলাকার কাণ্ড হতেও নূতন গাছ জন্মায়। বীজের খোসা বেশ শক্ত হওয়ায় অঙ্কুরোদ্‌গমে অনেক সময় লাগে। গাছের বৃদ্ধির হার কম এবং গবাদি পশু এর পাতা বেশ পছন্দ করে এজন্য নূতন চারার সুরক্ষা প্রয়োজন। ■

ওলট কম্বল

Abroma augusta (L) L.f.

গোত্র ঃ **Sterculiaceae**

গণসূচক শব্দটি এসেছে দুটি গ্রীক শব্দ হতে। "a" অর্থ না, "broma" অর্থ খাদ্য, augusta অর্থ মহান। সব মিলে এই মহান গাছটি খাদ্য উৎপাদনকারী নয় এই কথা বুঝায়।

দ্রুত বর্দ্ধনশীল এই গাছটি গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ জাতীয়। খুব সম্ভবতঃ এই গাছটি ভারত ও মালয়ের আদিবাসী। তবে অনেকের মতে বিভিন্ন অঞ্চলে চাষ করা গাছ হতেই সেখানকার বনজঙ্গলে এরা ছড়িয়ে পড়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এই গাছ পাওয়া যায়। কয়েক বছর আগেও কলেজটিলার মহারাজা বীর বীক্রম কলেজের পুরানো উদ্ভিদ উদ্যানে কয়েকটি ওলট কম্বল গাছ ছিল।

এই গাছটির বাকল মসৃণ, প্রায় ধূসর রং বিশিষ্ট। শাখাগুলি অনুভূমিক। শাখার অগ্রভাগ রোমশ। চিরহরিৎ পাতাগুলির চেহারা ও আকারে বেশ পার্থক্য রয়েছে। শাখার আগার দিগের পাতাগুলি সরু, লম্বাটে, আগা ক্রমশঃ সরু, বোটা ছোট। শাখার নীচের দিকের পাতা অনেকটা গোলাকার, কিনারা দাঁতের মত খাঁজ কাটা এবং পাতার আগার দিক পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। কচি গাছের পাতার আকার পরিণত গাছ অপেক্ষা অনেক বড়।

বর্ষায় গাছে ফুল ফোটে। শীতকাল পর্যন্ত ফল পাকে। ডালার আগায় ২/৩টি ফুল একটি ছোট শাখা হতে বের হয়ে দোলকের মত দুলতে থাকে। ফুলের পাপড়িগুলি হাল্কা চকলেট রঙের। পুংকেশর ও গর্ভকেশর সাদা।

ফল ক্যাপসুল জাতীয়। পাঁচটি পাখা যুক্ত। প্রতি ফলে অনেকগুলি বীজ থাকে। ফলের মাঝামাঝি সাদা সিল্কের মত তন্তু থাকে, যা বীজ বিস্তারে সাহায্য করে।

সবুজ পাতার মধ্যে হাল্কা চকলেট রঙের ফুলের জন্য শোভা বর্দ্ধনকারী উদ্ভিদ হিসাবে একে বাগানে লাগানো যেতে পারে।

গাছের বাকল হতে পাওয়া সিল্কের মত তন্তু দড়ি ইত্যাদি তৈরীতে ব্যবহার করা যায়। এর তন্তু শনের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে পরীক্ষায় দেখা গেছে এর তন্তু উৎপাদন ব্যয় অনেক বেশী।

তবে এই গাছ ভেষজ গুণযুক্ত। মূলের বাকল রাজোবাহুল্যে উপকারী এবং এজন্য অনেক স্থানে এই গাছের চাষ করা হয়। কাঠ খুব নরম। কোন বিশেষ কাজে লাগে না।

কাটিং হতে সহজে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

মূলা

Erythropsis colourata (Roxb) Burkill

সমার্থক নাম ঃ *Sterculia colourata* ও *Firmiana colourata*

গোত্র ঃ Sterculiaceae

গণ সূচক শব্দটি এসেছে দুটি গ্রীক শব্দ হতে "erythrops" অর্থ লাল, opsis অর্থ সাদৃশ্য, colourata অর্থ রঙিন। দুয়ে মিলে গাছের লাল রঙের ফুলকে বোঝায়।

এই বৃক্ষটির আদি বাসস্থান দক্ষিণ পশ্চিম ভারত, বাংলাদেশ, বার্মা ও শ্রীলংকা। সুন্দর লাল ফুলের জন্য এই গাছ কোন কোন সময় বাগানে বা রাস্তার ধারে লাগানো হয়। ত্রিপুরার বনাঞ্চলে কোন কোন স্থানে এই গাছ রয়েছে। আগরতলায় কলেজটিলায় বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একটি গাছ রয়েছে, যার বিচিত্র ফলের জন্য বহু বছর আগে এর পরিচয় খুঁজে বের করেছিলাম।

মাঝারি আকারের এই বৃক্ষটির বাকল ধূসর রঙের। এর ডালপালা প্রায়ই ছোট আকারের হয়। যে জন্য গাছটিকে নেড়া নেড়া দেখায়। পাতা সরল মাঝারী আকারের। ফলকের গোড়ার দিক অনেকটা গোলাকার, কিন্তু আগার দিক কয়েকটি বড় খাঁজে বিভক্ত এবং প্রতিটি খাঁজ উপরের দিকে ক্রমশঃ সরু। শীতে গাছের পাতা ঝরে যায় এবং তারপর বেশ কিছুদিন গাছ পত্রশূন্য অবস্থায় থাকে। মার্চ পর্যন্ত গাছে ফুল আসে। পত্রশূন্য গাছে রঙিন ফুলের গোছা গাছকে নূতন সৌন্দর্য্য প্রদান করে। ফুলের কুড়ি ও বোটা লাল বা গাঢ় কমলা রঙের রোমে ঢাকা থাকে।

এপ্রিল পর্যন্ত গাছে ফল আসে। ফল একটু অদ্ভুদ ধরনের। লম্বা বোটার প্রান্তে প্রথমে এক হতে পাঁচটি শুটি দেখা যায়। পরে প্রতিটি ফল লম্বালম্বি দুইটি কবাটিকায় খুলে যায়। প্রতি ফলে দুটি বীজ থাকে। কাগজের মত পাতলা ফলত্বকের প্রতি কবাটিকার

পাশে একটি করে বীজ লেগে থাকে। ফলের রং প্রথমে সবুজ পরে তা গোলাপী এবং শেষ পর্যন্ত হাল্কা হলদেটে রঙের হয়। খোলা ফলগুলি দেখতে গাছের পাতা বলে মনে হয়। পাতার মত পাতলা ফলত্বকে শিরাবিন্যাস পরিষ্কার দেখা যায়। ফল পাকার পর গাছে নূতন পাতা গজায়।

শ্রীলংকার আদিবাসীরা এই ফলকে পবিত্র মনে করে। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে হোলির সময় গরুর শিং-এ এই ফুলের মালা পরিয়ে সাজানো হয়। সুন্দর ফুলের জন্য এই ছোট আকারের গাছটি পথের ধারে লাগানো যেতে পারে। গাছের কাঠ বিশেষ কাজে লাগে না। বংশবৃদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ■

বোটা

Kleinhovia hospita L.

গোত্র ঃ **Sterculiaceae**

গণ সূচক শব্দটি ওলন্দাজ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী Kleinhop -এর নাম হতে এসেছে। এই গণে একটি মাত্র প্রজাতি রয়েছে hospita এই শব্দটি এসেছে ইংরাজী hospitable শব্দ হতে যা এই গাছের বিভিন্ন পরজীবিকে আশ্রয় দেওয়ার কথা বুঝায়। কারো কারো মতে hospita শব্দ বিজ্ঞানী Kleinhop -এর অতিথি পরায়ণতার কথা বোঝায়।

আফ্রিকার উষ্ণ মণ্ডলের আদিবাসী এই বৃক্ষ আফ্রিকা মহাদেশের বাইরে মালয় ও অস্ট্রেলিয়াতে জন্মায়। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মলাক্কা হতে এনে কলিকাতায় এই গাছ প্রথম লাগানো হয়। বর্তমান ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে পথের পাশে এই গাছ লাগানো হয়েছে। ত্রিপুরায় এই গাছ অল্প পরিমাণে রয়েছে। আগরতলার আখাউড়া রোডে, উমাকান্ত স্কুলের পাশে, রাজবাড়ীর উত্তর দিক হতে সার্কিট হাউস পর্যন্ত রাস্তার পাশে কিছু গাছ রয়েছে।

মাঝারি আকারের এই বৃক্ষটির উপরিভাগ অনেকটা গোলাকার। বাকল ফ্যাকাশে বাদামী রঙের। অনেক সময় বাকলের গায়ে আবের মত কিছু উপবৃদ্ধি দেখা যায়। পাতা চওড়া, ডিম্বাকার ও তাম্বুলাকার, বোঁটা বেশ লম্বা। উজ্জ্বল গোলাপী রঙের ফুলগুলি

ডালার আগায় গুচ্ছাকারে সাজানো। কোন কোন সময় ফুলে পুরো গাছকে ঢেকে রাখে। ফল ফাঁপা, অনেকটা ন্যাসপাতি আকারের কিন্তু বাইরের দিকে ৫ ভাগে বিভক্ত।

প্রায় সারা বছর গাছে পাতা থাকে। মে হতে নভেম্বর পর্যন্ত গাছে দফায় দফায় ফুল ফুটতে থাকে। শীতের সময় পুরানো পুষ্পদণ্ডে ফাঁপা ফলগুলি ঝুলতে দেখা যায়। ফেব্রুয়ারী-মার্চে গাছে নূতন পাতা আসে। আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে ফুলের পরিমাণ অন্য সময় অপেক্ষা বেশী থাকে।

কাঠ সাদা রঙের, জাভাতে এই গাছের পুরানো কাঠকে মূল্যবান মনে করা হয় এবং নানা কাজে তা ব্যবহৃত হয়। ফিলিপাইনে এর পাতা, কচি ডালা সব্জি হিসাবে খাওয়া হয়। কোচিন চীনে পাতার ক্বাথ চর্মরোগে ব্যবহার করা হয়। বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

মুচকন্দ

Pterospermum acerifolium Wild.

গোত্র ঃ Sterculiaceae

অন্যনাম ঃ কনক চাঁপা

গ্রীক শব্দ Pterospermum অর্থ পক্ষল বীজ। acerifolium অর্থ acer গাছের মত পাতা বিশিষ্ট। দুয়ে মিলে acer গাছের মত পাতা বিশিষ্ট পক্ষল বীজ যুক্ত গাছ।

আমাদের দেশীয় এই গাছটি হিমালয়ের পাদদেশ, আসাম, খাসি পাহাড়, মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে স্বাভাবিক ভাবে জন্মায়। ভারতের অন্যান্য স্থানে ও কিছু কিছু গাছ লাগানো হয়েছে। ভারতের বাইরে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও বার্মাতে এই গাছ পাওয়া যায়। ত্রিপুরায় এই গাছ খুব বেশী নেই। আগরতলার উমাকান্ত স্কুলের উত্তর দিকে মন্ত্রী নিবাসের সামনের রাস্তায় একটি বড় গাছ রয়েছে। কয়েক বছর আগেও কলেজ রোডের পাশে কয়েকটি গাছ ছিল যা এখন আর নাই।

এই বৃক্ষ জাতীয় গাছটি বেশ লম্বা, চির সবুজ। বাকল মসৃণ ছাই রঙের। কচি ডালপালা মরচে রঙের রোমে আবৃত। পাতা সরল অনেকটা গোলাকার, তবে কিনারা খাঁজযুক্ত বা একটু ঢেউ খেলানো। পাতার উপর দিক গাঢ় সবুজ, নীচের দিক ধূসর রঙের

রোমে ঢাকা। কচি অবস্থায় মৃদু বাতাসে আন্দোলিত পাতা দূর হতে রূপালী সবুজ মনে হয়।

ফেব্রুয়ারী হতে এপ্রিল পর্যন্ত গাছে ফুল আসে। ফুল আকারে বেশ বড়, লম্বাটে। সাদা পাপড়িগুলি ভারী মাংসল বৃতি দিয়ে ঢাকা থাকে। বৃতির বাইরের দিক মরচে রঙের রোম থাকে। ফুলের একটি সুন্দর গন্ধ রয়েছে। এমনকি ফুল শুকিয়ে যাওয়ার পরও বেশ কিছু দিন পর্যন্ত এই গন্ধ পাওয়া যায়। দেব পূজায় কেউ কেউ এই ফুল ব্যবহার করেন। ফল কাষ্ঠল ক্যাপসুল জাতীয়। ফল পাকতে প্রায় এক বছর সময় লাগে। পাকা ফল ৫টি লম্বা রেখা বরাবর ফেটে যায়। বীজগুলি হাল্কা, বাদামী রঙের, পক্ষল।

খাদ্য পরিবেশনের প্লেট হিসাবে পাতা ব্যবহার করা যায়। এছাড়া পাতা উত্তম পশুখাদ্য। কোন কোন অঞ্চলে খড় দিয়ে ঘরের চালা ছাওয়ার আগে এই পাতার একটি স্তর বিছিয়ে দেওয়া হয়, ফলে ছাউনি বেশী সময় জল নিরোধক থাকে। পাতার রোম ক্ষত হতে রক্তপাত বন্ধ করে।

এই গাছের ফুল অনেকে নির্বিজক হিসাবে ব্যবহার করেন, ফুলের গন্ধে জামা কাপড়ে পোকার আক্রমণ হয় না। এ রাজ্যে কেউ কেউ বিছানার ছারপোকা দমনের জন্য এই ফুল ব্যবহার করে থাকেন।

ফুলের ভেষজগুণও রয়েছে। কোন কোন সময় জ্বলন, ক্ষত ও কুষ্ঠ নিরাময়ে এর ব্যবহার হয়। এছাড়া ফুল টনিক গুণযুক্ত। গাছের বাকল, পাতা ও কাণ্ড বসন্ত রোগে উপকারী।

কাঠ সাদা, মোটামোটি শক্ত এবং উহা ভাল পালিশ নেয়। বিভিন্ন কাজে এর ব্যবহার রয়েছে।

বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

জংলী বাদাম

Sterculia foetida L.

গোত্র : Sterculiaceae

গণ সূচক শব্দটি এসেছে ল্যাটিন Stercus শব্দ হতে, যার অর্থ সার। foetida অর্থ খারাপ গন্ধ। দুয়ে মিলে এগাছের দুর্গন্ধ যুক্ত ফুলের কথা মনে করিয়ে দেয়।

সুন্দর বড় আকারের এই বৃক্ষটি আফ্রিকার উষ্ণ মণ্ডলের আদিবাসী। পশ্চিম ভারত, বার্মা, শ্রীলংকা, মালয়, অষ্ট্রেলিয়াতে এই গাছ জন্মায়। ভারতের অন্যান্য স্থানে মাঝে মাঝে দু একটি গাছ দেখা যায়। ত্রিপুরা রাজ্যে এগাছ বেশী নেই। আগরতলায় জগন্নাথ বাড়ীর পূর্ব দিকে দীঘির পাড়ে একটি বড় গাছ রয়েছে। এই লম্বা বৃক্ষটির গুড়ির দিক হতেই শাখাগুলি আবর্তাকারে বের হয় এবং চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পাতা যৌগিক, শাখার আগার দিকে থাকে :

একটি লম্বা বোঁটার আগায় ৭/৮ টি পত্রক থাকে। শীতের শেষে গাছের পাতা ঝরে যায়। ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্যন্ত গাছে ফুল আসে। ফুলের সঙ্গে আগের বছরের ফলও অনেক সময় গাছে দেখা যায়।

পত্রশূন্য শাখার আগায় লাল হলুদ বা বেগুনী রঙের পুষ্পগুচ্ছ বের হয়। ফুল আসার কিছুদিনের মধ্যে গাছে নূতন পাতা গজায়। ফুলের একটা বিশ্রী গন্ধ রয়েছে। ফুল ফোটার সময় গাছের কাছাকাছি এলেই গন্ধ পাওয়া যায়। ফুলের গন্ধে অনেক মাছি আকৃষ্ট হয়। একই গাছে পুং, স্ত্রী ও উভয়লিঙ্গ এই তিন প্রকারের ফুল দেখা যায়। প্রতি বোঁটায় এক হতে পাঁচটি নৌকার আকারের শুটির মত ফল দেখা যায়। ফলের রঙ লাল এবং তাতে কাল রঙের বীজ থাকে।

ফুল ও ফল হীন এই গাছকে দেখতে অনেকটা শিমুল গাছের মত। কিন্তু শিমূলের মত এই গাছের গায়ে কাঁটা থাকে না। গাছের বাকল সাদাটে বাদামী এবং বাকলের টুকরা গাছ হতে খসে পড়ে। জংলী বাদামের পত্রকগুলি শিমূলের তুলনায় আকারে বড় এবং পাতার বোঁটাও শিমূল হতে লম্বা।

ভাজা বীজ খাওয়া যায়। কাচা খেলে এ হতে মাথাঘোরা বা বমনোদ্রেক হয়। গাছের গুড়ি হতে এক প্রকারের আঠা পাওয়া যায়, যা বই বাঁধার কাজের উপযোগী। বাকল হতে পাওয়া তন্তু দড়ি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।

কাঠ হাল্‌কা, বিশেষ কাজে লাগে না। বীজের তেল ভেষজ গুণযুক্ত। উহা হজমী কারক ও রেচক। পাতা মৃদু বিরেচক। ফল কষায়। বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

উদাল

Sterculia villosa Roxb

গোত্র ঃ Sterculiaceae

প্রজাতি সূচক villosa শব্দের অর্থ লোমশ। এই গাছটি ভারতের আদিবাসী। এক সময় উষ্ণমণ্ডলীয় বিভিন্ন বনভূমিতে এর দেখা পাওয়া যেত। তবে এর বাকল হতে তন্তু সংগ্রহ করতে গিয়ে অধিকাংশ গাছ মারা গেছে। পর্ণমোচী বনভূমিতে এখনো কিছু গাছ রয়েছে। যার প্রমাণ পাই সরস্বতী পূজার সময় বাজারে উদাল ফুলের সমারোহ দেখে। আগরতলার ইন্দ্রনগরে আই টি আই চত্বরে ২/৩টি উদাল গাছ রয়েছে।

সাদাটে বাকলযুক্ত মাঝারি আকারের এই বৃক্ষটির ডালপালা ছড়ানো, পাতার উপরের দিক গভীর খাঁজ কাটা এবং খাঁজগুলি বোঁটার চারদিকে বিস্তৃত। পাতার নীচের দিক ঘন রোমে ঢাকা।

শীতে পাতা ঝরার পর গাছে ফুল আসে। একই গাছে পুং ও উভয়লিঙ্গ এই দুই প্রকারের ফুল হয়। ফুলগুলি গোছাবাঁধা অবস্থায় গাছ হতে ঝুলতে থাকে। ফুল হল্‌দেটে রঙের গন্ধযুক্ত। ফল রোমাবৃত ও ক্যাপসুল জাতীয়। একটি বোঁটায় বেশ কয়েকটি ফল থাকে। পাকা ফলের রং লাল। বীজ কাল রঙের।

অক্টোবর মাস পর্যন্ত পুরানো পাতা হল্‌দে হয়ে ঝরে যায়। গাছ কিছুদিন পত্রশূন্য থাকে। জানুয়ারীর শেষ বা ফেব্রুয়ারীর প্রথমে গাছে ফুল আসে। ক্রমশঃ গাছে নূতন পাতা দেখা দেয়। ফল এপ্রিলের শেষ বা মে মাসে পাকে। এই গাছের বাকলের ভেতরের অংশ হতে ভাল তন্তু পাওয়া যায় যা হতে বিভিন্ন অঞ্চলে কাছি, দড়ি,থলে ইত্যাদি তৈরী হয়। গবাদি পশু বাঁধার কাজে ও ভেলা তৈরীতে এই দড়ির ব্যবহার রয়েছে। জলে ভেজার পর এই দড়ি শক্ত হয়।

কোন কোন অঞ্চলে এর শেকড় খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। গাছের গুড়ি হতে এক প্রকার আঁঠা পাওয়া যায়। এর কাঠ হাল্কা, সছিদ্র, বিশেষ কজে ব্যবহৃত হয় না। জ্বালানী হিসাবেও উহা নিকৃষ্ট ধরনের। বীজ হতে প্রকৃতিতে বংশবৃদ্ধি হয়। ■

শিমূল

Bombax ceiba L.

গোত্র ঃ Bombacaceae

বৈজ্ঞানিক নাম নিয়ে এই গাছটির ন্যায় মতভেদ অন্য গাছের ক্ষেত্রে প্রায় দেখা যায় না। নানা বইতে একে *Bombax malabaricum, Salmalia-mabarica* ও *Bombax ceiba* প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সঠিক নাম *Bombax ceiba* বাকীগুলি সমার্থক নাম। Bombax শব্দটি এর ফল হতে পাওয়া তুলাকে বুঝাতে নেওয়া।Ceiba শব্দটি একটি আদিবাসী শব্দ। Salmalia শব্দটি সংস্কৃত শাল্মলী শব্দ হতে এসেছে। কথিত আছে পিতামহ ব্রহ্মা পৃথিবী সৃষ্টির পর নাকি এই গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।

এই ভারতীয় গাছটি আমাদের দেশের উত্তর অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র জন্মায়। ভারতের বাইরে মালয় ও বাংলাদেশে এই গাছ পাওয়া যায়। ত্রিপুরা রাজ্যে এখানে সেখানে এই গাছ রয়েছে। আগরতলার ইন্দ্রনগর ও কুঞ্জবন এলাকায় দু একটি গাছ রয়েছে।

ছড়ানো ডালপালাযুক্ত এই পর্ণমোচী বৃক্ষ ২৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। তবে এর কাঠ বেশ নরম। গাছের গায়ে কোণাকৃতি বড় বড় কাঁটা থাকে বিশেষ করে ছোট চারাগাছে, যা একে সুরক্ষা দেয়। পাতা বেশ বড়, উজ্জ্বল, সবুজ, ৫-৭টি পত্রকে বিভক্ত। শীতের সময় গাছের সব পাতা ঝরে যায়। জানুয়ারীতে পাতা ঝরার পর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত গাছে ফুল ফোটে।

ফুল উজ্জ্বল লাল রঙের। পত্রহীন গাছ লাল বড় বড় ফুলে ভরে যায়। লাল ফুলের বাহারের জন্য একেও কেউ কেউ 'বনের অগ্নিশিখা' বলে, যদিও বনের অগ্নিশিখা বলতে আসলে পলাশকে বুঝায়। ফুলের মধুর লোভেই বাবুই, ময়না, বুলবুল, চড়াই এমনকি কাক ও অন্য নানা প্রকার পাখী গাছে আসে এবং তাদের কাকলীতে প্রকৃতি মুখরিত হয়।

ফল লম্বাটে ডিম্বাকৃতি, ১০-১৫ সেমি লম্বা। ফলের খোসা শক্ত এবং পরিণত ফল হতে উহা পাঁচটি অংশে বিভক্ত হয়ে খসে পড়ে। বীজ কাল রঙের এবং সাদা আঁশে

আবৃত, যা বীজকে অনেক দূর বাতাসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

শিমূল কাঠ বেশ নরম। দেশলাই কাঠি তৈরীতে এর ব্যবহার হয়। এছাড়া পেকিং বাক্স, চায়ের পেটি, কফিন প্রভৃতি তৈরীতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। সহজে উঁই পোকার দ্বারা নষ্ট হওয়ায় স্থায়ী আসবাব তৈরীর কাজে সাধারণতঃ এর ব্যবহার হয় না। এর কাঠ হতে কাঠকয়লা ও কাগজ তৈরীর মণ্ড তৈরী হয়। শিমূল তুলা বালিশ গদি প্রভৃতি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। কচি ডালপালা ও পাতা ভাল পশুখাদ্য।

এই গাছ হতে পাওয়া আঠা বই বাধানোর কাজে ব্যবহার করা যায়। আয়ুর্বেদিক ঔষধে শিমূলের ব্যবহার রয়েছে। এর মূল উদ্দীপক ও টনিক্ গুণ বিশিষ্ট।

ছায়াতরু হিসেবে পথের পাশে এ গাছ লাগানো যায় তবে ডালপালা নরম হওয়ায় ঝড়ে ভেঙ্গে যেতে পারে। এজন্য যেখানে ঝড়ের দাপট কম এমন জায়গায় শিমূল গাছ লাগানো উচিত। বীজ হতে সহজে এই গাছ জন্মায় এবং সব রকম মাটিতেই গাছ ভালভাবে বাড়ে। ■
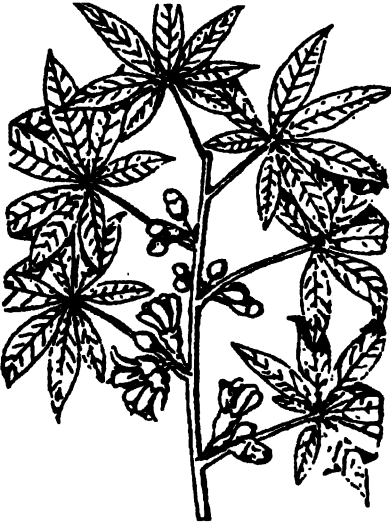
শ্বেত শিমূল

Ceiba pentendra (L.) Gaertn

সমার্থক নাম ঃ *Eriodcndron enfractuosum*

গোত্র ঃ Bombacaceac

বৈজ্ঞানিক নামের প্রথম শব্দটি এসেছে মধ্য আমেরিকার আদিবাসী শব্দ হতে আর দ্বিতীয় শব্দটি ফুলের পাঁচটি পুংকেশর বোঝাতে নেওয়া হয়েছে।

এই গাছের আদি বাসস্থান আমেরিকার উষ্ণ মণ্ডলীয় অঞ্চল, মালয় এবং ভারত ভূখণ্ডের আন্দামান দ্বীপ সমূহ। তবে বর্তমানে ভারতে বিভিন্ন স্থানে এই গাছ পাওয়া যায়। আগরতলার আই টি আই রোডের কাটা খালের সেতুর কাছে এর কয়েকটি গাছ রয়েছে।

ঋজু কাণ্ডের বেশ বড় গাছ। গাছের ছাল ধূসর বাদামী বা সবুজাভ। ডালপালা

যুক্ত। পাতা যৌগিক। প্রতি পাতার লম্বা বোটার আগায় ৫-৮ টি সরু পত্রক থাকে। শীতের সময় গাছের পাতা ঝরে যায় এবং অসংখ্য সাদা ফুলের গুচ্ছ গাছকে ঢেকে ফেলে। অনেক সময় নূতন পাতা ও ফুল একই সঙ্গে বের হয়। ফুল ফোটার সময় জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, প্রতি ফুলে ৫ টি লম্বা পুংকেশর থাকে। ফল লম্বাটে, ক্যাপসুল জাতীয় দেখতে অনেকটা ছোট শশার মত। বীজের গায়ে রয়েছে সাদা রেশমী আঁশ। এর গাছ অনেকটা শিমূল গাছের মত। এর পত্রক শিমূলের তুলনায় আকারে ছোট এবং ফুল সাদা রঙের।

এই গাছের ফল হতে পাওয়া আঁশ অতি উত্তম শ্রেণীর। গদি বা বালিশের তুলা হিসেবে এর জুড়ি নেই। হাল্কা ও জল নিরোধক হওয়ায় জলে ভাসার ভেলা বা বয়া তৈরীতে এর চাহিদা রয়েছে, তবে আমাদের দেশে এর ব্যবহার খুবই কম।

কচি ফল সব্জি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বীজ পশুখাদ্য। কাঠ বেশ হাল্কা ও নরম। খুব কম কাজে ব্যবহৃত হয় কারণ সহজে নষ্ট হয়ে যায়। তবে জলে অনেকটা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় এই গাছের গুড়ি কুঁদে নৌকা তৈরী করা হয়। শেকড়ের রস বহুমূত্র নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের আঠা পেটের পীড়ার উপকারী। গাছের ছাল জ্বর উপশম করে।

আমরা শিমূল ও শ্বেত শিমূলের কথা আলোচনা করেছি। হলদে শিমূল *Cochlospermum gossypium* ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। আগরতলায় এম বি বি কলেজ চত্বরে এর একটি গাছ ছিল যা বেশ কয়েক বছর আগে রাস্তা চওড়া করার জন্য কাটা পড়ে। আমাদের জানা মত বর্তমানে এই রাজ্যে এই গাছ আর নেই। ■

স্থল পদ্ম

Hibiscus mutabilis L.

গোত্র ঃ Malvaceac

অন্যনাম ঃ থলপদ্ম

গণ সূচক শব্দ ম্যালো গাছের ল্যাটিন নাম হতে নেওয়া। প্রজাতি সুচক শব্দের অর্থ পরিবর্তনশীল। এতে ফুলের রঙ পরিবর্তন করা বুঝায়।

এই গাছের আদি বাসস্থান চীন। এখন উষ্ণ মণ্ডলীয় প্রায় সব দেশে এর চাষ হয়। ভারতবর্ষের সমতল অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে একে দেখা যায়। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ রয়েছে। আগরতলায় অনেক বাড়ীতে স্থলপদ্ম গাছ রয়েছে।

আমাদের বেশ পরিচিত এই গাছটিকে সাধারণতঃ ফুল ফোঁটা শেষ হলে ছেটে দেওয়া হয়। ফলে একে গুল্ম জাতীয় গাছ বলে মনে হয়। কিন্তু না ছাট্‌লে কয়েক বছরে ছোট বৃক্ষে পরিণত হয়। গাছের ডালপালা বেশ সোজা। বাকল ধূসর রঙের। গাছের গোড়া হতে ডালপালা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায় একে ছোট ঝোপের মত মনে হয়। লম্বা বোঁটাযুক্ত পাতাগুলি আকারে বড়, ময়লাটে সবুজ রঙের এবং মৃদু রোমযুক্ত। শিরাবিন্যাস করতলাকৃতি জালিকাকার।

বড় বড় ফুলগুলি পাতার কক্ষে লম্বা বোঁটায় জন্মায়। ফুলের বড় পাপড়িগুলি কয়েকটি আবর্তে সাজানো থাকে। ফল গোলাকার রোমশ, ক্যাপসুল জাতীয়। প্রতি ফলে বেশ কিছু বাদামী রঙের বীজ থাকে।

কোন কোন জাতের স্থলপদ্ম সকালে ফোটার সময় সাদা রঙের থাকে, যা বেলা বাড়ার পর গোলাপী ও দিনের শেষে গাঢ় লাল রঙে পরিবর্তিত হয়। কোন কোন জাতে ফুলের রঙের কোন পরিবর্তন হয় না।

ফুলের রঙ পরিবর্তনের সঙ্গে সূর্যের আলোর একটা সম্বন্ধ রয়েছে। সাদা জাতের ফুল ফোটার পর ভোরে ঘরের মধ্যে নিয়ে রাখলে রঙ পরিবর্তন হতে অনেক সময় লাগে।

ফুল না থাকা অবস্থায় গাছকে ততটা সুন্দর দেখায় না। কোন কোন গাছে বছরে দুবার ফুল ফোটে। অক্টোবর-নভেম্বর এবং মে মাসে। সাধারণতঃ শরৎকালীন ফুল ফোটার পর গাছের ডালা ভালোভাবে ছেটে দিলে বসন্তে আবার ফুল ফোটে।

এই গাছের বাকল হতে তন্তু পাওয়া যায়। তবে বিশেষ কোন কাজে এর ব্যবহার দেখা যায় না। কাঠ সাদা নরম, কোন কাজে লাগে না।

মালয় ও চীনে বক্ষঃস্থলের পীড়ায় এর ফুল ব্যবহৃত হয় এবং হাত পা ইত্যাদি ফোলায় পাতার ব্যবহার হয়।

সাধারণতঃ কাটিং হতে বংশবৃদ্ধি করা হয়। ■

পোলা

Kydia calycina Roxb

গোত্র ঃ Malvaceae

এই গাছটি পূর্বোত্তর ভারত ও চীন দেশের বাসিন্দা, ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে পর্ণমোচী বৃক্ষের বনে একে দেখতে পাওয়া যায়।

মাঝার আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ জাতীয়গাছ। এর কচি ডালপালা ধূসর রঙের তারকাকৃতি রোমে ঢাকা। পাতা ৮-১৫ সেমি লম্বা, অনেকটা গোলাকার। পত্রমূল কিছুটা তাম্বুলাকার। পাতার ফলকের গোড়া হতে ৫-৭ শিরা করতলাকারে বিস্তৃত। পাতার নীচের দিক রোমে ঢাকা।

ফুল গোলাপী রঙের। একই গাছে একলিঙ্গ ও উভয়লিঙ্গ ফুল দেখা যায়। পাতার কক্ষে বা শাখার আগায় ফুলগুলি গুচ্ছাকারে সাজানো। ফল আকারে ছোট, উপ গোলাকার ক্যাপসুল জাতীয়। তিন কক্ষযুক্ত ফলের প্রতি কক্ষে একটি করে বীজ থাকে।

এর কাঠ দেশলাই, পেন্সিল, প্লাইউড প্রভৃতি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও এর কাঠ কাগজের মণ্ড তৈরীর উপযোগী। বাকল হতে দড়ি তৈরী হয়। উদ্ভিদ শ্লেষ্মা (mucilage) শর্করা শিল্পে চিনি পরিষ্কারে ব্যবহৃত হয়।

ভেষজ গুণ হিসাবে পাতার মণ্ড বাত, কটিবাত প্রভৃতিতে বহিঃপ্রয়োগে উপকারী। ■

পরশ

Thespesia populanea (L.) Soland

গোত্র ঃ Malvaceae

অন্যনাম ঃ পরশ পিপুল

বৈজ্ঞানিক নামের প্রথম শব্দ Thespesia-র অর্থ স্বর্গীয়। সম্ভবতঃ মন্দির, গীর্জা

প্রভৃতির প্রাঙ্গণে এই বৃক্ষ লাগানো হয় এই জন্যই এই নাম। প্রসঙ্গতঃ এই গাছটির প্রথম বর্ণনা পাই ক্যাপ্টেন কুকের লেখায়। তিনি এই গাছটি তহিতির মন্দির প্রাঙ্গণে প্রথম দেখেন। Populnea শব্দের অর্থ পপ্‌লার গাছের মত পাতা বিশিষ্ট। হিন্দিতে একে ভেণ্ডী বৃক্ষ বলে কারণ এর ফুল ভেণ্ডী বা ঢেরসের ফুলের মত বড় ও হলদে রঙের। আগরতলার বুদ্ধ মন্দিরের সামনে রাস্তায় এর কয়েকটি গাছ রয়েছে। দ্রুত বর্দ্ধনশীল, চির সবুজ আমাদের এই বৃক্ষটি ছায়াতরু হিসাবে লাগানোর বেশ উপযুক্ত। আমাদের দেশীয় এই গাছটি কঙ্কন উপকূলে বুনো গাছ হিসাবে জন্মায়। ভারতের তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও কেরালা রাজ্যে এবং কলিকাতা ও চণ্ডীগড়ে কয়েকটি বড় রাস্তার ধারে এই গাছ লাগানো হয়েছে। ভারত ছাড়া ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ও পূর্ব আফ্রিকাতে এই গাছ পাওয়া যায়।

ছোট হতে মাঝারি আকারের বৃক্ষ, গুড়ি ধূসর বর্ণের। ডালপালা ঘন সন্নিবিষ্ট ছত্রাকারে বিস্তৃত, যে জন্য ইংরাজীতে এক ছত্রবৃক্ষ (Umbrella tree) বলা হয়। পাতা একান্তরভাবে বিন্যস্থ, পান পাতার মত, কিন্তু অগ্রভাগ অনেকটা অশ্বত্থ পাতার মত লম্বাটে। শীতের শেষের দিকে অধিকাংশ পাতা হলদে হয়ে ক্রমশঃ ঝরে যায়। তবে গাছ কখনো একবারে পত্রশূন্য হয় না। ফুল বেশ বড়, উজ্জল হলদে রঙের, পাপড়ির ভেতরের দিকে বেগুনী দাগ থাকে। ফোটার পর ফুলের রঙ লাল্‌চে রঙের হয়। ফল অনেকটা গোলাকার। পাকা ফল কাল রঙের। ফুল প্রায় সারা বছর ফুটলেও শীতের সময় বেশী পরিমাণে ফোটে।

ফুল ও ফল হতে হলদে রঙ পাওয়া যায়, তবে এর কোন বিশেষ ব্যবহার দেখা যায়না। গাছের ছাল হতে তন্তু পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এর ব্যবহার না থাকলেও অন্যত্র এ দিয়ে দড়ি, থলে প্রভৃতি তৈরী হয়। কাঠ বেশ দৃঢ় এবং জলে নষ্ট হয় না। গরুর গাড়ীর চাকা, বাক্স, নৌকা প্রভৃতি প্রস্তুতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। ফল, পাতা ও মূলের প্রলেপ কোন কোন স্থানে চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের সার কাঠ লাল রঙের,

মালয়ে উহা হৃদরোগ প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বীজ বা কাটিং হতে সহজে বংশবৃদ্ধি করা যায়। হাল্কা দো-আঁশ ও লবণাক্ত মাটিতে এই গাছ ভাল জন্মায়। সারা বছর ফুল দেয় এবং ছায়া তরু হিসাবেও মূল্যবান এজন্য রাস্তার পাশে বেশী করে এই গাছ লাগানো যেতে পারে। ■

খুদি জাম

Antidesma ghasembilla Gaertn

সমার্থক নাম ঃ *A. paniculata*

গোত্র ঃ Euphorbiaceae

নামের গণ সূচক শব্দে দড়ি তৈরীতে এর বাকলের ব্যবহারের কথা বুঝায়। প্রজাতি সূচক শব্দটি সিংহলী ভাষা হতে এসেছে। অন্য প্রজাতি সূচক শব্দ Paniculata দ্বারা Panicle পুষ্পবিন্যাস বুঝায়।

এই গাছটি ভারতের উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের অধিবাসী। ভারতের বাইরে শ্রীলংকা, মালয়, চীন, অষ্ট্রেলিয়ায় এই গাছ জন্মায়। ত্রিপুরা রাজ্যের সদর বিভাগের বিভিন্ন স্থানে বন বা গ্রামের উপকণ্ঠে একে দেখা যায়।

ছোট আকারের বৃক্ষ বা গুল্ম জাতীয় গাছ। বাকল ধূসর বা হাল্কা বাদামী রঙের। শাখা প্রসাখা ও পাতার পিছনের দিকে মরচে রঙের রোমে থাকে। পাতা সরল, বোঁটা ছোট, ফলকের দুই দিক গোলাকার। শীতের শেষে গাছে নতুন পাতা গজায়।

ছোট ফুলগুলি ডালার আগায় স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে সাজানো থাকে। স্ত্রী ও পুং পুষ্প আলাদা গাছে জন্মায়। পুং পুষ্প অনেকটা হলদেটে রঙের। কিন্তু স্ত্রী পুষ্পের রঙ সবুজাভ। মার্চ হতে মে মাসে গাছে ফুল ফোটে। সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত গাছ ফল পাকে। ফল ছোট আকারের, পাকা ফল লাল বা কাল্‌চে রঙের।

ফল অম্ল স্বাদযুক্ত। খাদ্যোপযোগী। পাতাতেও অম্ল স্বাদ রয়েছে। কোন কোন সময় খাদ্যকে অম্লভাবাপন্ন করতে এর পাতা ব্যবহার হয়। কাঠ বিশেষ কজে লাগে না। কোথাও কোথাও কুঁড়ে ঘর ইত্যাদি তৈরীতে হাল্কা বরগা বা আড়া হিসাবে এর কাঠ

ব্যবহার করা হয়।

পাতা ভেষজগুণ বিশিষ্ট। মাথা ধরা, তলপেটের ফোলা এবং খুস্কির উপশমে এর ব্যবহার দেখা যায়। কোন কোন স্থানে জ্বরে এই গাছের পাতার ক্বাথ মিশ্রিত জলে স্নান করানো হয়।

গাছের বাকলের দড়ি তৈরীতে ব্যবহার রয়েছে। ■

জাঁকি

Bischofia javanica BL.

গোত্র ঃ **Euphorbiaceae**

অন্যনাম ঃ খুংথি

গণ সূচক শব্দটি এসেছে উনবিংশ শতাব্দির হাইডেল বার্গের অধ্যাপক F.W. Bischoft এর নাম অনুসারে। প্রজাতি সূচক শব্দে জাভায় জাত বুঝায়।

এই বৃক্ষটি হিমালয়ের পাদদেশের পার্বত্য অঞ্চল, আসাম, ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থানে জন্মায়। ত্রিপুরা রাজ্যের জম্পুই পাহাড়ে এই গাছ রয়েছে। ভারতের বাইরে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, বার্মা, মালয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপে একে দেখা যায়। এই গাছের বাংলা কোন নাম নাই। জাকি বা খুংথি নামটি সম্ভবতঃ জম্পুই অঞ্চলে দেওয়া স্থানীয় নাম।

বেশ বড় আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ। ডালপালা ছড়িয়ে গাছের উপরিভাগ অনেকটা গোলাকার হয়ে থাকে। বাকল গাঢ় বাদামী রঙের, পাতা যৌগিক। তিনটি বড় আকারের চক্চকে পত্রক দিয়ে গঠিত। পত্রকগুলি সূক্ষ্মাগ্র, পুং ও স্ত্রী পুষ্প আলাদা গাছে জন্মায়। ফুল ছোট, সবুজাভ এবং গোছা বেঁধে থাকে। ফল কালচে নীল রঙের, মাংসল বেরী জাতীয়। প্রতি ফলে কয়েকটি চক্চকে বীজ থাকে।

ফেব্রুয়ারী মাসে গাছে ফুল আসতে শুরু করে এবং এপ্রিল পর্যন্ত ফুল ফোটে। পুরুষ গাছগুলির ডাল এই সময় ফুলের ভারে নুইয়ে পড়ে। শীতের শুরুতে ফল পাকে।

কাঠ বেশী শক্ত নয়, তবে নির্মাণ কাজের উপযুক্ত এবং নানা কাজে এর ব্যবহার

ও দেখা যায়। জলের সংস্পর্শে দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় নৌকা, সেতু প্রভৃতি নির্মাণে এর ব্যবহার রয়েছে।

বাকল হতে লাল রঙ পাওয়া যায়। ভেষজ গুণ হিসাবে পাতার রস ক্ষত নিরাময়ে উপকারী। ■

তেকাটা সিজ

Euphorbia antiqurum L.

গোত্র ঃ **Euphorbiaceae**

অন্যনাম ঃ তেশিরা মনসা / শিবগাছ
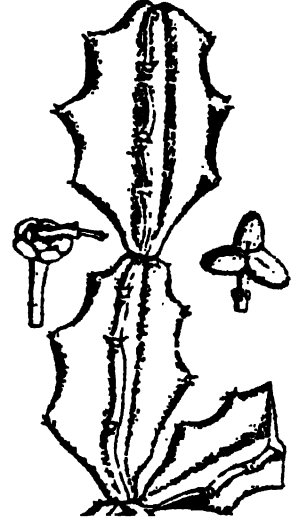
প্লিনির মতে গণসূচক নামটি এসেছে মিউরিটিনিয়ার রাজা জুবার এক চিকিৎসকের নাম অনুসারে। এই গণভুক্ত প্রচুর প্রজাতির মধ্যে নরম কাণ্ডের কিছু বৃক্ষজাতীয় গাছও রয়েছে। প্রজাতি সূচক শব্দের অর্থ প্রাচীন লেখক সম্বন্ধীয়।

এই গাছটি ভারত ও শ্রীলংকার শুকনো অঞ্চলের আদিবাসী। ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক স্থানে এই গাছ রয়েছে।

মাংসল বৃক্ষ বা গুল্মজাতীয় গাছ। কাণ্ড নরম, কন্টকাবৃত। শাখা প্রশাখা গ্রন্থিল। কোণাকৃতি। তিন বা পাঁচ কোণ যুক্ত। কাঁটাগুলি এই কোণে জন্মায়। পাতা আকারে খুব ছোট এবং অল্প দিনের মধ্যে ঝরে যায়, এজন্য গাছকে পত্রশূন্য মনে হয়। শাখার আগার দিকে হাল্কা হলদে রঙের পুষ্পগুচ্ছ জন্মায়। পুষ্পহীন গাছকে ক্যাক্টাসের মত মনে হয়। জানুযারী হতে মার্চে ফুল ফোটে।

অনেক সময় বেড়ার কাজে এই গাছকে ব্যবহার করা হয়। এই গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে, এজন্য বেড়ার কাজে বেশ উপকারী। কোন কোন সময় শোভাবর্দ্ধক উদ্ভিদ হিসাবে বাগান ইত্যাদিতে একে লাগানো হয়।

এ গাছের বাকল শেকড় ও রস ভেষজগুণযুক্ত। নানা রোগে এদের ব্যবহার রয়েছে। তরুক্ষীর ও শেকড় রেচক গুণযুক্ত। গাছের রস বাত, দাঁতের ব্যাথা, স্নায়ু রোগ প্রভৃতিতে উপকারী। মাছ মারার জন্য অনেকে বিষ হিসেবেও এই গাছের রস ব্যবহার করে থাকেন। ক্ষতের কীট মারার জন্য ও এর ব্যবহার রয়েছে।

[illegible] অঞ্চলে এই গাছকে পবিত্র মনে করা হয়। অনেকের বিশ্বাস এই গাছ বাড়িতে থাকলে বাজ পড়ে না।

গাছের ডাল কেটে মাটিতে লাগিয়ে দিলেই বিভিন্ন জাতের সিজ গাছ সহজে বেঁচে যায় এবং এভাবে এদের বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

মনসা সিজ

Euphorbia neriifolia L.

সমার্থক নাম ঃ ***E. ligularia***

গোত্র ঃ **Euphorbiaceae**

প্রজাতি সূচক শব্দে করবীর মত পাতা যুক্ত বুঝায়। কিন্তু প্রায়ই এই দুই গাছের পাতার কোন মিল দেখা যায় না। এই গাছটির আদি বাসস্থান ভারত ও বার্মার শুষ্কভূমি অঞ্চল। অনেক সময় গ্রামের পতিত জমিতে একে দেখা যায়। ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক স্থানে এগাছ রয়েছে। আগরতলায় মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের পুরানো বাগানের পশ্চিম পাশে কয়েকটি গাছ ছিল। অনেক সময় উপজাতিদের বাড়ীর বেড়া হিসাবে এই গাছ লাগানো হয়। ফুল দুংসাইতে এমনটি দেখেছি।

ছোট ঋজু বৃক্ষ বা গুল্ম জাতীয় গাছ। কাণ্ড মাংসল, রোমহীন। ছোট পর্বযুক্ত ডালপালা আবর্তাকারে কাণ্ডে সাজানো থাকে। ডালপালাগুলি অনেকটা পাঁচ কোণাকৃতি। ছোট শাখাগুলি সবুজ এবং তার আগার দিকে পাতাগুলি থাকে। পাতার আগার দিক চওড়া। গাছে বেশ কাঁটা থাকে। কাঁটাগুলি শাখার পর্বে জোড়ায় জোড়ায় সাজানো। ছোট হলদেটে ফুলগুলি গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় শাখার আগার দিকে থাকে। ফুল দু প্রকার, পুং ফুল ও উভয়লিঙ্গ ফুল। ফল আকারে ছোট, তিনটি খাঁজযুক্ত। প্রতি অংশে একটি করে বীজ থাকে। গ্রীষ্মকালে গাছে ফুল হয়।

ধর্মীয় কারণে হিন্দুদেব বাড়ীতে বা মন্দির প্রাঙ্গণে এই গাছ লাগানো হয। এই গাছকে সর্পদেবী মনসার প্রতীক হিসাবে মনে করা হয়। এ গাছের ভাঙ্গা ডাল হতে নাকি বিষাক্ত গ্যাস বের হয়।

এ গাছে প্রচুর তরুক্ষীর পাওয়া যায়। উহা ভেষজগুণ যুক্ত। এর রেচকগুণ খুব বেশী। কানের ব্যথায় এর ব্যবহার রয়েছে। চোখের প্রদাহে একে কাজলের সঙ্গে মিশিয়ে

ব্যবহার করা হয়। সরবতের সঙ্গে মেশানো তরুক্ষীর হাঁপানী ও বায়ুনালীর প্রদাহে উপকারী। আঁচিলেও তরুক্ষীর উপকারী। সাধারণের বিশ্বাস এই তরুক্ষীর সর্প বিষের প্রতিরোধক।

সাধারণ সিজ বা *Euphorbia nivulia*-র সঙ্গে এই গাছটির অনেক মিল থাকায় অনেক সময় দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। তবে মনসা সিজে কাঁটাগুলি কাণ্ডের উপবৃদ্ধির উপর জন্মায়। কিন্তু সাধারণ সিজে কাঁটা অনেক সময় থাকে না, এবং থাকলেও উপবৃদ্ধির উপর না হয়ে কাণ্ডের উপর কর্কের মত দাগে জন্মায়। প্রসঙ্গতঃ সাধারণ সিজ গাছটিও এ রাজ্যে পাওয়া যায়। ■

লংকাসিজ

Euphorbia tirucalli L.

গোত্র : **Euphorbiaceae**

প্রজাতিসূচক শব্দটি মালয়ালাম ভাষা হতে নেওয়া।

গাছটির আদি বাসস্থান আফ্রিকার উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চল। তবে এখন ভারত বার্মা ও শ্রীলংকার বিভিন্ন অঞ্চলে এ গাছ প্রচুর দেখা যায়। আগরতলা শহরেও কোন কোন বাড়ীতে এ গাছ রয়েছে। কলেজটিলায় থাকাকালীন আমার বাড়ীতে একটি গাছ ছিল। যার ডালপালা ছেটে দিলেও গুড়িটির বেড় পঞ্চাশ সেমি এর বেশী হয়েছিল।

ঝোপের মত দেখতে গুল্ম জাতীয় গাছ। না কাটলে ছোট বৃক্ষের আকার নিতে দেখা যায়। গাছের গুঁড়ি সবুজে বাদামী বাকলে ঢাকা থাকে। কাণ্ড হতে অনেক নরম ডালপালা জন্মায়। পাতা অনেক সময় দেখা যায় না। দেখা গেলেও আকারে তা অনেক ছোট হয় এবং অল্প কিছুদিন পর গাছ হতে খসে পড়ে। শাখার আগায় ছোট ছোট ফুলগুলি গুচ্ছাকারে থাকে। ফল গাঢ় বাদামী রঙের। ফলের গা ভেলভেটের মত মসৃণ এবং তিনটি খাঁজ যুক্ত।

গাছের সমস্ত অংশ জুড়ে রয়েছে দুধের মত তরুক্ষীর। এই তরুক্ষীর কাটা ছেড়া প্রভৃতিতে লাগালে বেশ যন্ত্রণা হয় এবং চোখের পক্ষেও উহা ক্ষতিকারক। তবে ভেষজ গুণের জন্য নানা রোগে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। বিশেষ করে আঁচিলের চিকিৎসা ও বাত
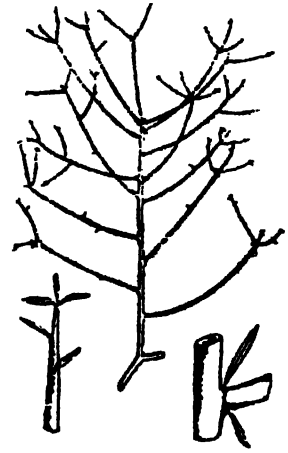
রোগে। নেপালে এই তরুক্ষীর হতে রবার উৎপন্ন করা হয়।

কাঠ মোটামোটি শক্ত। ভেলা তৈরী ও অন্য কাজে এর ব্যবহার রয়েছে। এই গাছের কাঠকয়লা বারুদ তৈরীর ভাল উপাদান। ■

সাদা কেরণ

Jatropha curcus L.

গোত্র : Euphorbiaceae

অন্যনাম : বাগ ভেরেণ্ডা

গণ সূচক শব্দ দুটি গ্রীক শব্দ হতে এসেছে, 'Jatros' অর্থ চিকিৎসক, "trophe" অর্থ খাদ্য। এ হতে গাছটির ভেষজগুণের কথা বুঝায়। প্রজাতিসূচক শব্দ এসেছে এ গাছের প্রাচীন ল্যাটিন নাম হতে।

গাছটির আদি বাসস্থান আমেরিকার উষ্ণ মণ্ডলীয় অঞ্চল। বর্তমানে উষ্ণমণ্ডলীয় প্রায় সব দেশে এ গাছ দেখতে পাওয়া যায়। ত্রিপুরায়ও এ গাছ রয়েছে। আগরতলা ও তার আশপাশে বাড়ীর বেড়া বা বেড়ার খুঁটি হিসাবে এ গাছ লাগাতে দেখেছি।

নরম কাণ্ডের বড় গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ জাতীয় গাছ। চির সবুজ, বাকল সবুজাভ। পরিণত কাণ্ড হতে হলদেটে কাগজের মত পাতলা বাকলের টুকরা বের হতে দেখা যায়। পাতা খানিকটা মণ্ডলাকৃতি। তবে পাতার কিনারা ৩-৫ টি খণ্ডে বিভক্ত। পত্রবৃন্ত লম্বা।

ফুল সবুজাভ হলুদ। একলিঙ্গ এবং তারা ক্ষুদ্র বৃন্তের উপর গুচ্ছবদ্ধভাবে থাকে। সহবাসী। ফল অনেকটা ডিম্বাকৃতি। পাকা ফল কাল রঙের। মার্চ হতে গাছে ফুল হয়। সেপ্টেম্বর হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ফল পাকে।

গ্রামদেশে বাড়ীর বেড়ার জন্য এর ব্যবহার দেখা যায়। কাটিং হতে সহজে বংশ বৃদ্ধি করা যায়। গরু ছাগল না খাওয়ায় এই গাছটি বেড়ার কাজের জন্য বেশ উপযুক্ত।

বীজ পাতা ও গাছের রস ভেষজ গুণযুক্ত এবং বিভিন্ন রোগে এদের ব্যবহার রয়েছে। বীজ রেচক তবে কোন কোন সময় এর ব্যবহারে বিষক্রিয়া দেখা যায়। গাছের রস দাঁতের ব্যাথা ও দাঁত হতে রক্তপড়া বন্ধ করে। তবে রস চোখে লাগলে অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্ষত ইত্যাদি বাঁধার জন্য থেতলানো পাতার ব্যবহার রয়েছে।

গাছের ডাল দাঁতন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। গাছের বাকল হতে কাল বা গাঢ় নীল রং পাওয়া যায়। বীজ হতে পাওয়া তেল অনেক সময় গরীবরা প্রদীপ জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করে। এছাড়া সাবান মোম প্রভৃতি তৈরীতেও ঔষধ প্রস্তুতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। বীজে তেলের পরিমাণ ২৮-৩০ শতাংশ। বাজারে এই তেলের নাম স্যারকাস তেল, চীন দেশে এই তেল হতে বার্নিস তৈরী করা হয়। খইল সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

এ গাছের রস হতে খড়ের সাহায্যে ফুঁ দিয়ে বুদ্ বুদ্ তৈরী করার খেলা ছোটদের মধ্যে দেখা যায়।

বাণিজ্যিক ভাবে এ গাছের চাষ করে যেতে পারে। পতিত জমিতেও এ গাছ ভালই জন্মায়। *Jatropha* গণভুক্ত অন্য একটি প্রজাতি *J. gossipifolia* বা লাল কেরন এ রাজ্যে পাওয়া যায়, যার গাছ আকারে ছোট এবং এর পাতা লালচে রঙের। ■

কামেলা

Malotus phillippinensis H & B

গোত্র ঃ **Euphorbiaceae**

অন্যনাম ঃ কাইমালা / কিশূর
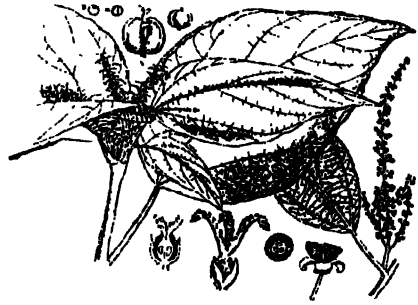
ভারতের উষ্ণ মণ্ডলের অধিবাসী এই বৃক্ষ হিমালয়ের পাদদেশে পশ্চিম হতে পূর্ব পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পাওয়া যায়। ভারতের বাইরে দক্ষিণ চীন হতে দক্ষিণ দিকে এই গাছ রয়েছে। ত্রিপুরার প্রায় সর্বত্র এই গাছ পাওয়া যায়।

ছোট আকারের চিরসবুজ বৃক্ষ। ৬-১০ মিটার লম্বা, কচি ডালপালা, মরিচা রঙের রোমে ঢাকা থাকে। পাতা একান্তর, ৭-১৫ সে. মি. লম্বা। ডিম্বাকার বা ডিম্বাকৃতি আয়তাকার, কখনো বা ভল্লাকৃতি। পাতার কিনারা সম্পূর্ণ বা দন্তুর। পাতার নীচের দিক রোমে ঢাকা এবং তাতে অনেক লাল রঙের গ্লাণ্ড রয়েছে। ফুল একলিঙ্গ, ভিন্নবাসী, পুংপুষ্প শাখার আগায় যৌগিক স্পাইক পুষ্প বিন্যাসে থাকে। স্ত্রী পুষ্প ছোট ছোট সরল স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। ফল ক্যাপসুল জাতীয় এবং উহা উজ্জ্বল লাল রঙের রজন জাতীয় পদার্থের পাউডারে ঢাকা থাকে। জানুয়ারী হতে মার্চ ফুলের সময়, ফল মার্চ হতে

আগষ্টে দেখা যায়।

ফল হতে এক প্রকার লাল রঙ পাওয়া যায়, যা রঞ্জনকার্যে ব্যবহৃত হয়। রঙ শিল্পে বীজের তেলের ব্যবহার রয়েছে। খৈল সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এর কাঠ ঘরের খুঁটি ইত্যাদির কাজে ব্যবহার হয়। আমাদের দেশের একটা প্রবাদ অনুযায়ী শাল সত্তর বছর, সোনাল আশি বছর কিন্তু কাইমালা কাঠ যুগ যুগ ধরে স্থায়ী। অর্থাৎ কীট পতঙ্গ ইত্যাদির হাত হতে এই কাঠ বহুদিন নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। পাতা ভাল পশুখাদ্য, বাকল ট্যানিং-এ ব্যবহৃত হয়।

ভেষজ গুণ হিসেবে এর ফলের গায়ের রোম ও গ্লাণ্ড, তিক্ত, ক্রিমিনাশক, বিরেচক ও সঙ্কোচক গুণযুক্ত। চর্মরোগে এর বাহ্যিক ব্যবহার রয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে ফলের গায়ের গ্লাণ্ডযুক্ত রোম স্ত্রী ইঁদুর ও গিনিপিগের উর্বরতা হ্রাস করে। ভবিষ্যতে এ হতে পরিবার নিয়ন্ত্রক ভেষজ আবিষ্কার হতে পারে। ■
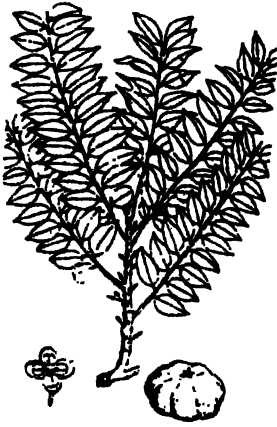
হরবরই

Phyllanthus acidus (L.) Skeels

সমার্থক নাম : *Cicca adida*

গোত্র : Euphorbiaceae

অন্যনাম : লেউর

গণসূচক শব্দটি এসেছে দুটি গ্রীক শব্দ হতে। Phullon অর্থ পাতা, anthos অর্থ ফুল, দুয়ে মিলে পাতার মত অংশ হতে আসা ফুলের কথা বুঝায়। acidus অর্থ অম্ল স্বাদযুক্ত। Cicca শব্দের অর্থও টক।

মালয় ও মাদাগাস্কারের আদিবাসী এই বৃক্ষটি বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষ করা হয়। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে এই গাছ রয়েছে। আগরতলা শহরে ধলেশ্বর, ইন্দ্রনগর অঞ্চলে কয়েকটি গাছ রয়েছে।

ছোট বৃক্ষজাতীয় এই গাছটির ডালপালা তুলনামূলকভাবে মোটা, বাকল মসৃণ ধূসর রঙের। প্রধান শাখার আগার দিক ছোট ছোট নরম সবুজ বা লালচে রঙের পল্লব বা সীমিত বৃদ্ধির শাখা বের হয়। প্রতি বছর এসব শাখা ঝরে যায়। গাছের পাতা ঐসব

শাখায় থাকে। পাতার বোঁটা ছোট, আগা ছুঁচালো এবং তারা দু-সারিতে শাখায় সাজানো থাকে, তবে পত্র বিন্যাস বিপরীত নয়।

প্রধান শাখা হতে ছোট বেগুনী বা লালচে বাদামী বা সবুজাভ ফুলগুলি বের হয়। প্রতি ফুলের গোছায় অনেক সময় পুং, স্ত্রী ও উভয়লিঙ্গ ফুল একই সঙ্গে দেখা যায়।

ফল হাল্কা সবুজ, অনেকটা গোলাকার। তবে ফলত্বক খাঁজযুক্ত। বীজ বেশ শক্ত। ফল অম্ল স্বাদযুক্ত। সাধারণতঃ গরমের সময় গাছে ফুল ফোটে এবং বর্ষায় ফল পাকে। অনেক সময় বছরে দুবার ফুলও ফল হয়। ফল আচার, চাটনী ইত্যাদি তৈরী করে খাওয়া যায়। পাতা সব্জী হিসাবে খাওয়া যায়। ফল ভেষজ গুণযুক্ত। উহা যকৃতের ভাল টনিক এবং রক্ত বৃদ্ধিকারক। মূল ও বীজ রেচক গুণসম্পন্ন।

কাঠ হাল্কা বাদামী রঙের। মোটামুটি শক্ত তবে বিশেষ কোন কাজে ব্যবহৃত হয় না। বীজ হতে বংশ বৃদ্ধি করা যায়। ■

আমলকী

Phyllanthus emblica L.

সমার্থক নাম ঃ Emblica officinalis

গোত্র ঃ Euphorbiaceae

অন্যনাম ঃ আমলা

বৈজ্ঞানিক নামের প্রথম শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ হতে এসেছে। Phullon অর্থ পাতা, anthos অর্থ ফুল। দুয়ে মিলে পাতার মতো অঙ্গ হতে আসা ফুলের কথা বুঝায়। emblica শব্দটি এই গাছের পুরানো নাম হতে নেওয়া হয়েছে। খুব সম্ভবত এই শব্দটি পারসিক শব্দ amlah হতে এসেছে। এই বৃক্ষটি ভারতের উষ্ণমণ্ডলের আদিবাসী। ভারতের মরু অঞ্চল ছাড়া প্রায় সর্বত্রই এর দেখা পাওয়া যায়। তবে বারাণসীর কলমের গাছ দেখতে বেশ সুন্দর এবং ফলও আকারে বড়। ত্রিপুরার কোন কোন অঞ্চলে এই গাছ পাওয়া যায়। আগরতলায়ও কোন কোন বাড়ীতে আমলকী গাছ রয়েছে।

মাঝারী আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ। বাকল মসৃণ ও ধূসর রঙের। পাতা খুবই ছোট

ও হাল্কা। এই গাছের একটি বৈশিষ্ট্য হল পাতা ঝরার সময় ছোট ছোট ডালও ঝরে যায়। ডালের নীচের দিকে পাতার নীচে ছোট সবুজ ফুলগুলি গোছা বেধে থাকে। মার্চ হতে মে মাসে গাছে ফুল ফোটে। হল্‌দেটে সবুজ ফলগুলি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। নভেম্বর হতে ফল পাকে। ভেষজ গুণ সম্পন্ন ফলের জন্যই অনেকে এর চাষ করে থাকেন।

এর কাঠ লালচে রঙের, বেশ শক্ত। তবে সহজে ফেটে যায়। প্রক্রিয়াজাত করার পর নির্মাণ কার্য্য, আসবাব ও কৃষির যন্ত্রপাতি তৈরীতে এর ব্যবহার হয়। ফল, পাতা ও বাকলে ট্যানিন রয়েছে। এজন্য অনেক সময় চামড়া ট্যান কারার জন্য এদের ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় এর ফল পাতা ইত্যাদি অন্য বস্তুর সহযোগে রঙ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। শুকনো ফল চুলের শ্যাম্পু তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। কালি ও চুলের কলপ তৈরীতেও এর ব্যবহার রয়েছে। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে গণেশ পূজার জন্য এর পাতা ব্যবহৃত হয়। ফল টাটকা বা আচার ইত্যাদি হিসাবে খাওয়া যায়। এর ভেষজগুণও প্রচুর। লিভার টনিক হিসাবে এর ব্যবহার রয়েছে। ফল ও পাতা মৃদু বিরেচক। জণ্ডিস, হজমের গোলমাল, সর্দি, কাশি রক্তাল্পতাতে উহা উপকারী। আয়ুর্বেদিক ঔষধ চ্যাবনপ্রাশের একটি প্রধান উপকরণ আমলকী।

সাধারণতঃ বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা হয়। তবে অধিকাংশ বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা থাকে না। পাকা ফল রোদে রেখে দিলে, তা শুকিয়ে ফেটে বীজ বের হয়ে আসে। ঐ বীজ মার্চ মাস পর্যন্ত লাগিয়ে তাতে প্রথম দিকে কিছুদিন জলসেচ দিতে হয়। চারা প্রথম অবস্থায় দ্রুত বাড়ে, একটু বড় হলে গাছের বৃদ্ধির হার অনেক কমে যায়। ■

জিয়াপুত

Putranjiva roxburghii Wall

সমার্থক নাম ঃ ***Dryptes roxburghii***

গোত্র ঃ **Euphorbiaceae**

অন্যনাম ঃ পুত্রঞ্জীব

বৈজ্ঞানিক নামের প্রথম শব্দটি এসেছে ভারতীয় ভাষা হতে। কথিত আছে সন্ন্যাসী প্রদত্ত এই গাছের বীজ হতে মৃতপুত্র জীবন লাভ করেছিল। নামের দ্বিতীয় শব্দটি এসেছে ভারতীয়

উদ্ভিদবিদ্যার জনক ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের প্রথম সুপারিনটেন্‌ডেন্ট উইলিয়াম রক্সাবার্গের নাম হতে।

এই গাছটি হিমালয়ের নিম্নভূমি হতে আরম্ভ করে ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মাঝারি আকারের এই বৃক্ষটি দেখতে বেশ সুন্দর ছড়ানো ডালপালা ও চিরসবুজ পাতার জন্য বিভিন্ন স্থানে ছায়াতরু হিসাবে একে পথের ধারে লাগানো হয়। আগরতলা শহরে টাউন হলের সামনে ও সার্কিট হাউসের কাছে এই গাছ রয়েছে।

লম্বায় গাছটি ২০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। বাকল কালচে ধূসর রঙের। ছোট ছোট পাতাগুলি গাঢ় সবুজ রঙের। ঝুলন্ত ডালের দুপাশে সাজানো। পাতার কিনারা একটু ঢেউ খেলানো। কচিপাতা হাল্কা সবুজ, পরে তা কালচে সবুজ রঙের হয়। গাছ একলিঙ্গ। ফল সাদাটে বা সবুজাভ, প্রায় ২ সেমি লম্বা, ডিম্বাকার। প্রতি ফলে একটি শক্ত বীজ থাকে। মার্চ হতে মে মাসে গাছে ফুল ফোটে।

অনেকে আবার বিশ্বাস করেন যে, এই গাছের বীজ শিশুদের অপদেবতার নজর হতে বাঁচাতে পারে এজন্য অনেকে এর বীজ শিশুদের গলায় ঝুলিয়ে দেন। অনেক সন্ন্যাসী বা ফকির এই বীজের মালা পরে থাকেন।

এই গাছের কিছু ভেষজ গুণ রয়েছে। এর পাতা ও ফল জ্বর নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। বীজ হতে পাওয়া তেল জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাতা কখনো পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কাঠ ধূসর রঙের, বেশ শক্ত। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির হাতল তৈরীর উপযুক্ত। ছায়াতরু হিসাবে রাস্তার ধারে লাগালে রোদের প্রখর তাপ হতে পথচারীকে রক্ষা করবে। ■

রেড়ী

Ricinus communis L.

গোত্র ঃ Euphorbiaceae

অন্যনাম ঃ ভেরণ / এরণ্ড

গণসূচক Ricinus শব্দটি রেড়ী বীজের প্রাচীন নাম হতে নেওয়া। প্রজাতি সূচক শব্দের অর্থ সাধারণ।

আফ্রিকা, মহাদেশ এই গাছটির আদি বাসস্থান। বর্তমানে পৃথিবীর উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অনেক দেশে এর চাষ হয়ে থাকে। ভারতের অনেক রজ্যে বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, উড়িষ্যা ও কর্ণাটকে এর প্রচুর চাষ হয়ে থাকে, ত্রিপুরায় এর চাষ হয় না তবে বুনো অবস্থায় এই গাছ অনেক রয়েছে।

নরম কাণ্ডবিশিষ্ট গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। এই প্রবাদ হয়তঃ অনেকেই জানেন " যে দেশে বৃক্ষ নাই, সেখানে এরণ্ডও বৃক্ষ"। এর কাণ্ডটি ফাঁপা। সাধারণতঃ গাছের আগার দিক হতে বড় পাতাগুলি বের হয়। পাতার বোঁটা ফলক হতে ছোট। ফলকের প্রান্ত গভীর ভাবে খাঁজ কাটা এবং বৃন্তটি ফলকের প্রায় মাঝখানে লাগানো।

রেড়ী সহবাসী উদ্ভিদ, স্ত্রী ও পুং ফুল একই স্তবকে সাজানো থাকে। সাধারণতঃ পুরুষ ফুলগুলি নীচের দিকে এবং স্ত্রী ফুলগুলি উপরের দিকে দেখা যায়। স্ত্রী ফুলের ডিম্বক তিনটি খাঁজ বিশিষ্ট এবং প্রতি খাঁজে একটি করে বীজ থাকে।

ফল তিন খোপবিশিষ্ট ক্যাপসুল। ফলত্বক পাতলা নরম কাঁটা যুক্ত। বীজ বেশ বড় ও চক্‌চকে।

এই গাছের বীজ হতে পাওয়া তেল বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমানে এই তেলের উৎপাদন বছরে প্রায় পাঁচ লক্ষ টনের কাছাকাছি। বেড়ী তেল উৎপাদনে ব্রাজিলের পরই ভারতের স্থান।

রেচক পদার্থ হিসাবে ঔষধ তৈরীতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়া সাবান, মোম, চুলে মাখার তেল ও অন্য প্রসাধন সামগ্রী তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে। প্লাস্টিক তৈরীর ও ইহা একটি উপাদান। খৈল সার ও পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তেল ছাড়া এ গাছের অন্য অংশও ভেষজ গুণযুক্ত, বাকল ফোঁড়ায় পুলটিশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং বাতে ও এরা উপকারী। গাছের বিভিন্ন অংশ দাঁতের ব্যথার উপশম করে।

গরু এই গাছের পাতা খেতে ভালোবাসে এবং এতে নাকি এদের দুধের পরিমাণ বাড়ে।

কাঠ নরম, এজন্য জ্বালানী ছাড়া অন্য বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয় না। পাতা রেশম কীটের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আসামে এরি সিল্ক উৎপাদনের জন্য গুটি পোকার খাদ্য হিসেবে বেড়ীর চাষ হয়ে থাকে।

বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য আজকাল বেড়ীর কয়েকটি উন্নত জাত পাওয়া যায়। উপযুক্ত বাজার সৃষ্টি করতে পারলে বেড়ীর চাষ অন্য তেল বীজের চাষের তুলনায় লাভজনক। ■

চুন্দুল

Trewia nudiflora L.

গোত্র ঃ **Euphorbiaceae**

অন্যনাম ঃ পিঠালী

Trewia শব্দটি এসেছে জার্মান চিকিৎসক C. J. Trew-র নাম অনুসারে। nudiflora অর্থ নগ্ন বা রোমহীন ফুল।

ভারতের আর্দ্র উষ্ণ অঞ্চলের আদিবাসী এই বৃক্ষ ত্রিপুরার কোন কোন অঞ্চলে রয়েছে। জলের কাছাকাছি নীচু অঞ্চল এদের প্রিয়। আগরতলার ইন্দ্রনগরে কাটাখালের পাড়ে কয়েকটি পিঠালী গাছ রয়েছে।

বৃক্ষজাতীয় এই গাছটির আকার বেশী বড় হয় না এজন্য সাধারণতঃ নজর কাড়ে না। বড় বৃন্তযুক্ত হাল্কা পাতাগুলি শাখার উপর বিপরীতভাবে সাজানো। শীতের সময় ডিসেম্বরের শেষ বা জানুয়ারীতে গাছ পত্রশূন্য হয়ে পড়ে। পুং ও স্ত্রী পুষ্প আলাদা গাছে জন্মায়। পুং পুষ্পগুলি ক্যাটকিনের মত মঞ্জুরী বিন্যাসে ঝুলতে থাকে। এই ফুলে কেবল হলদে পুংকেশর থাকে। স্ত্রী পুষ্পগুলি সবুজ রঙের, পাপড়ি বিহীন, লম্বা বোঁটার আগায় এককভাবে থাকে। ফুল আসার সময় গাছে নূতন পাতা গজায়। ফলগুলি মাংসল, টেনিস বলের মত বড়। ফলে একটি শক্ত বীজ থাকে।

অক্টোবর হতে ডিসেম্বরে ফল পাকে। পাকা ফল মিষ্টি, খাদ্যোপযোগী হলেও

খুব কম লোক এই ফল খায়। কাঠ সাদা, নরম। ড্রাম ও কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে। এর কিছু ভেষজ গুণ রয়েছে। শেকড় বাতে উপকারী, কাণ্ড শীতল ও টনিক গুণ সম্পন্ন। ফুল আসার আগে এই গাছকে গামাইর গাছের মত মনে হয়। তবে গামাইর আকারে অনেক বড়।

তেমন প্রয়োজনীয় না হওয়ায় এর বংশবৃদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ বীজ হতে বংশবৃদ্ধি হয়। ■

মাকরী শাল

Schima wallictici (Dc.) Korthals

গোত্র ঃ **Theaceae**

এই গাছটির বাসভূমি পূর্ব হিমালয় হতে আরম্ভ করে সুমাত্রা পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্বভারত, নেপাল, বার্মা, চীন প্রভৃতি স্থানে এর দেখা পাওয়া যায়। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন বনাঞ্চলে এই গাছ রয়েছে।

বড় বৃক্ষ জাতীয় গাছ। এর ডালপালা উপরের দিকে অনেকটা ছড়িয়ে থাকে। গাছের বাকল বাদামী ধূসর হতে কাল্চে রঙের এবং তাতে অনেক লম্বা ফাটল দেখা যায়। কচি ডালপালা সিল্কের মত রোমে ঢাকা এবং তাতে অনেক লেন্টিসেল থাকে। পাতা আয়তাকার বা ভল্লাকার। অগ্রভাগ সূচালো। চর্মবৎ, পাতার নীচের দিকে সিল্কের মত রোম দেখা যায়। সুগন্ধি সাদা ফুলগুলি পাতার কক্ষে এককভাবে জন্মায়। ফল গোলাকার, ক্যাপসুল জাতীয়। বৃতিগুলি ফলে লেগে থাকে। বীজ পক্ষল, মে মাসে গাছে ফুল হয়। জুলাই হতে জানুয়ারী ফলের সময়। মাকরীশালের কাঠ বেশ মূল্যবান। নানা প্রকার আসবাবপত্র

নির্মাণ, পেন্সিল তৈরী এবং প্লাইউড শিল্পে এর ব্যবহার রয়েছে।

গাছের বাকল ভেষজগুণযুক্ত। উহা উত্তেজক ও ক্রিমিনাশক। ■

গর্জন

Dipterocarpus turbinatus Gacrtn F.

গোত্র ঃ Dipterocarpaceae

ভারতের আসাম ও আন্দামান এই গাছের বাসভূমি। বহিঃভারতে বাংলাদেশে চট্টগ্রাম, বার্মা, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে এ গাছ রয়েছে। বেশ লম্বা বৃক্ষজাতীয় গাছ। বনভূমির উচ্চশির মহীরুহ। গাছের গুড়ির নীচের দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে কোন ডালপালা দেখা যায় না। লম্বায় প্রায় পঞ্চাশ মিটার, এবং গুড়ির বেড় প্রায় পাঁচ মিটার হয়ে থাকে। বাকল বাদামী রঙের। লম্বা ফাটল যুক্ত। পাতা বেশ বড় আকারের। ১২-৩০ সে. মি. × ৬-১৪ সে.মি.। ডিম্বাকৃতি বা ভল্লাকার ডিম্বাকৃতি। চর্মবৎ, রোমহীন, পাতার গোড়ার দিক গোলাকার বা সামান্য তাম্বুলাকার। ফুল পাতার কক্ষে ৩-৭টি ফুল যুক্ত স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে জন্মায়। নীচের দিকে ফুলে অনেক সময় ছোট বোঁটা দেখা যায়। ফল ৩-৪ সে.মি. লম্বা অনেকটা ডিম্বাকৃতি। ফলে দুটি ১২-১৮ সে.মি. লম্বা পাখা থাকে। এপ্রিল মে ফলের সময়।

এই গাছের কাঠ মোটামোটি শক্ত। বিভিন্ন কাজে এর ব্যবহার রয়েছে। নানা প্রকার নির্মাণ কাজ ও প্লাইউড শিল্পে এর বেশ চাহিদা রয়েছে।

এই গাছ হতে পাওয়া অলিও রেজিন ক্ষত, দাদ প্রভৃতিতে উপকারী। ইহা মুত্র বিবির্ধক। গনোরিয়া ও অন্যান্য রোগে এর ব্যবহার দেখা যায়। গর্জন হতে পাওয়া ধূনা ওগর্জন তেল বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। ■

শাল

Shorea robusta Gaertn .f.

গোত্র ঃ **Dipterocarpaceae**

হিমালয়ের গাড়োয়াল হতে আরম্ভ করে আসাম অঞ্চল পর্যন্ত শালের বাসভূমি। ভারতবর্ষে উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, আসাম, মেঘালয়, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে শালের চাষ হয়ে থাকে। ভারতে প্রায় ১.২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার শালবাগান রয়েছে। ত্রিপুরার সদর, সোনামুড়া ও উদয়পুর মহকুমায় অনেক শালবাগান রয়েছে। জল নিকাশের সুবিধাযুক্ত বেলে দোঁয়াশ মাটিতে এই গাছ ভাল জন্মায়।

সুবিশাল কালের প্রহরী এই শাল পর্ণমোচী বৃক্ষ জাতীয় গাছ। এই গাছ প্রায় ১৮-৩০ মিটার লম্বা এবং গুঁড়ি প্রায় দুই মিটার মোটা হয়। পর্ণমোচী হলেও একেবারে পত্রশূন্য অবস্থায় গাছটি খুব কম দিনই থাকে। বাকল গাঢ় বাদামী রঙের এবং এতে মাঝে মাঝে লম্বা ফাটল দেখা যায়। কচি পাতা লাল বা গোলাপী রঙের। ক্রমশঃ তা হাল্কা সবুজে পরিণত হয়। ঝরার আগে পাতা মলিন হলুদ রঙ ধারণ করে। শুকনো পাতা বাদামী রঙের। পাতার আকার ১০-৩০ সে.মি.× ৫-১৮ সে.মি.। ডিম্বাকৃতি বা আয়তাকার, চর্মবৎ, রোমহীন। পাতার গোড়ার দিক গোলাকার বা তাম্বুলাকার।

ফেব্রুয়ারীর শেষদিকে গাছে ফুল আসে। ফুল ছোট। প্রায় বৃন্তহীন। পাতার কক্ষে বা ডালার আগায় প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে ফুল সাজানো থাকে। ফল মার্চ - এপ্রিলে দেখা যায়। ফুলের সময় মনোরম সাদা রঙে শালবন ভরে উঠে। ডিম্বাকৃতি ফলে পাঁচটি পাখা থাকে এবং পাখাগুলি অসমান। মে মাসের মধ্যে ফল বড় হয়ে যায় তবে এই সময়ের কালবৈশাখী সহ ঝড় বৃষ্টি অধিকাংশ ফল নষ্ট করে। ফল পাকতে ২-২.৫ মাস সময় লাগে। সাধারণতঃ গাছের বয়স দশ বৎসর হলে ফল উৎপাদন শুরু হয়। শাল কাঠ বেশ দামী। রেললাইনে, খুঁটির কাজে, খাট, চেয়ার, টেবিল, দরজা ইত্যাদি জিনিস তৈরীতে মূলতঃ এর ব্যবহার হয়। শালপাতা খাবার পরিবেশনে ব্যবহৃত হয়। শাল গাছ হতে অলিওরেজিন নামে এক ধরনের লাক্ষা উৎপন্ন হয় যা রাসায়নিক কাজে ব্যবহৃত হয়। এই শুকনো লাক্ষা হতে ৪১-৬৮ শতাংশ তেল পাওয়া যায়। এই তেল ধূপ ধূনা প্রভৃতি সুগন্ধযুক্ত দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়।

শাল বীজ হতে সবুজ রঙের তেল পাওয়া যায়। গত তিন দশক ধরে বিভিন্ন কারখানায় বিশেষ করে মিষ্টি বা চকোলেট ইত্যাদি প্রস্তুতে এর চাহিদা ক্রমশঃ বাড়ছে। গ্লিসারিন, অ্যাসিড তৈরী, সাবান তৈরীর কারখানায় এই তেল ব্যবহৃত হচ্ছে। শালবীজ খইল গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই খইলে যে শর্করা থাকে তা ঔষধের কারখানায় বড়ি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। শালবীজ খইলে অল্প পরিমাণ ট্যানিন থাকে যা চামড়ার কারখানায় ব্যবহার করা হয়।

ভেষজগুণ হিসেবে শাল রজন কষায়। পেটের অসুখে এর ব্যবহার রয়েছে। এছাড়া হজমের ক্ষমতা বাড়ানো ও গনোরিয়া রোগে উহা উপকারী।

গত কয়েক দশক আগে যখন শালবীজ হতে শতকরা ১২-১৪ ভাগ তেল পাওয়ার কথা জানা গেল এবং বিভিন্ন শিল্পে এর ব্যবহারের সম্ভাবনা দেখা গেল তখন থেকেই এই গাছ তেল বীজ ফসল হিসাবে বিভিন্ন অঞ্চলে চাষ করা শুরু হয়েছে। ত্রিপুরার জলবায়ু শাল গাছের উপযোগী হওয়ায় এরাজ্যেও শালের চাষ বাড়িয়ে তার বীজ সংগ্রহ ও তেল উৎপাদনের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। ■

সুলতান চাঁপা

Callophyllum inophyllum L.

গোত্র ঃ Guttiferae

অন্যনাম ঃ পুন্নাগ
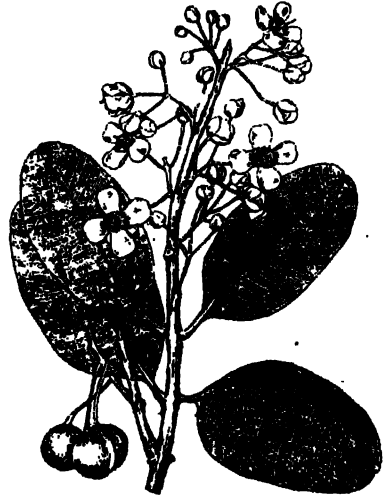
গণ সূচক শব্দের অর্থ সুন্দর পাতা। প্রজাতি সূচক শব্দের অর্থ দৃঢ় শিরাযুক্ত পাতা। এই গাছের পাতার শিরাবিন্যাস একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ দ্বিবীজপত্রী গাছের পাতার শিরাবিন্যাস জালিকাকার। কিন্তু এই গাছটি দ্বি-বীজপত্রী হলেও এর শিরাবিন্যাস সমান্তরাল। মধ্য শিরার উপর উপশিরাগুলি সমান্তরালভাবে সাজানো।

এই সুন্দর বৃক্ষটি ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের আদিবাসী। ভারত ছাড়া বার্মা, মালয় ও অষ্ট্রেলিয়ায় এই গাছ পাওয়া যায়। ভারতের দক্ষিণে শ্রীলংকা ও পূর্ব

আফ্রিকার দ্বীপসমূহে এই গাছ জন্মায়। উপকূলীয় ও শুকনো বালুকাময় তটভূমিতে যেখানে অন্য গাছ কম জন্মায় সেখানে এগাছ বহাল তবিয়তে জন্মায়। বোম্বাই হতে রত্নগিরি পর্যন্ত এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এ গাছ প্রচুর রয়েছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে রাস্তার ধারে লাগানো অবস্থায় এই গাছ দেখা যায়। ত্রিপুরায় এই গাছ বেশী নাই। আগরতলায় বনমালীপুর অঞ্চলে দু একটি গাছ রয়েছে।

এই গাছের পাতা বেশ সুন্দর। রঙ গাঢ় চক্চকে সবুজ। সাদা ফুলগুলি বেশ সুগন্ধ যুক্ত। পাতা বিপরীতভাবে বিন্যস্ত। বেশ চওড়া, উপবৃত্তাকার, পাতার কিনারা কিছুটা পিছনের দিকে বাঁকানো। ফুলগুলি সুগন্ধযুক্ত, রেশিম পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। বৃত্তাংশগুলি প্রায় গোলাকার। পুং কেশরগুলি কয়েকটি গোছায় ছড়ানো পাপড়ির মাঝে থাকে। ফল গোলাকার, প্রথমে সবুজ পরে হলদে রঙের হয়। ফলত্বক মসৃণ।

শোভাবর্দ্ধক বৃক্ষ হিসাবে প্রধানতঃ এর চাষ করা হয়। বীজ হতে পাওয়া তেল জ্বালানী তেল রূপে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া এর ভেষজগুণও রয়েছে। বাত ও ক্ষতে মালিশ হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে। বাকলের রস তীব্র রেচকগুণ যুক্ত। কাঠ বেশ শক্ত। জাহাজ তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে।

বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। বিভিন্ন রাস্তার ধারে এই সুন্দর গাছটি লাগানো যেতে পারে। ■

কাউ

Garcinia cowa Roxb.

গোত্র : Guttiferae

গণসূচক শব্দটি এসেছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে বসবাসকারী উদ্ভিদবিদ লরেন্স গারসিনের নাম অনুসারে। প্রজাতিসূচক শব্দটি ভারতীয় ভাষা হতে নেওয়া হয়েছে।

এই গাছটি পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী। ভারতের বাইরে বার্মা, থাইল্যাণ্ড, চীন ও বাংলাদেশের চট্টগ্রামে এই গাছ পাওয়া যায়। ত্রিপুরার রাঙ্গামুড়া ও জম্পুই অঞ্চলে এই গাছ রয়েছে। সাধারণতঃ চিরহরিৎ বনাঞ্চলের অধিবাসী।

লম্বা বৃক্ষজাতীয় গাছ। বাকল গাঢ় ধূসর রঙের। গাছের গুড়ি হতে শাখাগুলি নীচের দিকে ঝুলে থাকে। অনেক সময় শাখাগুলির আগা মাটিতে এসে পড়ে। পাতা আকারে ছোট, চক্চকে সূচাগ্র। পাতার উপর প্রায়ই একটা লাল্চে আভা দেখা যায়।

ফুল হল্‌দে বা হল্‌দেটে লাল রঙের, এরা গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় ডালার আগার দিকে থাকে। পুং ও স্ত্রী পুষ্প আলাদা। পুং পুষ্প আকাবে ছোট হয় এবং এরা এক গোছায় অনেকগুলি করে থাকে। ফল হল্‌দে বা লাল্‌চে রঙের বেরী জাতীয়। অনেক সময় কমলার মত বড় হয়। ডিসেম্বর - ফেব্রুয়ারীতে গাছে ফুল হয়। ফেব্রুয়ারী হতে জুলাই ফলের সময়। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, আমের পর জাম, জামের পর কাউ, কাউয়ের পর ফাউ। অর্থাৎ কিনা কাউ গরমের সময়ের শেষের দিকের ফল।

এর গাছ হতে এক প্রকার রজন পাওয়া যায়। যা হল্‌দে বার্নিশ তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। এর ঔষধি গুণও রয়েছে। ফল খাদ্যোপযোগী তবে বেশ টক।

বার্মায় এই গাছের বাকল হতে এক প্রকার হল্‌দে রঙ বের করা হয়, যা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাপড় রাঙানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

কাঠ মোটামোটি শক্ত তবে খুব ভারী। কিন্তু তাড়াতাড়ি পচে যায় বলে বিশেষ ভলো কাজে ব্যবহৃত হয় না। ■

তমাল

Garicinia xanthochymos Hook .f.ex T. Anders

গোত্র ঃ Guttiferae

অন্যনাম ঃ ডেমফল

এই গাছটির আদি বাসস্থান পূর্ব হিমালয়, আন্দামান, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাডু কেরালা, ভারতের বাইরে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, বার্মা, চীন, থাইল্যাণ্ড ও মালয়ে এই গাছ জন্মায়। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ রয়েছে।

মাঝারি আকারের বৃক্ষ, ডালপালা নীচের দিকে ঝুলে থাকে। বাকল কাল্‌চে

ধূসর রঙের। পাতা কুড়ি থেকে চল্লিশ সেমি. লম্বা, পাঁচ থেকে দশ সেমি. চওড়া, সরু আয়তাকার বা ভল্লাকৃতি আয়তাকার, পত্র বিন্যাস বিপরীত। সাদা ফুলগুলি গুচ্ছাকারে পাতার কক্ষে জন্মায়। ফল প্রায় গোলাকার বেরী জাতীয়। হল্‌দে রঙের। প্রতি ফলে এক থেকে চারটি বীজ থাকে। ফেব্রুয়ারী হতে এপ্রিলে গাছে ফুল হয়। ফলের সময় এপ্রিল হতে জুন।

তমাল গাছের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধের কাহিনী হয়ত অনেকে জানেন। ফল খাদ্যোপযোগী। কাঁচা ফলের রস কাপড় রাঙানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। ফল ঔষধিগুণ যুক্ত। টনিক, শক্তি বর্দ্ধক, ত্রিদোষ নাশক এবং হৃদরোগে উপকারী। ■

নাগেশ্বর

Mesua ferrea L.

গোত্র : **Guttiferae**

অন্যনাম : নাগকেশর

এশিয়ার উষ্ণমণ্ডলের অধিবাসী এই গাছটি ভারত, বার্মা, শ্রীলংকা, ইন্দোচীন ও মালয়ে পাওয়া যায়। ভারতের পূর্ব হিমালয়, আসাম, আন্দামান, কেরালা, কর্ণাটক, মধ্য প্রদেশ ও পশ্চিমঘাট পর্বতের চিরসবুজ বনভূমিতে এই গাছ জন্মায়। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ রয়েছে। আগরতলার বিভিন্ন স্থানে যেমন জেল রোড ও কলেজটিলায় বেশ কয়েকটি গাছ রয়েছে।

মাঝারি আকারের এই বৃক্ষটির গুড়ি সোজা। বাকল মসৃণ ও ছাই রঙের। পাতা কচি অবস্থায় গাড় লাল রঙের থাকে, পরে কাল্‌চে সবুজ রঙের হয়। শিরা অস্পষ্ট।

ফুল আকারে বড় ও সুগন্ধযুক্ত। সাদা ফুলগুলি একক বা জোড়া বাঁধা অবস্থায় ডালার আগায় থাকে। মে মাসে ফুল ফোটে। শহর অঞ্চলে এই সুগন্ধি ফুলের লোভে প্রতিদিন বহু লোক এই গাছের তলায় জড় হয়। প্রতিটি ফুলের মাঝখানে একগোছা হল্‌দে পুংকেশর থাকে। ফল গোলাকার। প্রতি ফলে ২-৩ টি বীজ থাকে।

এর কাঠ বেশ শক্ত। আসবাব ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতির হাতল তৈরীর কাজে এর ব্যবহার রয়েছে। বীজে ৪৫ শতাংশ তেল পাওয়া যায়। আসাম ও কেরালায় বাণিজ্যিকভাবে বীজ হতে তেল সংগ্রহ করা হয়। পরিশোধিত তেল সাবান ও অন্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

সার হিসেবে খইল ব্যবহৃত হয়।

এই গাছের ভেষজগুণও রয়েছে এবং বিভিন্ন রোগে এর ব্যবহার রয়েছে। বাকল ঘর্মকারক, ফুল কষায়, অগ্নিবর্দ্ধক। কাশি ও অর্শের রক্তপাতে এর ব্যবহার রয়েছে।

বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

বোতল ব্রাস

Callistemon linearis DC.

গোত্র ঃ Myrtaceae

গণ সূচক নামের উৎপত্তি দুটি গ্রীক শব্দ হতে। "Kallos" অর্থ সৌন্দর্য্য এবং "Stemon" অর্থ পুংকেশর। অর্থাৎ এই গাছের পুংকেশরই তাদের ফুলের সৌন্দর্যের আকর। প্রজাতি সূচক শব্দে পাতার আকৃতি বুঝায়।

এই গাছটি অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী। বর্তমানে ভারত সহ বিভিন্ন দেশে এর চাষ হয়ে থাকে। ত্রিপুরাতে এই গাছ রয়েছে। আগরতলার বিভিন্ন স্থানে এর দেখা পাওয়া যায়। মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের সামনের বাগানে একটি বোতল ব্রাস গাছ রয়েছে, যা বছরে বেশ কয়েকবার সুন্দর লাল ফুলে ফুলে ভরে ওঠে।

ছোট চির সবুজ বৃক্ষজাতীয় গাছ। ডালপালা নীচের দিকে ঝুলে থাকে। বাকল লম্বালম্বিভাবে ফাটল যুক্ত। সরু, মসৃণ, চর্মবৎ পাতাগুলি ডালার অগ্রভাগ জুড়ে থাকে।

লাল সুন্দর ফুল হতে অনেকগুলি লম্বা পুংকেশর বের হয়ে বাইরের দিকে ছড়িয়ে থাকে। ফুলগুলি ডালার আগায় এমনভাবে সাজানো যে ফুলসহ ডালাকে বোতল পরিষ্কার করার ব্রাসের মত মনে হয়। এজন্যই গাছের এরূপ নামকরণ হয়েছে। পুষ্পদণ্ডের আগার দিকে পাতা দেখা যায়। ফল ছোট পেয়ালার আকৃতি বিশিষ্ট, ক্যাপসুল জাতীয়

এবং তাতে অনেক বীজ থাকে । কচি পাতায় অনেক সময় লালচে আভা দেখা যায়।

কাঠ বেশ শক্ত, তবে বিশেষ কোন কাজে ব্যবহারের কথা জানা যায় না।

এই সুন্দর গাছটি শোভাবর্দ্ধক উদ্ভিদ হিসেবে বাগান, পার্ক ইত্যাদিতে লাগানো যায়। ■

ইউক্যালিপটাস

Eucalyptus citriodora Hook

সমার্থক নাম ঃ *E.maculata* var. *citrodora*.

গোত্র ঃ Myrtaceae

গণ সূচক শব্দটি এসেছে দুটি গ্রীক শব্দ হতে, "eut" অর্থ ভালভাবে, "Kaluptos" অর্থ ঢাকা। এদিয়ে পাপড়ি দিয়ে ভালোভাবে ঢাকা ফুলের উর্দ্ধাংশ বুঝায়। প্রজাতি সূচক শব্দে লেবুর গন্ধযুক্ত বুঝায়।

গাছটি অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ডের আদিবাসী। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এর চাষ হয়। ত্রিপুরাতেও বিভিন্ন স্থানে এই গাছ লাগানো হয়েছে। আগরতলার কলেজটিলায় এবং কুঞ্জবনের বেসিক ট্রেনিং কলেজ চত্বরে কয়েকটি বড় আকারের গাছ রয়েছে।

দীর্ঘ সুন্দর গুঁড়ি বিশিষ্ট এই বৃক্ষটির কাণ্ড সরল ও মসৃণ এবং উপরের দিকে ক্রমশঃ সরু। বাকল মলিন ধূসর রঙের। গরমের সময় টুকরো টুকরো বাকল গাছ হতে খসে পড়ে। গাছে শাখা প্রশাখা কম থাকে এবং ছোট ছোট ডালাগুলি নীচের দিকে ঝুলে থাকে । পাতা ঘসলে তা হতে লেবুর গন্ধ বের হয়। কচি পাতা ও পাতার বোঁটা অনেকসময় লাল্চে গোলাপী রঙের হয়।

ছোট ছোট সাদা ফুলগুলি গুচ্ছবদ্ধভাবে ছোট পত্রহীন শাখায় জন্মায়। ফল প্রায় গোলাকার বেরী জাতীয়। প্রতি ফলে অনেক বীজ থাকে। লম্বা এই গাছটি অন্যান্য বৃক্ষ হতে একটু আলাদা ধরনের। দূর হতেও একে চেনা যায়। পার্ক ইত্যাদিতে কয়েকটা গাছ একসঙ্গে লাগলে তার সৌন্দর্য্য বাড়ে। গাছটি বেশ দ্রুত বর্দ্ধনশীল।

চার বছরে প্রায় দশ মিটার লম্বা হয়।

কাঠ শক্ত, ওজনে ভারী, কম সংকোচনশীল, উঁই পোকার আক্রমণ অনেকটা প্রতিরোধ করতে পারে। জাহাজ তৈরী, রেলের কোচ তৈরী, যন্ত্রপাতির হাতল ও অন্যান্য কাজে এর ব্যবহার রয়েছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় অনেকদিন হতে জ্বালানী কাঠ হিসাবে এর ব্যবহার হয়ে আসছে। এ হতে ভাল কাঠকয়লা পাওয়া যায়। ব্রাজিলে স্টীল উৎপাদনে এই কাঠকয়লার প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়।

পাতা হতে লেবুর গন্ধযুক্ত উদ্বায়ী তেল পাওয়া যায়। প্রসাধন শিল্পে এই তেলের ব্যবহার রয়েছে। কেনিয়ার মৌমাছি পালকরা এই গাছ বেশ পছন্দ করেন কারণ এর ফুল হতে ভাল জাতের প্রচুর মধু পাওয়া যায়।

পর্তুগাল ও উত্তর আফ্রিকায় শোভাবর্দ্ধক উদ্ভিদ হিসেবে এই গাছ লাগানো হয়।

বংশবৃদ্ধির জন্য নার্সারীতে চারা তৈরী করে পরে সেই চারা লাগানো হয়। জিম্বাবোয়েতে বীজ হতে সরাসরি এর চাষ করা হয়। তবে বীজ বোনার আগে মাটির উপরের আগাছা ইত্যাদি পুড়িয়ে, ছাই মেশানো মাটিতে বীজ বোনা হয়। গাছের ডাল সহজে ভেঙ্গে যায় বলে বাড়ীঘরের কাছে এই গাছ না লাগানোই ভাল। ■

পেয়ারা

Psidium guavava L.

সমার্থক নাম ঃ *P.pyriformis/ P. pomiferum.*

গোত্র ঃ Myrtaceae

অন্য নাম ঃ গয়াম

গণসূচক শব্দটি এসেছে সম্ভবতঃ গ্রীক শব্দ "Sidion" হতে । প্রজাতি সূচক শব্দটি এসেছে এই গাছের পর্তুগীজ নাম হতে ।

এই গাছটি ব্রাজিলের আদিবাসী। বর্তমানে উষ্ণমণ্ডলের প্রায় সব দেশে এর চাষ হয়। ভারতের সর্বত্র এই গাছ জন্মায়। ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বত্র এই গাছ পাওয়া যায়।

ছোট বৃক্ষ বা বড় গুল্ম জাতীয় গাছ। বাকল হাল্‌কা ধূসর রঙের এবং ছোট ছোট বাকলের টুকরা গাছ হতে খসে পড়ে। পাতা গাঢ় সবুজ, প্রতিমুখ পত্রবিন্যাসে সাজানো।

পাতার নীচের দিক মসৃণ রোমে ঢাকা। শিরাগুলি বেশ স্পষ্ট। কচি ডালা চতুষ্কোণ। সাদা ফুলগুলি এককভাবে বা প্রতি গোছায় ২/৩ টি করে থাকে। গোত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী

প্রতি ফুলে অসংখ্য পুংকেশর থাকে। ফল গোলাকার বা ন্যাসপাতি আকৃতির। পাকা ফলের রঙ হল্‌দেটে। ফলের মধ্যে সাদা বা গোলাপী রঙের শাঁসে অনেক ছোট ছোট বীজ থাকে।

গ্রীষ্মের সময় গাছে ফুল আসে। বর্ষার প্রথমদিকে ফল পাকতে আরম্ভ করে। বিভিন্ন জাতের পেয়ারায় ফলের আকার ও স্বাদে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। প্রধান দুটি জাত হলো *Psidium guayava* var. *pyriferum* এবং *P. guayava* var *pomiferum*। প্রথম জাতের ফল ন্যাসপাতি আকারের এবং গাছে ফুল এককভাবে জন্মায়। দ্বিতীয় জাতের ফল গোলাকার এবং ফুল প্রতি গোছায় ২/৩ টি করে জন্মায়। এই দুই জাতের বিভিন্ন উপজাতে ফলের শাঁসের রঙে, বীজের আকারে বিভিন্নতা রয়েছে।

খাদ্যোপযোগী ফলের জন্যই পেয়ারার চাষ করা হয়। এছাড়া জেলী প্রস্তুতে এই ফলের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে।

কাঠ বেশ শক্ত। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির হাতল তৈরীতে এবং খোদাই কাজে এর ব্যবহার রয়েছে। পাতা ও বাকল রঞ্জন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন সময় ট্যানিং-এ বাকলের ব্যবহার দেখা যায়। ভেষজগুণ হিসেবে পাতা ও বাকল পেটের পীড়ায় উপকারী, ক্ষত নিরাময়েও পাতার ব্যবহার রয়েছে। পাতা চিবালে দাঁতের ব্যাথা উপশম হয়।

বীজ বা গুটি কলম হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। লাগানোর দু-চার বছরের মধ্যে গাছে ফল হয়। সাধারণতঃ সাত আট বছরের বেশী গাছ বাঁচে না।

Psidium গণ ভুক্ত অন্য একটি প্রজাতি *P guineensis* বন পেয়ারা। এই রাজ্যে পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য যে, এই গাছটি ভারতের অন্য কোথাও আর জন্মায়না। এমনিতে গাছটি ঝোপের মত হলেও না কাটলে ছোট বৃক্ষে পরিণত হয়। ফল খাদ্যোপযোগী, আকারে ছোট, টক মিষ্টি। আগরতলার কলেজটিলায় এ গাছ একসময় প্রচুর পাওয়া যেত, এখন প্রায় অবলুপ্তির পথে। ■
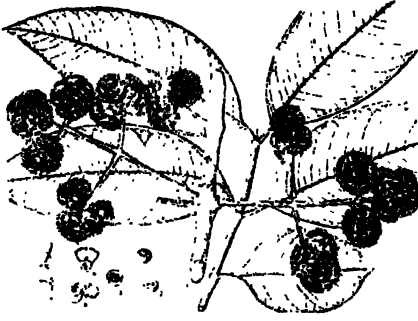
বটী জাম

Syzygium cerasoides (Roxb.) Chatterjee etKanjilal .f.

সমার্থক নাম ঃ ***S. operculatum / Eugenia operculata***

গোত্র ঃ Myrtaceae

ভারতের উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এই গাছের বাসস্থান। ভারতের বাইরে বাংলাদেশ, বার্মা ও মালয়ে এই গাছ পাওয়া যায়। ত্রিপুরা রাজ্যের চিরসবুজ বনাঞ্চলে সর্বত্র এই গাছ রয়েছে।

ছোট বা মাঝারি আকারের চির সবুজ বৃক্ষ, বাকল হাল্কা বাদামী বা ধূসর সাদা রঙের। পাতা ৮-১০ সে.মি. × ৪-১০ সে.মি., উপবৃত্তাকার বা ডিম্বাকার। রোমহীন। ফুলগুলি শাখার পত্রশূন্য পর্বে প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে সাজানো থাকে। ফল গোলাকার বেরী জাতীয়, এপ্রিল হতে জুলাই মাস ফুল ও ফলের সময়।

এই গাছের ফল খাদ্যোপযোগী। কাঠ বিভিন্ন আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

ভেষজ গুণ হিসেবে বাকলের নির্যাস মালিশে গ্রন্থিবাতে উপকার হয়। এর ফলও বাতে উপকারী। পাতার সেক বাতের বেদনা উপশম করে। ■

জাম

Syzygium cumini (L) Skeels

সমার্থক নাম ঃ ***S. jambolana / Eugenia jambolana***

গোত্র ঃ Myrtaceae

অন্য নাম ঃ কাল জাম

গণসূচক শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ "suzugos" হতে, যার অর্থ যুগ্ম। এ দিয়ে জোড়ায় জোড়ায় থাকা পাতা বুঝায়। প্রজাতিসূচক শব্দটি এই গাছের পর্তুগীজ নামের ল্যাটিন রূপান্তর।
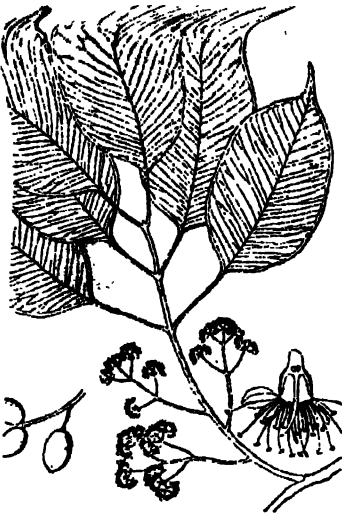
ভারতের এই গাছটি আমাদের দেশের খুব শুষ্ক অঞ্চল ছাড়া প্রায় সর্বত্র জন্মায়। ভারতের বাইরে শ্রীলংকা, বার্মা, মালয় ও বাংলাদেশে এই গাছ পাওয়া যায়। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সুপরিচিত এই বৃক্ষটি রয়েছে।

পর্ণমোচী এই বৃক্ষটি আকারে বেশ বড় হয়। এই বৃক্ষটির গুড়ি মোটামুটি লম্বা। ছড়িয়ে থাকা ডালপালা ও পাতা নিয়ে গাছটির উপরের অংশ বেশ বড় চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করে। বাকল মসৃণ, হাল্‌কা ধূসর রঙের। পাতা প্রতিমুখ পত্র বিন্যাসে সাজানো। শিরা বিন্যাস উপপ্রান্তীয়, ঈষৎ স্বচ্ছ গ্রন্থিযুক্ত যা আলোর বিপরীত দিকে ধরলে পরিষ্কার দেখা যায়। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে গাছের পাতা ঝরে যায়।

গ্রীষ্মে গাছে ফুল আসে। সুগন্ধী ছোট ছোট সাদা রঙের ফুলগুলি পাতার নীচে গোছা বেঁধে সাজানো থাকে। মার্চ হতে মে ফুল ফোটার সময়। জুন-জুলাই ফলের সময়। পাকা ফল প্রথমে গোলাপী পরে কাল রঙের হয়। প্রতি ফলে একটি বীজ রসালো শাঁসে ঢাকা থাকে।

বিভিন্ন জাতের জামে পাতা ও ফলের আকারের বেশ পার্থক্য দেখা যায়। ভাল জাতের ফল আকারে বড় ও বেশ রসালো হয়। আবার কোন কোন জাতের ফল আকারে ছোট ও বীজ সর্বস্ব। খাদ্য হিসেবে ফলের বহুল ব্যবহার রয়েছে। কোন কোন স্থানে ফলের রস হতে একপ্রকার পানীয় প্রস্তুত করা হয়।

জামের কাঠ বেশ শক্ত। গ্রাম দেশে দরজা জানালা তৈরী, বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরী ও অন্য অনেক কাজে এর ব্যবহার হয়।

রঙ করা ও ট্যানিং-এর কাজে বাকলের ব্যবহার রয়েছে। ভেষজগুণ হিসেবে বাকল কষায়। গলক্ষত, ব্রঙ্কাইটিস, পেটের পীড়া, হাঁপানী প্রভৃতিতে ইহা উপকারী।

ফল টনিক গুণযুক্ত। দাঁত ও মাড়িকে শক্ত করে। বীজ বহুমূত্র রোগে উপকারী। ফলেরও একই গুণ রয়েছে।

ভারতের কোন কোন অঞ্চলে গণেশ বা বিনায়কের পূজায় এর পাতা ও ফল ব্যবহৃত হয়। এই গাছ নাকি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সম্ভবতঃ কাল ফলের জন্য এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা এই গাছকে পবিত্র মনে করেন এবং তাদের মন্দির

প্রাঙ্গণে এই গাছ লাগানো হয়।

তসর পোকার পালনে এর পাতা ব্যবহৃত হয়।

সাধারণতঃ বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা হয়। চারা অবস্থায় এই গাছ একটু আস্তে বাড়ে, পরে বৃদ্ধির হার বেশ দ্রুত হয়। ৪-৬ বছরে গাছে ফল হয়। ■
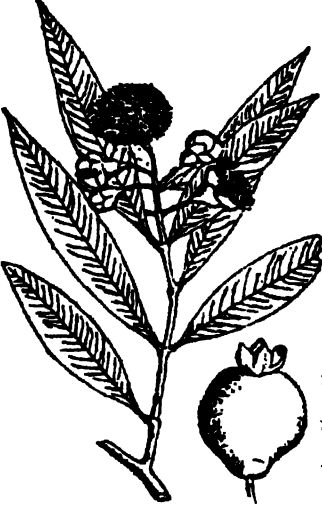
গোলাপ জাম

Syzygium jambos (L.) Alston.

সমার্থক নাম ঃ ***Egunia jambos / Jambous vulgaris***

গোত্র ঃ **Myrtaceae**

নামের প্রজাতি সূচক শব্দটি এসেছে মালয় দেশীয় শব্দ হতে। সমার্থক নামের গণসূচক শব্দটি এসেছে সপ্তদশ শতাব্দীর উদ্ভিদ প্রেমী স্যাভয়ের রাজকুমার ইউগিনির নাম অনুসারে।

এই বৃক্ষটির আদি বাসস্থান মালয় ও বার্মা দেশ। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এর চাষ হয়। কোথাও কোথাও বুনো অবস্থায়ও এই গাছ জন্মায়। ত্রিপুরায় বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ রয়েছে। আগরতলার ইন্দ্রনগরে এবং লেম্বুছড়ায় বেশ কিছু গোলাপজাম গাছ রয়েছে।

চিরসবুজ ছোট মাঝারি আকারের বৃক্ষ জাতীয় গাছ। বাকল ধূসর রঙের। পাতা সরু, অগ্রভাগ ছুঁচালো। চক্চকে পাতাগুলি প্রতিমুখ পত্রবিন্যাসে সাজানো। সাদা বড় বড় ফুলগুলি ছোট ছোট গোছায় শাখার আগায় জন্মায়। ফুলের অসংখ্য লম্বা পুংকেশর সহজে নজর কাড়ে। ছোট আপেলের আকৃতির চক্চকে ফলগুলি অনেকটা সবুজাভ সাদা রঙের হয়ে থাকে। ফলের মধ্যে একটি মাত্র গোলাকার বীজ থাকে। তবে এতে জামের মত বীজের গায়ে ফলের শাঁস লেগে থাকে না।

মার্চ-এপ্রিলে গাছে ফুল আসে এবং বর্ষায় ফল পাকে। কোন কোন জাতে মার্চেও ফল পাকতে দেখা যায়। সুস্বাদু ফলের জন্যই সাধারণতঃ এই গাছ লাগানো হয়। তবে ফল বেশী রসালো নয়।

ভেষজগুণ হিসাবে ফল মস্তিষ্কের টনিক হিসেবে ও প্লীহা রোগে উপকারী। গাছের বাকল হাঁপানী ও ব্রংকাইটিসে বায়ুনালীর প্রদাহে উপকারী। পাতার নির্যাস চক্ষু প্রদাহ উপশম করে।

কাঠ বাদামী রঙের, নরম। বিশেষ কোন কাজে ব্যবহৃত হয় না। বীজ বা দাবাকলম হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ৪ বছরের মধ্যে নূতন গাছে ফল ধরে। ■
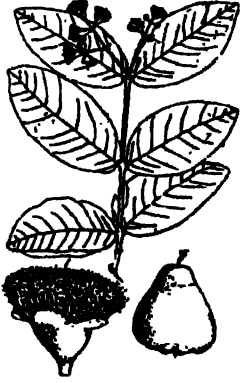
জামরুল

Syzygium samarangense (Bl.) Merr & Perry

সমার্থক নাম ঃ *Eugenia javonica / E. alba*

গোত্র ঃ Myrtaceae

এই বৃক্ষটি আন্দামান নিকোবর ও মালাক্কার আদিবাসী। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে এর চাষ হয়। ত্রিপুরা রাজ্যেও এই গাছ রয়েছে। মে- জুন মাসে আগরতলার বিভিন্ন বাজারে স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন এর ফল বিক্রি হতে দেখা যায়। কলেজটিলায় সরকারী আবাসে থাকাকালীন বাসার চত্বরে একটি জামরুল গাছ লাগিয়েছিলাম এবং এর ফলও খেয়েছি। ঐ আবাস ছেড়ে চলে আসার পর ঐ ফলন্ত গাছটি কেটে ফেলা হয়েছে।

মাঝারি আকারের বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। গাছের গুড়ি বেশী লম্বা হয় না। বাকল ধূসর রঙের, একটু খসখসে। অনেক ডালপালা হওয়ায় গাছকে বড় ঝোপের মত দেখায়। পাতা বেশ বড়, লম্বাটে সরু। প্রায় বৃন্তহীন, প্রতিমুখ পত্রবিন্যাসে সাজানো। পাতার মাঝে ছোট ছোট গোছায় সাদাটে ফুলগুলি জন্মায়। গোলাপজামের মত এই গাছের ফুলেও অনেক পুংকেশর থাকে।

মোমের মত সাদাটে চকচকে ফলগুলি প্রচুর সংখ্যায় জন্মায়। ফলের আকারের সঙ্গে নেসপাতির আকারের কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। তবে ফলের নীচের দিকটা চ্যাপ্টা আকারের এবং তাতে স্থায়ী বৃত্যাংশগুলি লেগে থাকে।

শোভাবর্দ্ধনকারী বৃক্ষ হিসেবে বা ফলের জন্য এই গাছ লাগানো হয়ে থাকে, ফল রসালো তবে অনেকটা স্বাদহীন। মার্চ-এপ্রিলে গাছে ফুল হয়। মে-জুনে ফল পাকে।

বীজ বা দাবা কলম হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ৩/৪ বছরে নূতন গাছে ফল আসে।

হিজল

Barringtonia acutangula (L.) Gaertn

গোত্র ঃ Lecythidaceae

গণসূচক শব্দটি এসেছে ইংরেজ প্রাকৃতিবিদ ডি ব্যারিংটনের নাম হতে। প্রজাতি সূচক শব্দে সূক্ষ্মকোণ বোঝায়, ফলের আকার বুঝাতে এই নাম দেওয়া হয়েছে।

এই বৃক্ষটির আদি বাসস্থান ভারত, মালয় ও অষ্ট্রেলিয়া। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার দক্ষিণাংশে অনেক স্থানে এই গাছ পাওয়া যায়। ত্রিপুরা রাজ্যে আগরতলার অভয়নগরে এই গাছ রয়েছে। ছয়ের দশকেও চিত্তরঞ্জন রোড হতে শান্তিপাড়ায় ঢোকার মুখে একটি হিজল গাছ দেখেছি। যা বর্তমানে আর নেই।
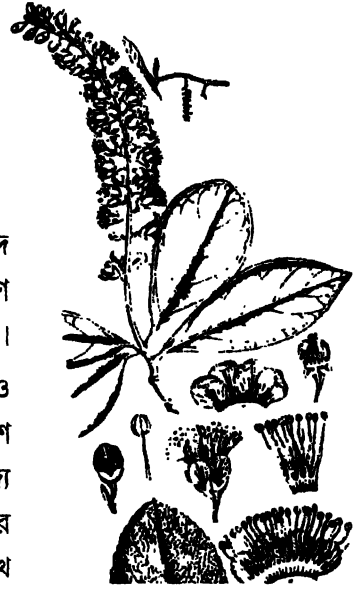
মাঝারি আকারের চির সবুজ বৃক্ষ। ডালপালা ছড়ানো। বাকল খসখসে, গাঢ় বাদামী রঙের। পাতা মসৃণ, আগার দিক বেশ চওড়া, বোটার দিকে ক্রমশঃ সরু। ডালার আগার দিকে পাতাগুলি গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় থাকে। পাতার কিনারা সূক্ষ্মভাবে দন্তুর।

ছোট ছোট লাল্‌চে বা গোলাপী রঙের ফুলগুলি স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। পুষ্পগুচ্ছগুলি ডালার আগা হতে ঝুলতে থাকে। প্রতি ফুলে অসংখ্য পুংকেশর দেখা যায়। ফলের মধ্যাংশ সবচেয়ে চওড়া, চতুষ্কোণ যুক্ত। কিনারা গোলাকার। প্রতি ফলে একটি বীজ থাকে। কাঠ সাদা, চকচকে, নরম, তবে দীর্ঘস্থায়ী, নৌকা তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে। রূপকথার কাহিনীতে হিজলকাঠের নৌকার কথা অনেকেই হয়ত পড়েছেন। নৌকা ছাড়াও গরুর গাড়ী, বিভিন্ন আসবাবপত্র এবং রেলের কামরার ভেতরের অংশ তৈরীতে এই কাঠ ব্যবহৃত হয়। মাটির নীচে থাকলে এই কাঠের রঙ কাল হয়ে যায়।

ফল তিক্ত, কষায়। শূলবেদনা ও সর্দ্দি প্রভৃতিতে উপকারী। মূল কুইনানের মত ভেষজগুণ বিশিষ্ট বলে মনে করা হয়। পাতার রস পেটের পীড়ায় উপকারী।

বাকল ট্যানিং-এ ব্যবহৃত হয়। এই গাছের থেতলানো পাতা জলে ছড়িয়ে দিলে নাকি মাছ নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং সহজে ধরা পড়ে। এপ্রিল-মে মাসে গাছে ফুল ফোটে। তখন গাছকে বেশ সুন্দর দেখায়। শোভাবর্দ্ধক উদ্ভিদ হিসেবে রাস্তার ধারেও এ গাছ লাগানো যেতে পারে। বুনো অবস্থায় নদী নালা প্রভৃতির ধারে এ গাছ জন্মায়। ■

কুমীরা

Careya arborea Roxb.

গোত্র ঃ Lecythidaceae

অন্য নাম ঃ কুম্ভী

গণ সূচক শব্দটি এসেছে ভারতের রয়েল এগ্রি হর্টিকালচারেল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা রেভারেণ্ড উইলিয়াম কেরীর নাম অনুসারে। arbore অর্থ বৃক্ষ জাতীয়।

ভারতের আদিবাসী এই বৃক্ষটি আমাদের দেশে উষ্ণমণ্ডলের আর্দ্র বনভূমি বা উপত্যকা অঞ্চলে জন্মায়। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানের বনভূমিতে এই গাছ রয়েছে। আগরতলা শহরের আশেপাশেও এই গাছ দেখা যায়। ইন্দ্রনগর আই টি আই চত্বরে কয়েকটি কুমীরা গাছ রয়েছে।

এই লম্বা দৃঢ় বৃক্ষটির বাকল বেশ পুরু, গাঢ় ধূসর রঙের। মাঝে মাঝে বাকলের লম্বা চিলতে উঠে যায়। বাকলের ভেতরের দিক লালচে রঙের। বড় আকারের সরল পাতাগুলি ডালার আগার দিকে থকে। পাতা ক্রমশঃ বোঁটার দিকে সরু। বোঁটা ছোট।

আগায় বড় আকারের গোলাপী ও সাদা রঙের ফুলগুলি গোছায় সাজানো থাকে। ফুলের বৃতি অনেকটা ঘন্টাকৃতি। গোলাপী বা লালচে রঙের পুং কেশরগুলি কয়েকটি বৃত্তে সাজানো এবং তারা গোড়ার দিকে যুক্ত। ফুল ফোটার পর পুংকেশর মণ্ডলটি মাটিতে ঝড়ে পড়ে। ঝরা ফুলে গাছের তলার মাটি ঢাকা পড়ে যায়। ফল সবুজ রঙের। অনেকটা আপেলের মত।

ফলের মাংসল শাঁসে অনেকগুলি বীজ থাকে। শীতের শেষের দিকে গাছের পাতাগুলি ঝরে যায়। অনেক সময় ফেব্রুয়ারীর শেষ বা মার্চেও গাছে কিছু পাতা থাকে। ঝরার আগে পাতার রঙ লাল বা কমলা হয়ে যায়। পত্রহীন গাছে ফুল ফুটতে আরম্ভ করে। ফুলের একটা বিশ্রী গন্ধ রয়েছে। যা অনেক মাছিকে আকৃষ্ট করে। তবে পাখীই পরাগায়ণে সাহায্য করে। জুলাই পর্যন্ত ফল পাকে।

কাঠ শক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী। কৃষির যন্ত্রপাতি, গরুর গাড়ী, আসবাবপত্র, ঘরের খুটি

প্রভৃতি কাজের উপযোগী। জলের নীচে এই কাঠ দীর্ঘস্থায়ী হয়।

গাছের বাকল ট্যানিং-এ ব্যবহৃত হয়। বাকল হতে মোটা দড়ি তৈরী করা যায়। ভারতের কোন কোন স্থানে এই বাকল হতে কাপড় বোনা হয়। পাতা তসর পোকার খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বার্মাতে চুরুট তৈরীতে এই পাতার ব্যবহার রয়েছে। এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য হতে বিড়ি বাঁধার জন্য প্রচুর কুমীরা পাতা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চালান যেত এবং তা হতে রাজস্ব হিসেবে বনবিভাগের কয়েক লক্ষ টাকা আয় হত।

সাঁওতালরা এবং পাঞ্জাবের অধিবাসীরা এর ফল খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। তবে এর বীজ বিষাক্ত।

এই গাছের ফল ও বাকল ভেষজ গুণযুক্ত এবং বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে এদের ব্যবহার রয়েছে। ফুল ভেজানো জলে এক প্রকার আঠালো পদার্থ পাওয়া যায় যা সর্দি কাশিতে উপকারী। টাটকা বাকল সাপের কামড়ে উপকারী। অনেক সময় মাছ মারার জন্য এই গাছের বাকল, পাতা ও মূল জলাশয়ে দেওয়া হয়। বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

নাগলিঙ্গম

Couropita guianensis Abul

গোত্র ঃ **Lecythidaceae**

অন্য নাম ঃ অনন্তশয্যা / তোপ গোলা

নামের প্রথম শব্দটি এই গাছের আদিবাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকার স্থানীয় ভাষা হতে এসেছে। প্রজাতি সূচক শব্দটির অর্থ গুয়ানার অধিবাসী। দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণমণ্ডলের আদিবাসী এই বৃক্ষটি ভারতের উষ্ণমণ্ডলের আর্দ্রভূমিতে পাওয়া যায়। ভারত ছাড়া শ্রীলঙ্কায়ও এই গাছ জন্মে। বোম্বাই ও ব্যাঙ্গালোরে এই প্রজাতির কিছু সুন্দর গাছ রয়েছে।

ত্রিপুরায় এই গাছ খুব বেশী নেই। আগরতলার মহিলা কলেজ চত্বরে, রাজবাড়ীর চত্বরে কয়েকটি গাছ রয়েছে। এছাড়া ৮/১০ বছর আগে বড়মুড়ার বনকুমারীতে আসাম - আগরতলা রোডের পাশে একটি ছোট গাছ দেখেছি। চির সবুজ লম্বা নরম কাঠের এই

বৃক্ষটির গুড়ি বেশ সরল। বাকল বাদামী ধূসর। সরু ছুঁচালো আগার পাতাগুলি ছোট ছোট ডালার আগার দিকে থাকে। পাতা বোঁটার দিকে ক্রমশঃ সরু। এই গাছের একটি বিশেষত্ব হল এর ফুলগুলি ছোট পত্রশূন্য ডালায় গাছের গুড়ির নীচের দিকে জন্মায়, ফুলের পাপড়িগুলি মাংসল, অবতল। এর বাইরের দিক সাদাটে হলদে আর ভেতরের দিক গাঢ় গোলাপী বা লাল রঙের। পুংকেশরগুলি যুক্ত হয়ে একটা সাপের ফণার মত আকৃতি বিশিষ্ট হয় এবং তা গর্ভাশয় ও গর্ভমুণ্ডকে ঢেকে রাখে। পুংকেশরের এই বিশেষ আকৃতির জন্য বোধ হয় একে অনন্ত শয্যা বলে।

ফল বেশ বড় আকারের, গোলাকার, শক্ত, বাদামী রঙের। ফলগুলি গাছের গুড়ির গায়ে ঝুলতে থাকে। ফল পাকতে প্রায় এক বছর সময় নেয়। এই গোল শক্ত ফলের জন্য এই গাছের ইংরেজী নাম Cannon ball tree যা হতে বাংলা নাম হয়েছে তোপ গোলা গাছ। গুয়ানার আধিবাসীরা পাকা ফল পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। বনের বাঁদরও এই ফল খায়।

বছরে কয়েক বার সম্পূর্ণ গাছের পাতা ঝরে যায় এবং পাতা ঝরার ১০/১২ দিনের মধ্যে নূতন পাতা গজায়। গ্রীষ্মকালে গাছে ফুল ফোটে।

দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীরা এই ফলের শক্ত খোসা বাসনপত্র হিসাবে ব্যবহার করে এবং ফলের শাঁস হতে উত্তেজক পানীয় তৈরী করে। সেখানে এই গাছের কাঠ নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে আমাদের দেশে এর কাঠ বেশ নরম হয় এবং বিশ্রী গন্ধ থাকায় বিশেষ কোন কাজে ব্যবহার করা হয় না। সুন্দর ফুল ও ফলের জন্য শোভাবর্দ্ধনকারী উদ্ভিদ হিসেবে বাগান বা পার্কে লাগানো যেতে পারে।

আর্দ্র আবহাওয়ায় গাছ ভালই জন্মায়। বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

রামডালা

Duabanga grandiflora (Roxb. ex Dc.) Walp

সমার্থক নাম : *Duabanga sonneratioides*

গোত্র : Sonneratiaceae

অন্য নাম : বন্দ্রাফুল্লা

গণসূচক Duabanga নামটি দিয়েছেন ফ্রান্সিস হ্যামিলটন এবং এই শব্দটি ত্রিপুরী

ভাষা হতে নেওয়া। প্রসঙ্গতঃ ত্রিপুরী ভাষার শব্দ হতে গাছের বৈজ্ঞানিক নামকরণের এটিই বোধ হয় একমাত্র উদাহরণ। প্রজাতি সূচক শব্দের অর্থ বড় ফুল যুক্ত,যাতে এই গাছের ফুলের বড় আকারের কথা বুঝায়। সমার্থক নামের প্রজাতি সূচক শব্দের অর্থ এই গোত্রের অন্তর্গত অন্য একটি গাছ sonneratia-র মত।

বৃক্ষটির আদি বাসস্থান পূর্ব হিমালয়ের দক্ষিণাংশ হতে আসাম, বার্মা, আন্দামান, মালয় পর্যন্ত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এক হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত এই গাছ দেখা যায়। হিমালয়ের নিম্নবর্তী উপত্যকা অঞ্চলে বিভিন্ন নদীর ধারে একে বেশী দেখা যায়। দ্রুত বর্দ্ধনশীল হওয়ায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই গাছ বর্তমানে লাগানো হয়েছে। ত্রিপুরার বনাঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় একটু আলগা মাটিতে এই গাছ জন্মায়। শিবপুরে ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে ১৮০১ সালে এই গাছটির প্রথম চাষ করা হয়, ঐ গাছের উত্তর পুরুষেরা এখনো ঐ উদ্ভিদ উদ্যানে রয়েছে।

লম্বা পর্ণমোচী বৃক্ষজাতীয় গাছ। দ্রুত বর্দ্ধনশীল এই গাছটির কাণ্ড ঋজু এবং হাল্‌কা বাদামী রঙের। কাণ্ডের চারদিক হতে শাখা প্রশাখা বের হয়ে অনুভূমিকভাবে ছড়িয়ে থাকে। কচি ডালা চতুষ্কোণ, মসৃণ, রোমহীন। সরল আয়তাকার পাতাগুলি বিপরীতভাবে বিন্যস্ত। কচি পাতা লাল রঙের। সাধারণতঃ পাতার উপরের দিক চক্‌চকে গাঢ় সবুজ রঙের, নীচের দিকের রঙ হাল্‌কা সবুজ।

পাতার অক্ষে বা শাখার আগায় পুষ্পগুচ্ছ জন্মায়। ফুল সাদা রঙের এবং এর একটা বিশ্রি গন্ধ রয়েছে। ফল অনেকটা গোলাকার, চর্মবৎ ক্যাপসুল জাতীয়। ভারী ঘন্টাকৃতি বৃতিগুলি ফলের গায়ে লেগে থাকে। ফলের আকার ছোট কমলার মত। প্রতি ফলে অনেক বীজ হয়।

কাঠ নরম, সাদা রঙের নানা প্রকার হাল্‌কা কাজের উপযোগী। চায়ের বাক্স, দেশলাইর কাঠি প্রভৃতি প্রস্তুতে এর ব্যবহার রয়েছে। দ্রুত বর্দ্ধনশীল হওয়ায় স্বল্প সময়ের মধ্যে বনায়নের জন্য একে ব্যবহার করা যায়।

বীজ হতে সহজে বংশবৃদ্ধি করা যায়। তবে প্রথম চারা তৈরী করে বর্ষার শুরুতে চারা লাগালে ভাল ফল পাওয়া যায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, পাঁচ বছরে গাছটি আট মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। ■

চাকোয়া

Anogeissus acuminata **Wall**

সমার্থক নাম ঃ *Concarpos acuminata*

গোত্র ঃ Combretaceae

গণ সূচক শব্দটি এসেছে দুটি গ্রীক শব্দ হতে "ano" অর্থ উপরে, "geisson" ছাদের ছাঁইচ, দুয়ে মিলে গাছের চেহারার ইঙ্গিত দেয় যাতে লম্বা গুঁড়ির আগায় ঝুলন্ত ডালপালা বিশিষ্ট্য চন্দ্রাতপ বুঝায়। প্রজাতি সূচক শব্দের অর্থ লম্বা ছুঁচালো, এদিয়ে পাতার আকার বুঝায়।

Anogeissus গণভুক্ত অধিকাংশ প্রজাতি ভারতের আদিবাসী। তবে এই গাছটির আদি বাসস্থান বার্মার টেগু ও টেনাস্যেরিণ অঞ্চলে। এছাড়া বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামেও এই গাছ জন্মায়। ভারতের মহানদী উপত্যকা ও উত্তর সার্কাসে এই গাছ পাওয়া যায়। ত্রিপুরার ধর্মনগর ও লালজুরিতে এর দেখা পাওয়া যায়। এই চির সবুজ বৃক্ষটি বেশ লম্বা হয়। বাঁকানো গুঁড়ি হতে উপরে অনেক দোলায়মান ডালাপালা গজায়। বাকল গাঢ় ধূসর রঙের। পাতা আকারে ছোট। ছুঁচালো আগাযুক্ত পাতাগুলি ছোট ছোট বোঁটায় ডালার আগায় ছড়ানো থাকে। কচি ডালপালা, ফুলের বোঁটা ও পাতার নীচের দিক নরম রোমে ঢাকা। কিন্তু পাতার উপরের দিক রোমশূন্য।

হল্‌দেটে সাদা রঙের ছোট ছোট ফুলগুলি ছোট আকারের মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। ফলগুলি গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় থাকে। ফল পক্ষল এবং প্রতি ফলে একটি করে বীজ দেখা যায়। কাঠ বেশ শক্ত, স্থিতিস্থাপক। বিভিন্ন নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা যায়, তবে আর্দ্র আবহাওয়ায় কাঠ দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

শোভাবর্দ্ধক উদ্ভিদ হিসেবে কোথাও কোথাও এ গাছ লাগানো হয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারী -মার্চ মাসে গাছে ফুল হয়। ■

পিয়াশাল

Terminalia alata Heyne ex Roth. var.
tomentosa (Robx.) Parkinson

সমার্থক নাম ঃ ***T. tomentosa***

· গোত্র ঃ Combretaceae

উত্তর-পূর্ব ভারতের অধিকাংশ স্থানে এই গাছটি জন্মায়। হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে, পূর্ব পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, নেপাল, উত্তরবঙ্গ, আসামে এর বাসস্থান। ত্রিপুরা রাজ্যের সদর বিভাগে এই গাছ রয়েছে। আগরতলার কাছাকাছি আনন্দনগরে এই গাছ পাওয়া যায়।

বড় আকারের বৃক্ষ জাতীয় গাছ। এই গাছের গুড়ি ডালপালা শূন্য, বেশ লম্বা। কাণ্ডের উপরের দিকে ডালপালা ছড়ানো অবস্থায় থাকে। পাতা সরল, ঘন সন্নিবদ্ধ অবস্থায় ডালার আগার দিকে থাকে। পাতার আকার ১৫-৩০ সে.মি.। পত্রবিন্যাস বিপরীত। পাতা উপবৃত্তাকার হতে আয়ত ভল্লাকার। নীচের দিকে রোম থাকে। ফুল লম্বা যৌগিক স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে শাখার আগায় সাজানো থাকে। ফল ড্রুপ জাতীয়, পক্ষল। এপ্রিল হতে জুন মাসে গাছে নূতন পাতা বের হয়। এর পর ফুল ফোটে, শীতের সময় গাছে ফল দেখা যায়।

কাঠ বেশ মূল্যবান, গৃহ নির্মাণ ও জাহাজ তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে। ফুল কাপড় রঙ করার জন্য ও চামড়া ট্যান করতে ব্যবহৃত হয়।

ভেষজগুণ হিসেবে বাকলের নির্যাস কষায় এবং ক্ষতে বহিঃপ্রয়োগ করা হয়। এছাড়া পেটের পীড়ায়ও উহা উপকারী। হৃদরোগেও বাকলের ব্যবহার রয়েছে। ■

অর্জুন

Terminalia arjuna (Roxb.) Wight & Arn

গোত্র ঃ **Combretaceae**

নামের প্রথম শব্দটি এসেছে ল্যাটিন Terminalis শব্দ হতে যাতে গাছের ডালার আগা হাতে আসা ফুলের কথা বুঝায়। আর arjuna শব্দটি এসেছে আমাদের দেশীয় ভাষার অর্জুন নাম হতে।

মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী এই বৃক্ষ ভারতের সর্বত্র জন্মায়। এছাড়া বার্মা, শ্রীলংকা, বাংলাদেশেও এ গাছ পাওয়া যায়। ত্রিপুরা রাজ্যেও বিভিন্ন স্থানে অর্জুন গাছ রয়েছে। আগরতলার রাজভবনের উত্তরাংশে একটি বেশ বড় গাছ রয়েছে।

বেশ লম্বা আকারের বৃক্ষ। গাছের বাকল মসৃণ, সাদাটে বা গোলাপী ধূসর। পেয়ারা গাছের বাকলের মত এর বাকল পাতলা শল্কের মত ঝরে যায়। পাতা আয়তাকার, পত্রবিন্যাস বিপরীত।

হলদেটে সাদা ফুলগুলি লম্বা মঞ্জুরীদণ্ডে সাজানো থাকে। মার্চ হতে জুন পর্যন্ত ফুল ফোটে। ফুলের মধুর লোভে মৌমাছিরা গাছে ভিড় করে। ফল অনেকটা ডিম্বাকৃতি, পক্ষল। প্রতি ফলে ৫টি সরু পাখার মত উপবৃদ্ধি দেখা যায়। বীজ প্রতি ফলে একটি করে থাকে। পাকা ফল কাল্‌চে রঙের।

এর কাঠ বেশ শক্ত। নৌকা তৈরী, গৃহ নির্মাণ,গরুর গাড়ী তৈরী প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়। তাপমাত্রার তারতম্য সহ্য করতে না পারায় এবং সহজে উঁই দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় এর কাঠকে নিম্নমানের মনে করা হয়।

গাছের বাকল ট্যান করার কাজে ব্যবহৃত হয় এবং উহা ভেষজ গুণযুক্ত। হৃদরোগে এর ব্যবহার হয়। কষায়, টনিক ও শীতল গুণযুক্ত হওয়ায় ছড়ে যাওয়া, হাড় ভাঙ্গা,ক্ষত প্রভৃতিতে এর ব্যবহার রয়েছে। পাতার টাটকা রস কানের ব্যথায় উপকারী। পাতা অনেক সময় তসর কীটের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ছায়া তরু হিসাবে একে রাস্তার পাশে লাগানো যেতে পারে।

বীজ হতে সহজে বংশবৃদ্ধি করা যায়। বীজতলায় চারা করে এক বছর বয়সের

চারা অন্যত্র রোপণ করা যায়। একটু ভিজে মাটিতে গাছ ভালভাবে বাড়ে। ত্রিপুরা রাজ্যেও কোন কোন স্থানে এই গাছটি লাগানো হয়েছে। ■

বহেড়া

Terminallia belirica (Gaertn) Roxb.

গোত্র ঃ **Combretaceae**

অন্যনাম ঃ বয়ড়া

Terminalia-র অর্থ ডালের আগা হতে আসা পাতার গোছা, bellirica শব্দটি এই গাছের আরবী নামের ল্যাটিন রূপান্তর।

ভারতের আদিবাসী এই বৃক্ষ খুব শুষ্ক অঞ্চল ছাড়া ১০০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। মিশ্র পর্ণমোচী অরণ্যে এই গাছ বেশী জন্মায়। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে বনে এই গাছ রয়েছে। আগরতলা শহরে কলেজটিলা, ইন্দ্রনগর প্রভৃতি স্থানে দু একটা গাছ রয়েছে। উমাকান্ত একাডেমির সামনে বেশ বড় একটি বহেড়া গাছ ছিল, অল্প কিছু দিন আগে সামান্য ঝড় বৃষ্টিতে গাছটি পড়ে যায়।

এই লম্বা গাছটির বাকল অনেকটা বাদামী রঙের এবং তাতে অনেক লম্বা ফাটল থাকে। লম্বা বোটাযুক্ত বড় পাতাগুলির প্রকৃতি অনেকটা চামড়ার মত এবং এরা গোছা বেধে ডালের আগায় থাকে। পাতার মাঝ হতে পুষ্পমঞ্জুরী বের হয়। ফুল ছোট, হলদেটে সবুজ এবং মিষ্টি গন্ধ যুক্ত। শীতে গাছের পাতা ঝরে যাওয়ার পর মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত নূতন পাতা গজায়। এপ্রিল-মে মাসে গাছে ফুল আসে। ফল মখমলী ত্বক বিশিষ্ট, গোলাকার বা ডিম্বাকার এবং তাতে একটি করে বীজ থাকে। শীতে ফল পাকে।

কাঠ বেশ শক্ত। তবে দীর্ঘস্থায়ী নয়। সহজে বিভিন্ন পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। প্যাকিং বাক্স তৈরী ও অন্যান্য কাজে এই কাঠ ব্যবহৃত হয়। জলে ভিজিয়ে নিলে এই কাঠ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এজন্য অনেকে নৌকা তৈরীতে এই কাঠ ব্যবহার করেন।

এর ফলের বাণিজ্যিক মূল্য রয়েছে। ট্যানিং ও কালি তৈরীতে এর ব্যবহার হয়। বনের হরিণ এবং ছাগল ও ভেড়া এই ফল খায়। ফলের শাঁস মানুষের খাদ্য। পাতা

দুগ্ধবতী গাভীর উত্তম খাদ্য।

ফলে নানা ভেষজগুণ বর্তমান। চোখ, নাক, গলা, হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের রোগে এর ব্যবহার রয়েছে। ফল বদহজমী ও উদরাময়ে উপকারী। বীজ হতে তেল পাওয়া যায়। ছায়াতরু হিসাবে গাছটি চমৎকার। তবে কিছু লোকের কুসংস্কার রয়েছে যে, এই গাছের ছায়া বা ঘর-দোর তৈরীতে এর কাঠ ব্যবহার করা অশুভ সূচক।

বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

হরিতকী

Terminalia chebula Retz

গোত্র ঃ Combretaceae

অন্য নাম ঃ হর্তুকী

প্রজাতি সূচক শব্দটি মালয় দেশীয় ভাষা হতে এসেছে। এই ভারতীয় গাছটি খুব আর্দ্র অঞ্চল ছাড়া প্রায় সর্বত্র জন্মায়। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে বুনো অবস্থায় এই গাছ জন্মায়, আবার কোথাও এই গাছ লাগানো হয়। আগরতলায় কলেজটিলা, যোগেন্দ্রনগর, বনমালীপুর প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি গাছ রয়েছে।

পর্ণমোচী এই বৃক্ষটির বাকল বেশ পুরু এবং গাঢ় বাদামী রঙের এবং তাতে লম্বা ফাটল দেখা যায়। সূঁচালো আগার, ছোট বোঁটার পাতাগুলি বিপরীতভাবে ডালে সাজানো থাকে। ছোট হলদেটে সাদা ফুলের সরল মঞ্জুরী ডালের আগায় এককভাবে বা গুচ্ছাকারে সাজানো। ফল ড্রুপ জাতীয়, অনেকটা ন্যাসপাতি আকারের, তবে এতে ৫টি শিরা রয়েছে। শুকনো ফলে শিরাগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। প্রতি ফলে একটি করে বীজ থাকে।

ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত গাছের পাতা ঝরে যায়। এপ্রিলে গাছে নূতন পাতা আসে। এপ্রিল হতে আগষ্ট পর্যন্ত গাছে ফুল হয়। নভেম্বর হতে ফল পাকে।

হরিতকী বাণিজ্যিকভাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ট্যানিং-এ ব্যবহারের জন্য আমাদের দেশ হতে প্রতি বছর বহু হরিতকী রপ্তানী হয়। এর শাঁস বাদামের মত, খাদ্য হিসাবেও এর ব্যবহার রয়েছে। ফল হতে কালিও তৈরী হয়। পাতা, ডাল পশুখাদ্য।

এই গাছ মূল্যবান ভেষজ গুণবিশিষ্ট। হরিতকী, বহেড়া ও আমলকী একত্রে ত্রিফলা নামে পরিচিত। বিভিন্ন রোগে এদের ব্যবহার রয়েছে। কাঁচা ফল উদারাময়ে উপকারী। শুকনো ফল রেচকগুণ বিশিষ্ট। হাঁপানী গলক্ষত, রক্তাল্পতা, বাত, হৃদরোগ প্রভৃতিতে হরিতকীর ব্যবহার রয়েছে। হরিতকী ভিজানো জল চক্ষুপ্রদাহে উপকারী। তবে হরিতকীর বিভিন্ন জাত রয়েছে এবং তাদের মধ্যে ভেষজ গুণের তারতম্য দেখা যায়।

Terminalia গণভুক্ত অন্য একটি প্রজাতি *T. citrina* হরিতকী নামে পরিচিত। সদর মহকুমার আনন্দনগর অঞ্চলে এই গাছটি পাওয়া যায়। এই দুইটি প্রজাতির মধ্যে পাতার চেহারা ছাড়া অন্য বিষয়ে মিল রয়েছে। এর ফলও ভেষজগুণযুক্ত। এর কাঠ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। ইন্দ্রনগর আই টি আই চত্বরে এর একটি গাছ রয়েছে।

বীজ হতে সহজে হরিতকীর বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

চন্দন

Santalum album L.

সমার্থক নাম ঃ *Soririum myrtifilium*

গোত্র ঃ **Santalaceae**

অন্য নাম ঃ শ্বেত চন্দন

গণসূচক শব্দ এসেছে সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় ব্যবহৃত এই গাছের Sandel নামটি হতে। প্রজাতি সূচক শব্দের অর্থ সাদা।

এই বৃক্ষটি ভারতবর্ষের দক্ষিণ উপদ্বীপ অঞ্চলে বিশেষ করে এই অঞ্চলের দক্ষিণ অংশে বুনো গাছ হিসেবে জন্মায়। ভারতের অন্যান্য স্থানে এর চাষ করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যেও চন্দন গাছ রয়েছে। দুই দশকেরও বেশী সময় আগে ত্রিপুরা সরকারের বন বিভাগের মুখ্য বনাধিকারিকের অফিসে একটি বিশাল আকৃতির চন্দনের মূল দেখি। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে জম্পুই অঞ্চল হতে তা সংগ্রহ করা হয়েছে। বন বিভাগ এই গাছটির খোঁজ পেয়ে সেখানে পৌঁছার আগেই গাছের মাটির উপরের অংশ নাকি চুরী হয়ে যায়। এবং তারা মূলটি তুলে আগরতলায়

নিয়ে আসেন। বর্তমানে আগরতলার ইন্দ্রনগর ও কুঞ্জবন অঞ্চলে চন্দন গাছ রয়েছে।

মাঝারি আকারের চির সবুজ বৃক্ষ। ডালপালা নীচের দিকে ঝুলে থাকে। বাকল গাঢ় রঙের এবং তাতে লম্বা ফাটল দেখা যায়। পরিণত গাছের কাণ্ডে সুন্দর গন্ধ থাকে। পাতা ৪-৭ সেঃ মিঃ লম্বা, বিপরীতভাবে বিন্যস্ত।

পাতার উপরের দিক গাঢ় সবুজ ও চক্‌চকে। চন্দনের একটি বৈশিষ্ট্য যে চারা অবস্থায় পরজীবী রূপে এর জীবন আরম্ভ হয়। উপযুক্ত পোষক উদ্ভিদের মূল হতে চন্দন চারা শেকড়ের সাহায্যে পুষ্টি আহরণ করে। অবশ্য গাছ বড় হলে এরা স্বনির্ভর হয়ে যায়।

চন্দন কাঠের সুগন্ধ দীর্ঘ সময় বজায় থাকে। এই কাঠ দিয়ে নানা প্রকার শিল্প-সামগ্রী তৈরী হয়। কাঠের গুঁড়া ধূপকাঠি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। সার কাঠ হতে পাতন প্রক্রিয়ায় চন্দন তেল পাওয়া যায়, যা নানা প্রকার প্রসাধন সামগ্রী ও কীটনাশক প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

ফুল আকারে ছোট। হাল্কা বেগুনী রঙের। এরা ছোট ছোট গোছায় সাজানো থাকে। ফল ছোট, গোলাকার, মাংসল এবং কাল্‌চে বেগুনী রঙের।

ভেষজগুণ হিসাবে চন্দন তেল মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাশয়ের প্রদাহ, গনোরিয়া প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। পিত্তাশয়ের ক্ষয় রোগে ইহা উপকারী। জ্বরের সময় কপালে চন্দন প্রলেপের ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।

চন্দন বীজের তেল চর্মরোগে উপকারী। আমাদের দেশ হতে প্রতি বছর প্রচুর চন্দন কাঠ ও চন্দন তেল বিদেশে রপ্তানী হয়। ■

কুল

Ziziphus muritiana Lamk

সমার্থক নাম ঃ *Z. jujuba*

গোত্র ঃ Rhamnaceae

অন্য নাম ঃ বরই

গণসূচক শব্দটি আরবী ভাষা হতে নেওয়া হয়েছে। প্রজাতি সূচক jujuba শব্দটি মধ্যযুগীয় ল্যাটিন ভাষা হতে নেওয়া।
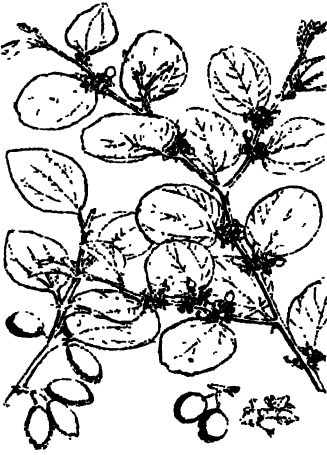
এই গাছটি ভারত ও মালয়ের আদিবাসী। ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র এর চাষ হয়ে থাকে।

মাঝারি বা ছোট আকারের বৃক্ষ জাতীয় গাছ। বাকল কাল রঙের এবং তাতে অনেক ফাটল থাকে। গাঢ় সবুজ রঙের ছোট ছোট পাতার ছাওয় গাছটিকে অনেকটা খোলা ছাতার মত দেখায়। পাতাগুলি বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। তবে সাধারণত পাতা লম্বার চেয়ে বেশী চওড়া। ছোট ডালার দুপাশে পাতাগুলি একান্তরভাবে সাজানো। প্রতি পাতার গোড়ায় প্রায়ই দুটি বা একটি বাঁকা কাঁটা থাকে। পাতার নীচের দিক সাদাটে বা লাল্‌চে রোমে ঢাকা।

সবুজাভ হলদে রঙের ছোট সুগন্ধি ফুলগুলি ছোট ছোট গোছায় পাতার গোড়ার দিকে জন্মায়। ফল মাংসল বেরী জাতীয়। প্রতি ফলে একটি বড় আকারের শক্ত বীজ থাকে। পাতা ফল লাল্‌চে বাদামী রঙের।

ফল খাদ্যোপযোগী। সাধারণ কুল টক হলেও মিষ্টি ফলেরও কিছু জাত রয়েছে। কাঁচা খাওয়া ছাড়াও আচার ইত্যাদি হিসাবে এর ফলের ব্যবহার রয়েছে।

গাছের বাকল ট্যানিং-এ ব্যবহৃত হয়। ব্রহ্মদেশে রেশম রঙ করার জন্য এই বাকল ব্যবহৃত হয়। পাতা ভাল পশু খাদ্য। রেশম কীটের খাদ্য হিসেবেও এর পাতার ব্যবহার রয়েছে।

কাঠ লাল্‌চে রঙের। বেশ শক্ত। কৃষির নানা যন্ত্রপাতি তৈরী, তাঁবুর খুঁটি প্রভৃতি নানা কাজে এই কাঠের ব্যবহার দেখা যায়।

গাছটি বেশ তাড়াতড়ি বাড়ে। শুক্‌নো পরিবেশের জন্য এটি একটি প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ।

এই গণভুক্ত অন্য একটি প্রজাতি Z. rugosa বনকুল বা বনবরই নামে পরিচিত। ছোট আকারের প্রায় পর্ণমোচী বৃক্ষ জাতীয় গাছ। কচি ডালা লালচে রোমে ঢাকা। বাকল গাঢ় ধূসর বা কাল রঙের। পাতা ৮-২০ সে.মি. x ৫-১৫ সে.মি.। উপ বলয়াকৃতি, ডিম্বাকার বা উপবৃত্তাকার। কিনারা ক্রকচ। পাতার উপরের দিকে কোন রোম থাকে না। কিন্তু নীচের দিকে লাল্‌চে রোম থাকে। পাতার কক্ষে বা ডালার আগায় প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে ছোট হল্‌দেটে সবুজ ফুলগুলি সাজানো থাকে। পাকা ফল সাদা। প্রতি ফলে একটি বীজ থাকে। ভেষজগুণ হিসাবে রজবাহুল্যে এই গাছের ফুলের ব্যবহার রয়েছে। ■

বনজাম

Ardisia solanacea (Poir) Roxb

সমার্থক নাম ঃ *A. humilis*

গোত্র ঃ Myrsinaceae

অন্য নাম ঃ হাইড়গা
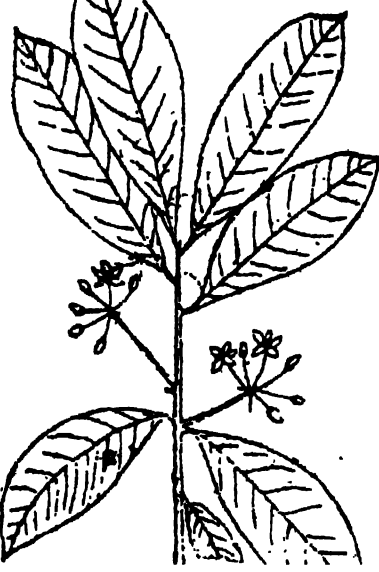
গণসূচক শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ "ardis" হতে যার অর্থ সূক্ষ্মাগ্র, এতে ফুলের পাপড়ির বাইরে বের হয়ে আসা সরু গর্ভদণ্ডটিকে বুঝায়। প্রজাতি সূচক শব্দের অর্থ Solanum সদৃশ, অর্থাৎ বেগুন জাতীয় গাছের ফুলের সঙ্গে এর ফুলের মিল আছে।

এই ছোট বৃক্ষজাতীয় গাছটি আমাদের দেশের আদিবাসী। ভারতের অনেক অঞ্চলে এর দেখা পাওয়া যায়। ছায়াযুক্ত স্থান বা নদী নালার পাশে এই গাছ বেশী জন্মায়। পশ্চিম ত্রিপুরার চড়িলাম অঞ্চলে এই গাছ রয়েছে।

চির হরিৎ ছোট বৃক্ষ বা বড় গুল্ম জাতীয় এই গাছটির ডালপালা অনেক সময় কাণ্ডের গোড়া হতে বের হয়। বাকল মসৃণ, বাদামী রঙের। পাতা উজ্জ্বল সবুজ। বেশ পুরু, কিছুটা মাংসল। বোঁটা ছোট, মোম গোলাপী রঙের ফুলগুলি পাতার মাঝে গুচ্ছাকারে সাজানো থাকে। প্রতি ফুলে পাঁচটি পাপড়ি ও পাঁচটি পুংকেশর রয়েছে। পরাগধানী লম্বাটে হলুদ রঙের। ফল ছোট গোলাকার কালচে, রসালো বেরী জাতীয়। বীজ প্রতি ফলে একটি করে থাকে। ফলের রস টুকটুকে লাল।

বছরের বিভিন্ন সময় গাছে ফুল দেখা যায় তবে গরমের সময় বেশী ফুল ফোটে। গ্রাম দেশে কোন কোন অঞ্চলে চৈত্র সংক্রান্তিতে এই ফুলের মালা গরুর গলায় পরানো হয়।

কাঠ বেশ শক্ত, তবে বিশেষ কোন কাজে ব্যবহারের কথা জানা যায় না। দেশীয় চিকিৎসকদের মতে গাছটি উদ্দীপক ও হজমীকারক গুণ যুক্ত। ■

বনগাব

Diospyrus montana Roxb. var. *cordifolia* (Robx.) Hiern

সমার্থক নাম ঃ *D. cordifolia*

গোত্র ঃ Ebnaceae

গণ সূচক শব্দটি এসেছে দুটি গ্রীক শব্দ হতে "Dios" অর্থ স্বর্গীয় "Puros" অর্থ গম। প্রজাতি সূচক montana-র অর্থ যা পাহাড় অঞ্চলে জন্মায়।Cordifolia অর্থ তাম্বুল আকৃতি পাতা যুক্ত।

বার্মা, মালয়, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতের উষ্ণ ও শুষ্ক অঞ্চল এই গাছটির আদি বাসস্থান। ত্রিপুরা রাজ্যে এ গাছটি রয়েছে। আগরতলায় কলেজটিলায় এর কয়েকটি গাছ রয়েছে।

ছোট আকারের ঝাক্ড়া বৃক্ষজাতীয় গাছ। বাকল কাল্চে বাদামী রঙের। পাতা অনেকটা সরু, সূক্ষাগ্র, নীচের দিক মৃদু রোমশ। পাতার বোটা খুব ছোট।

ফুল ছোট সাদা রঙের। স্ত্রী ও পুং ফুল আলাদা গাছে জন্মায়। পুং ফুলগুলি ছোট ছোট গোছায় সাজানো থাকে। স্ত্রী ফুল আকারে একটু বড়। এককভাবে ছোট ছোট বোটা হতে এদের ঝুলতে দেখা যায়। ফল গোলাকার মসৃণ। পাকা ফল হলুদ রঙের, তাতে ৭/৮ টি বীজ থাকে। গরমের সময় ফুল ফোটে। ফল পাকতে প্রায় এক বছর সময় লাগে। কোন কোন সময় গাছের ডালে কাঁটাও দেখা যায়।

কাঠ লাল্চে বা হল্দেটে সাদা রঙের এবং বেশ শক্ত। ফল বিষাক্ত। মধ্য প্রদেশের উপজাতিরা ফোঁড়া নিরাময়ে এর ব্যবহার করে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে এর পাতা মাছ মারার বিষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পাকা ফলে বিশ্রি গন্ধ রয়েছে। *Diospyros* গণভুক্ত আরো কয়েকটি প্রজাতি ত্রিপুরা রাজ্যে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে আগরতলার কলেজটিলায় রয়েছে *D. nigra* বা কাল গাব। ছোট ঝক্ড়া বৃক্ষ। কাণ্ড ও ডালপালা কাল রঙের। *D. lanceaefolia* ও *D. stricta* পাওয়া যায় জম্পুই পাহাড়ে। এরাও ছোট আকারের বৃক্ষ। *D. melanoxylon* বা কেন্দু পাতার একটি গাছ রয়েছে সিপাহীজলার বন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সামনে। এর পাতা বিড়ি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। ■

গাব

Diospyros perigrina Gurke

সমার্থক নাম ঃ *D. embryopteris / Embryopteris glutinifera*

গোত্র ঃ Ebenaceae

embryopteris শব্দের অর্থ পক্ষল ভ্রূণ। এই গাছটির আদি বাসস্থান ভারত, মালয় ও অষ্ট্রেলিয়ায়। শুষ্ক অঞ্চলে সাধারণতঃ নদী নালার ধারে এ গাছ জন্মায়। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে গ্রামদেশে এই গাছ রয়েছে। জম্পুই অঞ্চলে এর বেশ কিছু গাছ রয়েছে। আগরতলার ইন্দ্রনগরেও এই গাছ রয়েছে।

মাঝারি আকারের চির সবুজ বৃক্ষ জাতীয় গাছ, বাকল কাল রঙের মসৃণ, কাণ্ডের নীচু অংশ হতে ডালপালা গজায়। গাছের উপরের অংশ গোলাকার ঝাক্ড়া। পাতা লম্বাটে সরু, গাঢ় সবুজ, পাতার মাঝে ডালা হতে সাদা সুগন্ধি ছোট ফুল জন্মায়। ঝাক্ড়া চেহারার জন্যই বোধ হয় গ্রামদেশে একটা প্রবাদ রয়েছে যে গাব গাছে পেত্নী থাকে। পুং ও স্ত্রী ফুল আলাদা গাছে হয়। স্ত্রী ফুল আকারে পুং ফুল হতে একটু বড় এবং এককভাবে জন্মায়। পুং ফুল গোছা বেঁধে থাকে।

ফল গোলাকার, বেরী জাতীয়। প্রতি ফলে কয়েকটি বীজ থাকে। পাকা ফল হল্‌দে রঙের, তবে ফলের উপর লাল্‌চে বাদামী রঙের একটা চূর্ণের আবরণ থাকে।

এপ্রিল মাসে গাছে নূতন পাতা গজায়। লাল রঙের নূতন পাতা দেখ্‌তে বেশ সুন্দর। এ সময়ই গাছে ফুল আসে। বর্ষার শেষে ফল পাকে।

ফল খাদ্যোপযোগী। তবে ভালভাবে না পাকলে টক লাগে। বানর এই ফল বেশ পছন্দ করে। মাছ ধরার জাল রঙ করতে ও নৌকা রং করার জন্য এর ফলের বেশ চাহিদা রয়েছে। ফল হতে এক প্রকার আঠা পাওয়া যায় যা বই বাঁধানোতে ব্যবহৃত হয়। প্রচুর ট্যানিন থাকায় চামড়া ট্যান করার কাজেও এর ব্যবহার হয়। গাবের কষে রাঙানো জাল বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়।

কাঠ বেশ শক্ত, নির্মাণ কাজে এর ব্যবহার রয়েছে। নৌকার মাস্তুল ও পাটাতন তৈরীতে এর ব্যবহার হয়।

ভেষজ হিসাবে কাঁচা ফলের রস ক্ষত নিরাময়ে ও পেটের পীড়ায় উপকারী, গলক্ষতে গার্গল করার জন্যও এর ব্যবহার হয়ে থাকে। পাকা ফল রক্ত ও পিত্ত সম্বন্ধীয় পীড়ায় উপকারী। ম্যাদী জ্বরে গাছের ছাল, হিক্কা ও কটিবাতে ফুল উপকারী। বীজের তেল পেটের পীড়ায় উপকারী। বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

বকুল

Mimusops elengi L.

গোত্র ঃ Sapotaceae

অন্য নাম ঃ বউল

গণসূচক শব্দটি দু'টি গ্রীক শব্দ হতে এসেছে 'mimo' অর্থ বানর এবং 'opsis' অর্থ চেহারা। এই গাছের ফুলের সঙ্গে বানরের মুখের সাদৃশ্য রয়েছে মনে করা হয়। প্রজাতি সূচক নাম মালাবার উপকূলের স্থানীয় ভাষা হতে নেওয়া।

এই বৃক্ষটির আদি বাসস্থান ভারতের পশ্চিম উপদ্বীপ অঞ্চল, উত্তর সার্কাস, আন্দামান ও ব্রহ্মদেশ। বর্তমানে ভারতের সমতল ভূমির প্রায় সর্বত্র রাস্তার ধারে বা বাগানে এই গাছ লাগানো হয়ে থাকে। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ রয়েছে। আগরতলা শহরেও অনেক জায়গায় এই গাছ দেখা যায়।

সুন্দর চির সবুজ এই বৃক্ষের গুড়ি বেশ সরল। মাটি হতে প্রায় ৮/১০ ফুট উপরে প্রথম ডালপালা দেখা যায়। বাকল গাঢ় ধূসর রঙের একটু খসখসে। ছড়ানো ডালপালা উপরের দিকে উঠায় গাছের উপরিভাগ অনেকটা গোলাকার দেখায়। কালচে সবুজ চকচকে পাতাগুলি ডালে অনেকটা ঘন সন্নিবদ্ধভাবে থাকে।

সাদাটে রঙের সুগন্ধি ফুলগুলিকে ছোট গোছায় বা এককভাবে পাতার মাঝে দেখা যায়। প্রতি ফুলে অনেকগুলি বৃত্যাংশ, পাপড়ি ও পুংকেশর থাকে এবং এরা চ্যাপ্টা নক্ষত্রাকারে ছড়িয়ে থাকে। চক্চকে মসৃণ বেরী জাতীয় ফলগুলি পাকলে কমলা রঙের হয়। ফলের রসালো শাঁসে একটি মাত্র বীজ থাকে। মার্চ হতে জুলাই ফুল ফোটার সময়।

সুগন্ধি ফুলের জন্য প্রধানতঃ এই গাছ লাগানো হয়। মালা তৈরীতে বকুল ফুলের বেশ ব্যবহার রয়েছে। এই ফুলের একটা বৈশিষ্ট্য হলো, শুকিয়ে যাওয়ার পরও অনেক দিন এর সুগন্ধ থাকে। ফুল হতে পাওয়া উদ্বায়ী তেল প্রসাধন শিল্পে ব্যবহার করা যায়। দেবতার পূজায়ও বকুল ফুল ব্যবহৃত হয়। কোন কোন স্থানে বালিশে তুলার পরিবর্তে শুকনো বকুল ফুল ব্যবহৃত হয়। ফল খাদ্যোপযোগী।

বাকল ট্যানিং-এ ব্যবহৃত হয়। আবার সুতা রাঙানোর কাজেও এর ব্যবহার রয়েছে। বীজ হতে পাওয়া তেল শিল্পীরা রঙ গোলার কাজে ব্যবহার করেন। এছাড়া রান্নার কাজেও এর ব্যবহার রয়েছে।

কাঠ বেশ শক্ত। ঘর দরজা, আসবাবপত্র ও নৌকা তৈরী প্রভৃতিতে কাজে লাগে। গাছটি ভেষজগুণ বিশিষ্ট। কাঁচা ফল ও বীজ চিবালে নড়া দাঁত শক্ত হয়। দাঁতের মাড়ির অসুখে এর বাকল ও পাতা ব্যবহৃত হয়। ক্ষত নিরাময়ে গাছের বিভিন্ন অংশ হতে তৈরী লোশন ব্যবহৃত হয়। শুকনো ফুলের গুড়ার নস্যি সর্দি জ্বরে উপকারী। মাথা ধরায় পাতার ক্বাথের পট্টি আরামপ্রদ।

বকুলের ফুল উভয়লিঙ্গ। তবে কোন কোন গাছে একলিঙ্গ ফুল ফোটার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা হয়। ছায়াতে যেখানে অন্য গাছ জন্মায় না, সেখানেও বকুল গাছ ভাল বাড়ে। ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত গাছে নূতন পাতা গজায় এবং ঐ সময় গাছকে বেশ সুন্দর দেখায়। ■
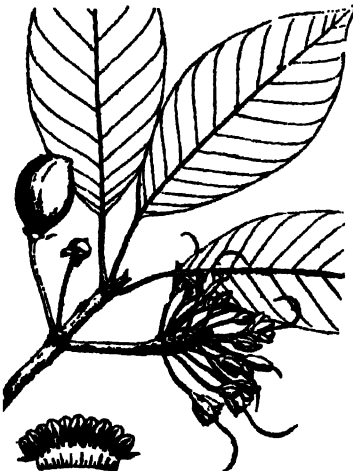
মহুয়া

Madhuka latifolia Macbr

সমার্থক নাম ঃ *Basia latifolia*

গোত্র ঃ Sapotaceae

গণসূচক শব্দটি একটি সংস্কৃত শব্দ, Latifolia শব্দের অর্থ চওড়া পাতা বিশিষ্ট। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের পুরানো বইতে Bassia latifolia নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। Bassia শব্দটি ইতালীয় উদ্ভিদ

বিজ্ঞানী ফার্ণেগো বেসিয়ার নাম হতে এসেছে। গণসূচক এই Bassia শব্দটি ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে Chenopodiace গোত্রের একটি ছোট গাছের জন্য প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রেণীবিন্যাসের নিয়মানুসারে একই শব্দ দুটি আলাদা গাছের নামের জন্য ব্যবহার করা যায় না এজন্য পুরানো নাম পরিবর্তন করে Madhuka latifolia রাখা হয়েছে।

ভারতের আদিবাসী এই গাছের বাসস্থান মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্য। ত্রিপুরায় এর দু একটি গাছ লাগানো হয়েছে। একটি গাছ রয়েছে আগরতলার কলেজ টিলায়। সিপাহীজলায়ও একটি গাছ রয়েছে।

বেশ বড় আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ। গাছের গুড়ি ধূসর বা বাদামী রঙের বাকলে ঢাকা। চূড়ার ডালপালা বেশ ছড়ানো। লম্বা বৃন্তযুক্ত বড় পাতাগুলি শাখার আগায় ঘন সন্নিবিষ্ট থাকে। কচি পাতা তামাটে লাল এবং রোম যুক্ত। পরিণত পাতা রোমহীন।

সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারী হতে এপ্রিলে গাছে ফুল আসে। প্রায় পত্রশূন্য গাছের ডালের আগায় ক্রীম রঙের বা সাদাটে পুষ্পগুচ্ছ দেখা যায়। ফুল রাতে ফোটে এবং সকালে গাছ হতে ঝরে পড়ে।

ফুলের একটা মিষ্টি মাতাল গন্ধ রয়েছে যাতে নানা প্রাণী এমন কি মানুষও আকৃষ্ট হয়। ফল সবুজ ডিম্বাকৃতি এবং তাতে ১-৪টি বীজ থাকে। জুন-জুলাই মাসে ফল পাকে।

আমাদের দেশে মহুয়া একটি বেশ উপকারী গাছ। এর বিভিন্ন অংশের অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। এর কাঠ বেশ শক্ত এবং নানা কাজে ব্যবহার করা যায়। তবে কাঠ ছাড়াও এ গাছের অন্যান্য অংশের নানা অর্থনৈতিক গুরুত্ব থাকায় এগাছ খুব কমই কাটা হয়। মহুয়া ফুল কাঁচা বা রান্না করে দুভাবেই খাওয়া যায়। ফুল থেকে তৈরী মদ স্থানীয় লোকের বিশেষ প্রিয়। হরিণ, ভল্লুক, শূকর প্রভৃতি ফুলের লোভে মহুয়া গাছের তলায় জড় হয়। ফলত্বক কাঁচা বা সব্জি হিসাবে খাওয়া হয়। বীজ হতে তেল, অর্দ্ধঘন ফ্যাট বা চর্বি পাওয়া যায় যা রান্না, প্রদীপ জ্বালানো প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সাবান তৈরীতে এর প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। মোমবাতি তৈরী, উল শিল্পে কাঁচা উল পরিষ্কার করা এবং মেশিন পিচ্ছিলকারক রূপেও এর ব্যবহার রয়েছে।

মহুয়ার ফ্যাট মিষ্টি শিল্প ও চকোলেট প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। পরিশোধন করে নিলে ভোজ্য তেল হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। মহুয়ার খইলের ধোঁয়া কীটনাশক। টেনিস লনের কেঁচো বিনাশে এর খইল ব্যবহৃত হয়।

মহুয়ার ভেষজ মূল্যও রয়েছে। ক্ষত নিরাময়ে এর ছাল ব্যবহৃত হয় এবং একে কুষ্ঠ রোগেও উপকারী বলে মনে করা হয়। সাদা তরুক্ষীর কষায়, বাতে উপকারী, ফুল

হৃদরোগ, কাশি, কানের পীড়া প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। ফল রক্তদুষ্টি ও ক্ষয় রোগে উপকারী। ফুলের মধু চোখের অসুখে উপকারী।

বীজ হতে মহুয়ার বংশবৃদ্ধি করা যায়। ছোট চারার মৃত্যু হার একটু বেশী এজন্য বীজতলায় চারা একটু বড় করে নিয়ে লাগানো উচিত। ছোট অবস্থায় গাছের বৃদ্ধির হার কম এজন্য চারা লাগানোর পর সুরক্ষার বন্দোবস্ত প্রয়োজন। ছায়াতরু হিসেবে রাস্তার ধারেও লাগানো যেতে পারে। ■

বেল

Aegle marmelos Corr

সমার্থক নাম ঃ *Crataeva marmelos*

গোত্র ঃ Rutaceae

অন্য নাম ঃ বিল্ব
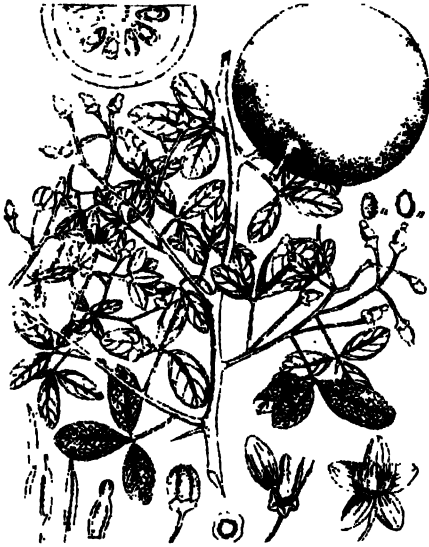
গণসূচক নাম এসেছে প্রাচীন গ্রীক শব্দ হতে, যাতে জলপরী বা বনদেবতা বুঝায়। প্রজাতি সূচক নাম এই গাছের পর্তুগীজ নাম হতে এসেছে।

গাছটি এশিয়ার উষ্ণ মণ্ডলের আদিবাসী। ভারতের শুষ্ক অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বেল গাছ পাওয়া যায়। পশ্চিম হিমালয়ের চারশ ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় এই গাছ জন্মায়। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে বেল গাছ রয়েছে। পাহাড়ের মাঝে কখনো কখনো বেল গাছে দেখা যায় তবে তা সম্ভবতঃ বুনো নয়, পরিত্যক্ত বাসভূমির গাছ। বাড়ীতে বা মন্দিরে অনেকে বেল গাছ লাগান। ছোট বা মাঝারি আকারের বৃক্ষ জাতীয় গাছ। বাকল বেশ পুরু, নরম। অনেকটা কর্কের মত। ধূসর রঙের। পাতা যৌগিক। করতলাকৃতি। তিনটি পত্রকে বিভক্ত। কেউ কেউ বেলগাছকে তেফড়কা গাছও বলেন। শিব ও শক্তির উপাসনায় ব্যবহৃত হওয়ায় বৈষ্ণবরা নাকি বেল নাম উচ্চারণ করেন না। তেফড়কা নামটি নাকি তাদের দেওয়া। গাছের ডালপালা শক্ত

সরল কন্টক যুক্ত।

এপ্রিল-মে মাসে গাছে ফুল আসে। ফুল মাঝারি আকারের। সবুজাভ সাদা। সুগন্ধ যুক্ত এবং ছোটছোট গোছায় জন্মায়। ফল বড়, গোলাকার, সবুজাভ ধূসর রঙের। ফল পাকতে প্রায় এক বছর সময় লাগে। পাকা ফল হল্‌দেটে রঙের, জাত বিশেষে ফলের আকার বিভিন্ন হয়ে থাকে। কোন কোন গাছের ফল মানুষের মাথার মত বড় হয়। কোন কোন গাছের ফল গোল না হয়ে একটু লম্বাটে হয়। ফলত্বক শক্ত। শাঁস হলদে বা কমলা রঙের, সুন্দর গন্ধ যুক্ত।

শীতের শেষে গাছ পত্রশূন্য হয়ে পড়ে। নূতন পাতা গজানোর পর গাছে ফুল আসে।

ফল হিসেবে বেল বেশ পুষ্টিকর। পুষ্টিগুণ ছাড়াও বেল ভেষজগুণেও সমৃদ্ধ। বেল শাঁসে শতকরা প্রায় ৬১.৫ ভাগ জলীয় পদার্থ, ৩১.৮ ভাগ শর্করা, ১.৮ ভাগ প্রোটিন, ০.৩৯ ভাগ স্নেহ পদার্থ ও ১.৭ ভাগ খনিজ পদার্থ রয়েছে। এছাড়া এতে ক্যারটিন, থিয়ামিন, রিবোফ্লেভিন, নিয়াসিন, ভিটামিন সি. প্রভৃতি পাওয়া যায়। অন্য কোন ফলে এত বেশী রিবোফ্লেভিন পাওয়া যায় না।

বেলের শাঁস চিনি ও দই'র সঙ্গে মিশিয়ে উৎকৃষ্ট সরবত তৈরী করা যায়। খাদ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় ফল হতে মোরব্বা, টফি, বেলচূর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া যেতে পারে।

ভেষজগুণের জন্য এর ফলে পাওয়া মারসিলোসিন নামক রাসায়নিক দায়ী। পাকা ফল একটু ধারক, টনিক গুণসম্পন্ন ও জীবনী শক্তি প্রতিস্থাপক। হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্কের জন্যও উহা উপকারী। কাঁচা ফল পেটের পীড়া ও আমাশয়ে উপকারী।

কম্বোডিয়ায় যকৃতের রোগ ও যক্ষ্মায় বেলের ব্যবহার হয়ে থাকে।

ফল ছাড়া গাছের অন্য অংশও ভেষজগুণ যুক্ত। পাতা চোখের প্রদাহে উপকারী। বাকলের রস ম্যাদী জ্বর উপশম করে। দ্রুতবক্ষ স্পন্দনে শেকড়ের রস উপকারী।

ফলের শক্ত খোসা কৌটা ও অন্য শিল্পবস্তু তৈরীতে ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়া উহা হতে এক প্রকার রঙও পাওয়া যায়।

কাঠ বেশ শক্ত, বিভিন্ন নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। হিন্দুদের মধ্যে বেলগাছকে পবিত্র মনে করায় সাধারণ কাজে এর কাঠ কমই ব্যবহৃত হয়।

তবে পূজা পার্বণে যজ্ঞকাষ্ঠ হিসাবে বেল কাঠের ব্যবহার রয়েছে।

শিব পূজায় বেলপাতা একটি অত্যাবশ্যক উপাচার। দুর্গাপূজা ও অন্য অনেক পূজায় বেলপাতার প্রয়োজন। একটি চলতি প্রবাদ রয়েছে যে, "হিন্দুদের দুর্গাপূজা,

বেলপাতা চাই বোঝা বোঝা।" দুর্গাপূজার বোধন ও অধিবাস বেলগাছে বা বিল্ব শাখায় করতে হয়।

তিনটি পত্রক বিশিষ্ট বেলপাতা সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে। যেমন তিনটি পত্র সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের প্রতীক। কারো মতে ত্রিপত্র শিবের ত্রিনয়নের প্রতীক। কেউবা বেলের ত্রিপত্রকে জাগ্রত সুষুপ্তি ও স্বপ্ন বা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতীক মনে করেন। শিবরাত্রির কাহিনীর সঙ্গে বেলগাছ জড়িত।

বেলগাছ বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে বেশ ভালই বাড়ে। বর্তমানে বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা হয়। তবে দেশে পাওয়া নানা জাতের ফল হতে উপযুক্ত জাত নির্বাচন করে অঙ্গজ জননের দ্বারা এর বংশবৃদ্ধি করা সম্ভব। ■
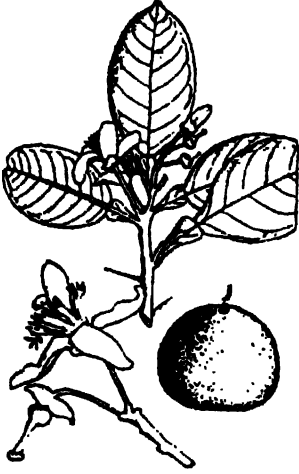
বাতাবী

Citrus maxima (Burm.) Merr.

সমার্থক নাম ঃ *C. grandis / C. decumena*

গোত্র ঃ Retaceae

অন্য নাম ঃ জাম্বুরা / বড় লেবু

গণ সূচক শব্দটি এসেছে গ্রীকশব্দ Citron হতে। প্রজাতি সূচক maxima সম্ভবত বড় আকারের ফল বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। grandis শব্দের অর্থ বড়। decumina অর্থ চিত্তাকর্ষক। অর্থাৎ প্রজাতি সূচক শব্দে ফলের আকারই প্রাধান্য পেয়েছে।

এই গাছটি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মালয়ের আদিবাসী। বর্তমানে ভারতের উষ্ণ অঞ্চলের সর্বত্র এর চাষ হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ রয়েছে। ফলের গাছ হিসাবে বিভিন্ন বাড়ীতে এই গাছ লাগানো হয়ে থাকে। বাতাবী একটি চিরহরিৎ বৃক্ষ। অনুকূল আবহাওয়ায় গাছ প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা হয়ে থাকে। ডালপালা নিয়ে গাছের উপরিভাগ প্রায় গোলাকার। কাণ্ড তুলনামূলকভাবে ছোট। বাকল মসৃণ, ধূসর বাদামী রঙের। ডালপালায় অনেক সময় কাঁটা থাকে। পাতা গাঢ় সবুজ রঙের চক্‌চকে।

পত্রমূল অনেকটা গোলাকার। পত্রাগ্র ছুঁচালো, কখনো কখনো ছোট খাঁজযুক্ত । পাতার বোটা পক্ষল, মনে হয় একটি পাতার নীচে যেন একটি ছোট পাতা রয়েছে।

ফুল সাদা সুগন্ধযুক্ত । এককভাবে বা গোছা বেঁধে থাকে । Citrus এর অন্য প্রজাতির তুলনায় ফুল আকারে বড় । ফলও এই গণভুক্ত অন্য প্রজাতি হতে বড় আকারের। পাকা ফল হাল্কা হলদে রঙের। প্রায় গোলাকার। কখনো বা নেসপাতির আকৃতি বিশিষ্ট। ফলের খোসা সবুজ গ্রন্থিযুক্ত। খোসার ভেতরের দিক সাদা পুরু স্পঞ্জের মত। ফলের শাঁস লাল্‌চে বা সাদাটে রঙের। মিষ্টি বা টক স্বাদ যুক্ত। বীজ চ্যাপ্টা।

ফেব্রুয়ারী মার্চে গাছে ফুল আসে। জুলাই হতে ফল পাকতে আরম্ভ করে। কোন কোন জাতে সারা বছর গাছে কিছু কিছু ফুল ফুটতে দেখা যায়। তাদের ফলও প্রায় সারা বছর পাওয়া যায়।

রাজ্যে বেশ কয়েক জাতের বাতাবী লেবু জন্মায়। যাদের মধ্যে ফলের রঙ, গন্ধ ও স্বাদের পার্থক্য রয়েছে। বাতাবীর শাঁস ফল হিসাবে খাওয়া ছাড়াও কমলা ইত্যাদির মত স্কোয়াস ইত্যাদি তৈরী করে খাওয়া যায়।

পাতা ভেষজগুণযুক্ত। মৃগী, স্নায়বিক আক্ষেপ ইত্যাদি রোগে উপকারী। ব্রাজিলে এই গাছ হতে পাওয়া এক প্রকার আঠা কাশির উপশমের জন্য ব্যবহার করা হয়। বীজ পেটের পীড়া, কাশি ও কটিবাতে উপকারী।

কাঠ ক্রীম রঙের, বেশ শক্ত ও ভারী, তবে বিশেষ কোন কাজে ব্যবহৃত হয় না। বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

কমলা

Citrus reticulata Blanco.

সমার্থক নাম : *C. chrysocarpa / C. khasia*

গোত্র : Rutaceae

অন্য নাম : কমলালেবু / নারাঙ্গী

প্রজাতি সূচক শব্দের অর্থ জালিকাকার, যা হতে সম্ভবতঃ ফলের অন্তঃত্বকের প্রকৃতি বুঝায়। খাসিয়া শব্দে খাসি পাহাড় বুঝায় যেখানে এই প্রজাতির চাষ হয়ে থাকে। "Chrysocarpa" শব্দটি এসেছে দুটি গ্রীক শব্দ হতে : "Chrysos" অর্থ সোনালী,

"Karpos" অর্থ ফল।

এই গাছের আদিবাসস্থান দক্ষিণ চীনে, কোচিন চীন। ভারতে কমলার একাধিক প্রজাতি ও জাতের চাষ করা হয়। এদের মধ্যে ত্রিপুরায় চাষ করা কমলা C. chrysocarpa-র বৈশিষ্ট্য হল এর ফলের খোসা সহজে ছাড়িয়ে নেওয়া যায়। রাজ্যের জম্পুই পাহাড় অঞ্চল ও অন্যত্র এর চাষ করা হয়।

এই বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ অনুকূল জলবায়ুতে কুড়ি ফুট বা তার বেশী লম্বা হয়। গাছটি দেখতে সুন্দর। শাখা কন্টক যুক্ত। বাকল সবুজ রঙের। গাঢ় সবুজ পাতার বোঁটা ছোট কিন্তু পক্ষল নয়। পাতার দুই প্রান্ত ছুঁচালো।

সুগন্ধযুক্ত সাদা ফুল পাতার মাঝে ছোট বোঁটায় এককভাবে বা ছোট ছোট গোছায় জন্মায়। ফুল আকারে ছোট। এর ফল আমাদের এত পরিচিত যে এর বর্ণনা অনাবশ্যক। ফলের খোসা শাঁস হতে প্রায় মুক্ত এবং তা সহজে ছাড়িয়ে নেওয়া যায়। ফল বেশ মিষ্টি। বীজের ভিতরের দিক সবুজাভ।

কমলা গাছ রাজ্যের সর্বত্র জন্মালেও সমতলভূমিতে এর ফল মিষ্টি হয় না। ডিসেম্বর হতে মে পর্যন্ত গাছে ফুল আসে। শীতের সময় ফল পাকে।

খাদ্য হিসাবে ব্যবহার ছাড়াও কমলার ভেষজগুণও রয়েছে। এর ফল ক্ষুধাবর্দ্ধক, রক্ত পরিষ্কারক ও জ্বরে উপকারী। ফলের খোসা হজমীকারক। বমন, পেটের পীড়া, ক্রিমি ও চর্মপীড়ায়ও খোসা উপকারী। ফুলের জলীয় নির্যাস মুর্চ্ছা ও স্নায়বিক রোগে বেদনানাশক হিসাবে কাজ করে। ফুল হতে পাওয়া উদ্বায়ী তৈল প্রসাধন শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

কাঠ হল্‌দেটে, শক্ত। নানা কাজের উপযোগী। এই কাঠ হতে বেড়ানোর ছড়ি তৈরী কারা হয়। বীজ বা কলম হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

কদ্‌বেল

Feronia limonia (L.) Swing.

সমার্থক নাম ঃ *F. elephantum*

গোত্র ঃ Rutaceae

অন্য নাম ঃ কয়েত বেল / কপিত্থ

গণসূচক শব্দটি এসেছে ইতালীর প্রাচীন বনদেবীর নাম অনুসারে। প্রজাতি সূচক elephantum শব্দে হাতি সম্বন্ধীয় বুঝায়। প্রসঙ্গতঃ এই গাছের ফল হাতিদের প্রিয় এবং তারা এই ফল সম্পূর্ণ গিলে ফেলে এবং হাতির মলের সঙ্গে ফলের শক্ত খোসা আস্তই বের হয়ে আসে কিন্তু ফলের শাঁস হজম হয়ে যায়।

এই গাছটি দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলংকার আদিবাসী। বর্তমানে ভারতের শুষ্ক অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে জন্মায়। ত্রিপুরা রাজ্যে এই গাছ রয়েছে। অনেক দিন আগে কাঞ্চনপুর হতে জম্পুই যাওয়ার পথে ২/১টি গাছ দেখেছি।

মাঝারি আকারের বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড সরল। বাকল গাঢ় ধূসর রঙের। ডালপালা ছড়িয়ে গাছের উপরিভাগকে অনেকটা গোল আকার দেয়। কচি ডালপালায় অনেক সময় কাঁটা থাকে। পাতা যৌগিক। পক্ষল, সচূড়, পত্র সংখ্যা ৫-৭। অনেক সময় মধ্যশিরায় সরু পাখার মত উপবৃদ্ধি দেখা যায়। কোন কোন সময় পাতার গোড়ায় একটি করে কাঁটা দেখা যায়।

ফুল ছোট। হাল্কা সবুজ বা লাল্‌চে রঙের। শাখার মাঝে বা আগায় গুচ্ছাকারে সাজানো। ফল গোলাকার। খোসা শক্ত ধূসর রঙের। শীতের শেষে অল্প কিছুদিন গাছ পত্রশূন্য থাকে। ফেব্রুয়ারী মার্চে নূতন পাতা গজানোর পর গাছে ফুল আসে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্যন্ত ফল পাকে।

ফল অম্ল স্বাদযুক্ত। পাকা ফল আচার বা জেলী হিসেবে খাওয়া যায়।

ফলের ভেষজগুণও রয়েছে। উহা কষায়, উদ্দীপক। হিক্কা ও গলক্ষতে উপকারী। ফলের শাঁস বা খোসাচূর্ণ বিষাক্ত পোকার কামড়ে বাহ্যিক প্রয়োগ করা হয়।

ফলের শক্ত খোসা নস্যির কৌটা বা এই জাতীয় দ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। কাঠ

বেশ শক্ত, ঘর দরজা তৈরী ও কৃষির যন্ত্রপাতি তৈরীতে এর ব্যবহার হয়। পাতা হতে পাওয়া তেল চুলকানির উপশম করে। এছাড়া ছোটদের হজমের গোলমালেও পাতা উপকারী।

গাছটি খুব আস্তে বাড়ে। অনেক সময় লেবু জাতীয় অন্য গাছের কলম তৈরীর জন্য এই গাছকে মূল কাণ্ড (Stock) হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ■

কারিপাতা

Murrya koenigii Spreng.

সমার্থক নাম ঃ *Bergera koenigii*

গোত্র ঃ Rutaceae

অন্য নাম ঃ কারিয়া ফুল্লি

এই গাছটির আদি বাসস্থান কুমায়ুন হতে সিকিম পর্যন্ত হিমালয়ের পাদদেশ, ভারত ও শ্রীলংকার উষ্ণ আর্দ্র অঞ্চল, পশ্চিমঘাট হতে ত্রিবাঙ্কুর, পশ্চিমবাংলা প্রভৃতি। ত্রিপুরা রাজ্যেও এই গাছ রয়েছে। আগরতলায় বেশ কিছু বাড়ীতে এই গাছ দেখেছি।

ছোট বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ, বাকল গাঢ় ধূসর রঙের, কাণ্ড ছোট, শীতের শেষে অল্প কিছুদিনের জন্য গাছ পত্রশূন্য হয়ে যায়। পাতা যৌগিক, পক্ষল, সচুড়, পত্রকগুলি মধ্যশিরায় একান্তভাবে সাজানো। পত্রকের কিনারা অল্প খাঁজযুক্ত। দেখতে অনেকটা নিম পাতার মত। গাছটি মৃদু রোমশ ও বিশেষ গন্ধযুক্ত।

ফেব্রুয়ারী-মার্চে নূতন পাতার সঙ্গে গাছে ফুল গজায়। ফুল সাদা, ছোট। শাখার আগায় বড় গুচ্ছাকারে সাজানো। ফল ছোট ডিম্বাকার বা প্রায় গোলাকার। বেরী জাতীয়। জুনে ফল পাকে। পাকা ফল কাল রঙের।

দক্ষিণ ভারতে এর পাতা বিভিন্ন তরকারী রান্নায় ব্যবহার করা হয়। এছাড়া চাটনী ইত্যাদি তৈরীতেও এর ব্যবহার রয়েছে। পাতা ভেষজগুণযুক্ত। পেটের পীড়ায় উপকারী। [illegible]লানো পাতা চর্মরোগ বা আঘাত লাগায় বহিঃপ্রয়োগ করা হয়। গাছের বাকল ও মূল বিষা[illegible] পোকামাকড় ইত্যাদির কামড়ে বাহ্যিক প্রয়োগে উপকারী। কোথাও সাপেড় কামড়ে

এ বাকলও মূলের ব্যবহার দেখা যায়।

কাঠ শক্ত, দীর্ঘস্থায়ী। কৃষির যন্ত্রপাতি তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে। বীজ হতে সহজে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

কামিনী

Murrya paniculata (L.) Jack

সমার্থক নাম ঃ ***M. exotica***

গোত্র ঃ Rutaceae

গণসূচক শব্দ জার্মান অধ্যাপক J.A. Murray নাম অনুসারে হয়েছে। প্রজাতি সূচক শব্দে এই গাছের প্যানিকল পুষ্পবিন্যাসকে বুঝায়। সমার্থক নামের exotica শব্দে বিদেশজাত বুঝায়।

এই গাছটির আদি বাসস্থান ভারত, মালয়, চীন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের উষ্ণ মণ্ডলীয় অঞ্চল, ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক স্থানে এই গাছ রয়েছে। আগরতলায় অনেক বাড়ীতে এই গাছ দেখা যায়।

বড় গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। বাকল ধূসর রঙের। পাতা গাঢ় সবুজ, যৌগিক, পক্ষল, সচূড়। পত্রকগুলি মধ্যশিরায় একান্তরভাবে সাজানো। শাখার আগায় ছোট সুগন্ধী ফুলগুলি প্যানিকল পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। পাকা ফল লাল রঙের, বরী জাতীয়, ছোট, অনেকটা ডিম্বাকৃতি, প্রান্ত তীক্ষ্ণাগ্র।

কামিনীর দুইটি জাত রয়েছে। একটি গুল্মজাতীয় এবং এর প্রতি পুষ্পগুচ্ছে অনেক ফুল থাকে। অপরটি বৃক্ষ জাতীয়, এতে প্রতি পুষ্পগুচ্ছে অল্প ফুল থাকে। বাড়ীতে কামিনী গাছ থাকলে গ্রীষ্ম ও বর্ষায় এর ফুলের সুগন্ধে বাড়ী ভরে যায়। পূজার জন্য এর ফুলের ব্যবহার রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ ও দুর্গার নাকি এই ফুল বেশ প্রিয়।

কাঠ বেশ শক্ত। খোদাই কাজে ব্যবহারের উপযুক্ত। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির হাতল ও বেড়ানোর ছড়ি তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে।

ব্রহ্মদেশে এর বাকল হতে প্রসাধন সামগ্রী তৈরী হয়। ভেষজ গুণ হিসাবে পাতা

ও গাছের অন্য অংশ পেটের পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। মুণ্ডাদের মধ্যে সাপের বিষের চিকিৎসায় এবং বাকলের ব্যবহার রয়েছে। দাঁত মাজার জন্য অনেক সময় এই গাছের ডাল ব্যবহার করা হয়। আসামে এর কাঠ গুঁড়িয়ে পাওয়া একপ্রকার আঠা, মেয়েরা দাঁত কাল করার জন্য ব্যবহার করে। বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

বাজনা

Zanthoxylum limonella (Dennst.) Alston

সমার্থক নাম ঃ *Z. budranga*

গোত্র ঃ Rutaceae

অন্য নাম ঃ বজরঙ

হিমালয়ের উষ্ণ মণ্ডলে কুমায়ুন হতে আসাম পর্যন্ত এই বৃক্ষটির বাসভূমি। এছাড়া শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, বার্মা ও দঃ পূঃ এশিয়ায় এই গাছ দেখা যায়। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে এ গাছ রয়েছে। আগরতলার কলেজটিলায় কলেজ চত্বরে কয়েকটি গাছ রয়েছে।

মাঝারি আকারের বৃক্ষ। গাছের গুড়িতে বেশ বড় আকারের কর্কের মত গাত্র কন্টক থাকে। ছোট বেলায় আমরা এই বাকল গাত্র কন্টক গাছ হতে উঠিয়ে ছুরি দিয়ে বিভিন্ন শব্দ উলটো হরফে লিখে তাতে কালি লাগিয়ে সঙ্গীদের জামা ইত্যাদিতে ছাপ দেওয়ার খেলা খেলতাম। গাছের পাতা আকারে বড়, যৌগিক, পক্ষল, সচূড়। ফুল আকারে ছোট, সবুজাভ সাদা, যৌগিক নিয়ত পুষ্পবিন্যাসে শাখার আগায় সাজানো থাকে। ফল ছোট, গোলাকার। প্রতি ফলে একটি করে কাল্‌চে রঙের বীজ থাকে। কোথাও কোথাও মশলা হিসাবে এর ফলের ব্যবহার দেখা যায়। বীজ হতে এক প্রকার সুগন্ধি তেল পাওয়া যায়। কাঠ বয়ন শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

ভেষজগুণ হিসাবে এর ফল কষায় ও উদ্দীপক। পেটের পীড়ায় এর ব্যবহার রয়েছে। বাতরোগে মধুর সঙ্গে এই ফল ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। শেকড়ের বাকল মূত্রকৃচ্ছতায় উপকারী। ■

নীল বাদী

Garuga pinnata Roxb.

গোত্র : Burseraceae

Garuga শব্দটি এসেছে মালয়ের স্থানীয় নাম হতে। প্রসঙ্গতঃ তেলেগু ভাষায় এই গাছের নাম গারুগা। pinnata শব্দে গাছের পক্ষল যৌগিক পাতা বোঝায়।

এই গাছটি কুইন্সল্যাণ্ডের আদিবাসী, সম্ভবতঃ তথা হতে ভারতে এসেছে। বর্তমানে ভারতের উষ্ণমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে এই গাছ জন্মায়। তবে কোথাও এই গাছ বেশী সংখ্যায় দেখা যায় না। কোথাও কোথাও ছায়াতরু হিসাবে রাস্তার পাশে এই গাছ লাগানো হয়েছে। আগরতলার অনেক স্থানে এই গাছ রয়েছে। কলেজটিলায় ও ইন্দ্রনগর অঞ্চলে বেশ কয়েকটি গাছ রয়েছে।

মাঝারি আকারের লম্বা এই বৃক্ষটির বাকল বেশ পুরু। বাইরের দিক বাদামী বা ধূসর রঙের কিন্তু ভিতরের দিক লাল্‌চে। অনেক সময় বাকল ছোট ছোট টুকরায় উঠে আসে। পাতা যৌগিক, ১৫-৪০ সেমি লম্বা সচূড়। পত্রকের আকার বিভিন্ন প্রকার তবে তাদের আগা সূচালো এবং কিনারা দন্তুর। অনেক সময় পোকার আক্রমণে পাতায় 'গলের' সৃষ্টি হয়। শীতে গাছের পাতা ঝরে যায় এবং ঝরার আগে পাতা লাল রঙ ধারণ করে।

মার্চ-এপ্রিল মাসে নেড়া গাছে ফুল আসে। ফুলগুলি ছোট হল্‌দেটে রঙের। শাখার আগায় গুচ্ছাকারে সাজানো। ফুল আসার পর গাছে নূতন পাতা গজায়। ফুল একলিঙ্গ ও উভয়লিঙ্গ দু প্রকারের হয় এবং একই গাছে এই দুই প্রকার ফুল ফোটে।

ফল গোল, প্রথমে তা সবুজ পরে হল্‌দেটে বা কাল রঙের হয়। গোছা বাধা ফলগুলি দেখতে আঙ্গুরের গোছার মত দেখায়।

ফল কাঁচা, রান্না করে অথবা আচার হিসাবে খাওয়া যায়। অম্ল স্বাদের ফলগুলি হজমীকারক গুণযুক্ত। ডালার রস চক্ষু রোগে ব্যবহৃত হয়। পাতার রস হাঁপানীতে এবং শেকড় ফুসফুসের রোগে উপকারী। গাছের ছাল ও পাতার 'গল' ট্যানিং-এ ব্যবহৃত হয়। পাতা ভাল পশুখাদ্য, বিশেষ করে হাতি এই পাতা পছন্দ করে।

কাঠে সাধারণতঃ সহজে পোকার আক্রমণ হয় এজন্য বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয়

না। তবে পুরানো গাছের কলেচে বাদামী রঙের সার কাঠ অনেকটা দীর্ঘস্থায়ী। আসবাব পত্র, ড্রাম, ছোট নৌকা প্রভৃতি তৈরীতে এর ব্যবহার হয়। ডালা হতে কাটিং -এর সাহায্যে সহজে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

বিলং

Averrhoa bilimbi L.

গোত্র : **Averrhoaceae**

গণ সূচক শব্দটি এসেছে আরব দেশীয় বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীর নাম হতে। প্রজাতি সূচক শব্দটি ভারতীয় ভাষা হতে নেওয়া। এই ছোট বৃক্ষটি মলাক্কাসের আদিবাসী। তবে বর্তমানে উষ্ণমণ্ডলের অনেক দেশে এই গাছ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে প্রধানতঃ চাষ করা অবস্থাতেই এই গাছ পাওয়া যায়। ত্রিপুরাতে এই গাছ বেশী নাই। কয়েক বছর আগে আগরতলার রামনগর হতে আমার এক ছাত্র সনাক্তকরণের জন্য এই গাছের একটি ডাল আমার কাছে নিয়ে আসে।

ছোট বৃক্ষ বা গুল্ম জাতীয় গাছ। গুড়ির নীচ হতেই ডালপালা বের হয়। তবে ছোট গাছে তেমন ডালপালা থাকে না। পাতা উজ্জ্বল সবুজ, দেখতে বেশ সুন্দর, আকারে বড়। যৌগিক, সচূড় পক্ষল। ছোট লাল বা বেগুনী রঙের ফুলগুলি গাছের গুড়িতে ছোট ছোট ডালায় গুচ্ছাকারে সাজানো থাকে।

ফল আকারে কামরাঙ্গা অপেক্ষা ছোট তবে ফলের গায়ে শিরা থাকে না, রঙ হাল্কা সবুজ। এক গোছায় অনেক ফল থাকে। পাকা ফল নরম, কিছু সময় রাখার পর ফল হতে স্ট্রবেরীর গন্ধ পাওয়া যায়।

কাঁচা ফল টক। রান্না করে বা আচার, জেলী তৈরী করে খাওয়া যায়। ফলের পুষ্টিগুণ মন্দ নয়। এতে শর্করা, প্রোটিন, স্নেহ পদার্থ, খনিজ লবণ ছাড়াও প্রচুর ভিটামিন সি ও কোরোটিন রয়েছে।

কাঠ সাদা, তবে বেশ নরম। এজন্য বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয় না। ভেষজ গুণ হিসাবে ফল হতে পাওয়া সিরাপ আন্ত্রিক, রক্ত ক্ষরণ রোধে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় জ্বর ও প্রদাহ নিবারণে এর ব্যবহার হয়। ফল স্কার্ভি রোগ নিবারক। গরমের সময় গাছে ফুল হয়, বর্ষা পর্যন্ত গাছে ফুল ফুটতে থাকে। শীতের শুরুতে ফল পাওয়া যায়। বীজ হতে বংশ বৃদ্ধি করা যায়। ■

কামরাঙ্গা

Averrhoa carambola L.

গোত্র ঃ Averrhoaceae

প্রজাতি সূচক carambola শব্দটি এসেছে এর স্পেনীয় নাম হতে। কামরাঙ্গার বৈজ্ঞানীক নাম সম্বন্ধে একটি গল্প প্রায়ই আমার ছাত্রদের বলতাম। অবশ্য ল্যাটিন ভাষায় অপরিচিত শব্দ যুক্ত নামকে চিত্তাকর্ষক করার জন্যই এই গল্পের অবতারণা। কোন এক সময় এক সাহেবের বাগানে করিম নামে এক মালী ছিল। সাহেব একদিন বাগান দেখতে গিয়ে একটি অপরিচিত চারাগাছ দেখে করিমকে তা কেটে ফেলতে বলেন ! এর বেশ কিছুদিন পর পুনরায় বাগানে গিয়ে ঐ গাছটিকে দেখে করিমকে গাছ না কাটার জন্য বকতে থাকেন। তাতে করিম বলে সে গাছ কেটেছিল — "লেকিন আবার হুয়া" এই অপরিচিত গাছটির প্রতি এতে সাহেবের উৎসুক্য বাড়ে এবং তার নাম দেন আবার হুয়া করিম বোলা।

এই গাছটি সম্ভবতঃ আমেরিকার আদিবাসী। তবে বর্তমানে উষ্ণ মণ্ডলের অনেক দেশেই এর চাষ হয়। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকালয়ে কামরাঙ্গা গাছ রয়েছে। আগরতলায়ও বেশ কিছু বাড়ীতে এই গাছ দেখা যায়।

ছোট বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। এর বাকল ধূসর রঙের এবং মসৃণ। ডালপালা নীচের দিকে ঝেপে থাকে। পাতা যৌগিক পক্ষল, সচূড় তবে পত্রকগুলি সম্পূর্ণ বিপরীত নয়। ডালপালা বা কাণ্ড হতে বেগুনী বা সাদা পুষ্পগুচ্ছ ঝুলতে দেখা যায়। ফলের গা পাঁচটি

খাঁজ যুক্ত। পাকা ফল হল্‌দেটে সবুজ।

ফল অম্ল স্বাদযুক্ত। কিন্তু গন্ধটি বেশ সুন্দর। বেশী টক হওয়ায় কাঁচা অবস্থায় এই ফল কমই খাওয়া হয়। তবে চাটনী বা আচার হিসাবে এর ভাল ব্যবহার রয়েছে।

ফল ভেষজ গুণযুক্ত। আন্ত্রিক, রক্তক্ষরণ রোধ ও অন্যান্য উপসর্গে ইহা ব্যবহৃত হয়। শুকনো ফল জ্বরে উপকারী। টাটকা ফল হজমীকারক ও জণ্ডিস রোগে উপকারী। ইহা ভিটামিন সি ও এ সমৃদ্ধ। আসামে হামে আক্রান্ত রোগীর ঘরে এই গাছের ডালা রাখা হয় এবং তাতে নাকি তাড়াতড়ি রোগ সারে। মিষ্টি ফল যুক্ত এক জাতের কামরাঙ্গা রয়েছে যাকে কোন কোন অঞ্চলে চিনি কামরাঙ্গা বলা হয়। টক কামরাঙ্গা গাছে জোড়কলম হিসাবে এর বংশবৃদ্ধি করা হয়। এর কাঠ বেশ শক্ত। আসবাবপত্র তৈরীতে এর ব্যবহার করা যায়।

সাধারণতঃ এপ্রিল হতে জুন মাসে গাছে ফুল আসে। তবে সারা বর্ষাকালে কিছুদিন পরপর গাছে ফুল ফুটতে দেখা যায়। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফল পাকে। তবে অন্য সময়ও ফল পাওয়া যায়। বীজ বা কাটিং হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

পীতরাজ

Aphanamixis polystachya (Wall.) R.N. Parker

গোত্র ঃ **Meliaceae**

অন্য নাম ঃ বাগীরাতা / পিত্রা / রণা

নামের দ্বিতীয় শব্দটির অর্থ অনেক মঞ্জুরী যুক্ত। ভারতের উষ্ণমণ্ডলের আদিবাসী এই গাছ ভারত ছাড়াও মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, বাংলাদেশে পাওয়া যায়। ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে এই গাছ রয়েছে। আগরতলার কলেজটিলায় বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রাস্তার পাশে এর একটি বড় গাছ ছিল, যা আর এখন নেই। ইন্দ্রনগর স্কুলের কাছে রাস্তার ধারে একটি গাছ রয়েছে।

মাঝারি আকারের চিরসবুজ বৃক্ষ। চূড়া ঘন পাতাযুক্ত, অনেকটা গোলাকার। ছাল মসৃণ, পাতলা, গাঢ় ধূসর রঙের। পাতা যৌগিক। উজ্জ্বল সবুজ, তীক্ষ্মাগ্র বড় বড় পত্রকগুলি

মধ্য শিরার দু-পাশে জোড়ায় জোড়ায় লাগানো। ফুল একলিঙ্গ। পুং ও স্ত্রী পুষ্প আলাদা গাছে জন্মায়। পুং পুষ্পগুলি আকারে বেশ ছোট এবং এর মঞ্জুরীগুলি গাছের ডালার আগার দিকে ঝুলে থাকে। ফল হলদে গোলাকার। ফলের ভিতরে বেশ কয়েকটি কমলা বা লাল রঙের বীজ থাকে। পাকা ফল টিয়া পাখীর বেশ প্রিয়।

এর কাঠ ভারী এবং বেশ ভাল তবে খুব কম কাজে ব্যবহৃত হয়। এর ছাল কষায় তবে ভেষজ গুণযুক্ত । প্লীহা রোগে উপকারী। বীজ হতে পাওয়া তেল বাতে মালিশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আগে যখন কেরোসিন সহজলভ্য ছিলনা তখন গ্রাম দেশে এর বীজের তেল প্রদীপ জ্বালানোর জন্য ব্যবহৃত হত।

গাছে সেপ্টেম্বর হতে নভেম্বরে ফুল আসে এবং শীতের শেষ ফল পর্যন্ত পাকে। ■

নিম

Azadirachta indica A. Juss

গোত্র ঃ **Meliaceae**

বৈজ্ঞানিক নামের প্রথম শব্দটি এসেছে পারসিক শব্দ হতে, আর indica অর্থ ভারতীয়। এই গাছটির আদি জন্মভূমি ব্রহ্মদেশ। তবে বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা জন্মায়। ভারত ছাড়াও বার্মা, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, জাপান প্রভৃতি দেশেও নিমের চাষ হয়।

ভারতের উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাডু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, গুজরাট, দিল্লী, বিহার উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গেও উহার চাষ হয়। ত্রিপুরায়ও নিম একটি সুপরিচিত গাছ। মাঝারি হতে বড় আকারের চিরসবুজ এই বৃক্ষটি দেখতে খুবই সুন্দর। এই গাছ ৪০ থেকে ৬০ ফুট উঁচু এবং গোড়ায় ব্যাসার্ধ ৬-৮ ফুট হয়ে থাকে। কোন কোন অঞ্চলে শীতের শেষে গাছটি পত্রহীন হয়ে পড়ে। পাতা কৌণিক। পত্রকগুলি মধ্যশিরার দুই পাশে সাজানো, তবে পাতার আগার একটি পত্রক এককভাবে থাকে। পত্রক সরু, লম্বাটে, একটু বাঁকানো, দুটি কিনারা অসমান এবং খাঁজ কাটা। প্রচুর পাতা থাকায় এই গাছের সালোকসংশ্লেষের হারও বেশী, ফলে গাছে তুলনামূলকভাবে অন্য গাছ হতে বেশী অক্সিজেন

ছাড়ে। এজন্য নিম গাছকে অন্য গাছের তুলনায় বেশী বাতাবরণ বিশুদ্ধকারী হিসেবে মনে করা হয়।

পশ্চিম ভারতে জানুয়ারী হতে মার্চ মাসে ফুল আসে, অন্যত্র এপ্রিল মাসে ফুল আসে। ফুলের মিষ্টি গন্ধে অনেক কীট পতঙ্গ আকৃষ্ট হয়। জুন হতে আগষ্ট মাসে ফল পাকে। সবুজ ফল পাকলে হলদে রঙের হয়। পাকা ফল পাখীর প্রিয় খাদ্য এবং তাদের মাধ্যমে বীজ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের দেশের বিভিন্ন বৃক্ষের মধ্যে নিম বেশ মূল্যবান। এর ভেষজগুণের জন্য বহু প্রাচীনকাল হতে এই গাছটি আমাদের দেশে সমাদৃত। বর্তমানে সাবান, দাঁতের মাজন প্রভৃতি প্রস্তুতে এর বহুল বাণিজ্যিক ব্যবহার দেখা যায়।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নিমের চাষ হলেও নিম বীজ সংগৃহীত হয় কেবল কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশে। নিমবীজ হতে বর্তমান আমাদের দেশে ৪৫ হাজার টন তেল পাওয়া যায়। পরিশুদ্ধ নিম তেলের অধিকাংশই সাবান তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও আজকাল দাঁতের মাজন তৈরীর কাজে ইহা ব্যবহৃত হচ্ছে। এ হতে পোকা মারার ঔষধও তৈরী হয়। নিম খইল অনেকে ইউরিয়ার সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করে এবং এতে ইউরিয়া হতে নাইট্রোজেন তাড়াতাড়ি বের হয়ে নষ্ট হয় না। নিম খইল উচ্চ প্রোটিনযুক্ত হওয়ায় মুরগীর খাদ্যে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য ব্যবহারের পূর্বে খইল পরিশোধন করে নিতে হয়। নিম খইল মুরগীর বৃদ্ধি ও ডিম উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায়। নিম পাতা খাদ্য হিসেবে, নিম ডাল দাঁতের মাজন হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়াও নিম গাছের ছাল বিভিন্ন ঔষধ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। নিম পাতা সেদ্ধ জলও নানা ঔষধি গুণসম্পন্ন। নিমের মিষ্টি ফল ত্বক ও খাদ্যোপযোগী। কাপড় ইত্যাদি পোকার আক্রমণ হতে রক্ষা করার জন্য অনেকে শুকনো নিম পাতা ব্যবহার করে থাকেন। আমাদের অনেকের বিশ্বাস নিম হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগ প্রতিষেধক। এজন্য অনেক স্থানে ঘরের দরজায় একগোছা নিম পাত ঝুলিয়ে রাখা হয়। কোন কোন অঞ্চলে গ্রাম দেশে শিশুদের অপদেবতার নজর হতে বাঁচানোর জন্য আতুড় ঘরে একগোছা নিমপাতা ঝুলিয়ে রাখে।

নিম কাঠ বেশ শক্ত। গরুর গাড়ী, জাহাজ, কৃষির যন্ত্রপাতি, খেলনা প্রভৃতি তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে। হিন্দুদের নিকট নিম কাঠ বেশ পবিত্র, এজন্য দেব প্রতিমা তৈরীতে এর ব্যবহার দেখা যায়। বিশেষ লক্ষ্মযুক্ত নিম কাঠ হতে জগন্নাথ দেবের দারুমূর্তি তৈরীর কথা হয়ত অনেকেই জানেন।

বীজ হতে নূতন চারা গজায়, তবে বীজ একটু পুরানো হলে তার অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা চলে যায়। এজন্য টাটকা বীজ ব্যবহার করা উচিত। গাছ বেশী লম্বা হলে শীতের শেষে উপরের ডালপালা ও কাণ্ড কেটে দিলে, দু-তিন মাসের মধ্যে নতুন ডালপালা গজায়। ■

মহানিম

Melia azedarach L.

গোত্র ঃ **Meliaceae**

অন্য নাম ঃ ঘোড়া নিম

Melia একটি গ্রীক শব্দ, যার অর্থ ash জাতীয় গাছ। তবে ash গাছের সংগে ঘোড়া নিমের কোন মিল নেই। azedarach পারসিক শব্দ। যার অর্থ স্বাধীন গাছ।

এই গাছের আদি বাসস্থান নিম্ন হিমালয়ের শিবালিক পর্বত। এছাড়া বার্মা, চীন ও পারস্য দেশেও এ গাছ প্রচুর পাওয়া যায়। ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যে অন্য রাজ্যের তুলনায় এ গাছের সংখ্যা বেশী। তবে অন্যান্য রাজ্যেও ক্রমশঃ গাছ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পশ্চিম ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে আগরতলার বিভিন্ন রাস্তার ধারে ইদানিং এর অনেক গাছ লাগানো হয়েছে।

মাঝারি আকারের দ্রুত বর্দ্ধনশীল বৃক্ষ। গাছের ছাল গাঢ় ধূসর বা কালচে বাদামী রঙের এবং লম্বা ফাটল যুক্ত।

ডালপালা ছড়ানো নিম গাছের সংগে এর কিছুটা মিল রয়েছে। তবে এর পাতা দ্বি-পক্ষল। পাতাগুলি হলদে হয়ে ডিসেম্বর পর্যন্ত গাছ একবারে পত্রশূন্য হয়ে পড়ে। মার্চ মাস পর্যন্ত লাইল্যাক রঙের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে গাছ ভরে যায় এবং তখন গাছে নতুন পাতাও গজায়। কিছুদিন পরেই ছোট গোলাকার ফল দেখা দেয়। ফল বিষাক্ত। পাকা ফল হলদে এবং অনেক দিন গাছে ঝুলে থাকে। বীজ হতে তৈরী মালা ভারতের অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয়। অনেকের বিশ্বাস, এই মালার রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রয়েছে।

নামে মহানিম হলেও নিম গাছের মত এই গাছ ততটা ভেষজ গুণযুক্ত নয়। তবে আরব ও ইরানে এই গাছের বিভিন্ন অংশ ঔষধি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন শিরঃপীড়ায় পাতা, বাতে বীজ ও ফল, চর্মরোগে পাতা ইত্যাদি। এর শিকড় নাকি ক্রিমিনাশক।

এই গাছের কাঠ নরম হলেও আসবাবপত্র তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে। তবে দ্রুত বর্দ্ধনশীল ছায়াতরু হিসেবে এই গাছ বেশ মূল্যবান। এই গাছের শিকড় মাটির বেশী গভীরে যায় না, এজন্য খোলা জায়গায় বিশেষতঃ যেখানে হাওয়ার দাপট বেশী সেখানে

এই গাছ না লাগানোই ভাল ।

বীজ হতে বর্ষায় সহজে চারা তৈরী করা যায়। তবে নিমের মত এর বীজও পুরানো হলে চারা গজায় না। এক বছরে গাছ ৮-১০ ফুট লম্বা হয়। ■
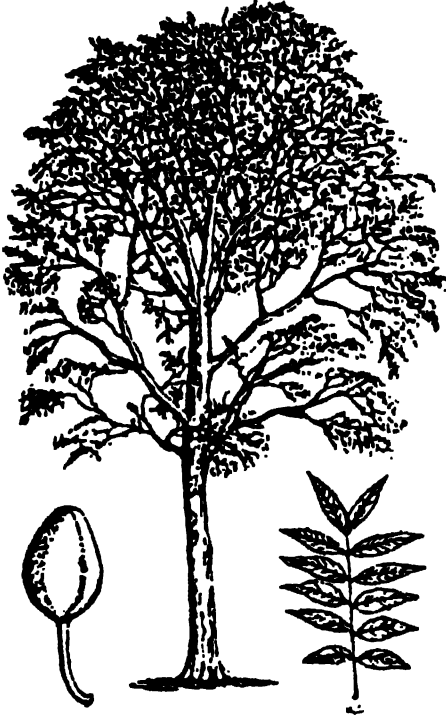
বড় মেহগনি

Swietenia macrophylla King.

গোত্র : **Meliaceae**

গণসূচক শব্দটি এসেছে ওলন্দাজ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী Gerard von Swieten এর নাম অনুসারে। বড় পাতা যুক্ত গাছ বুঝাতে প্রজাতি সূচক নাম দেওয়া হয়েছে।

বৃক্ষ জাতীয় এই গাছের আদি বাসস্থান আমেরিকার উষ্ণ মণ্ডল। হন্দুরাজ হতে এই গাছ প্রথমে কলিকাতায় আসে এবং পরে সেখান হতে ভারতের অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে এই গাছ রয়েছে। আগরতলার কলেজটিলায় ও ইন্দ্রনগর অঞ্চলে কয়েকটি গাছ রয়েছে। এই গাছ আসল মেহগনি বা স্পেনীয় মেহগনির মত দেখতে কিন্তু পাতা আকারে বড় এবং ফলও আকারে বড় এবং কোণাকৃতি। এই প্রজাতিটি আসল মেহগনি হতে তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং বেশী কষ্ট সহিষ্ণু। কিন্তু এর পাতা ততটা সুন্দর নয় এবং কচি পাতার হরিৎ মরকত রঙের ব্যবহার দেখা যায় না।

গাছে সাধারণতঃ মার্চে নূতন পাতা গজায় এবং মার্চ-এপ্রিলে ফুল আসে। খুব কচি পাতা লাল্‌চে বা গোলাপী রঙের হয়ে থাকে।

এর কাঠ হাল্কা ধরনের এবং আসল মেহগনির তুলনায় কম মূল্যবান। নানা কাজে এর ব্যবহার রয়েছে। ■

মেহগনি

Swietenia mahagoni (L.) Jacq.

গোত্র ঃ Mcliaceae
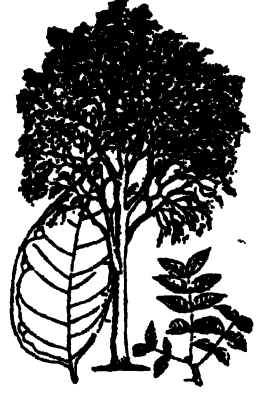
প্রজাতিক সূচক শব্দ এসেছে পশ্চিম ভারত দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত এই গাছের নাম অনুসারে। এই গাছটি জ্যামাইকা ও মধ্য আমেরিকার আদিবাসী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হতে এই গাছ আমাদের দেশে আসে। কলিকাতার তৎকালীন রয়েল বটনিক গার্ডেনে ইহার প্রথম চাষ হয় ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে। উইলিয়াম রক্সবার্গ জ্যামাইকা হতে এনে ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে প্রথম এই গাছ লাগান। ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই বাগান হতে মেহগনি গাছ বিস্তার লাভ করে। এই বাগান হতে মেহগনির বহুবীজ চারা ইত্যাদি বার্মা, শ্রীলঙ্কা, ইউরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলেও পাঠানো হয়। ত্রিপুরা রাজ্যেও মেহগনি গাছ রয়েছে। আগরতলা হতে গান্ধীগ্রামের পথে শালবাগানের কাছে ২/১ টি গাছ রয়েছে। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছায়াতরু বা কাঠের জন্য এই গাছ লাগানো হয়ে থাকে, তবে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের তুলনায় আমাদের দেশের মেহগনির কাঠ একটু নিম্নমানের।

সুন্দর চিরহরিৎ দীর্ঘ বৃক্ষজাতীয় গাছ। ডালপালা চারদিকে ছড়ানো। বাকল খসখসে, ধূসর বাদামী রঙের। প্রায়ই গাছের গুঁড়ি হতে বাকলের টুকরা খসে পড়ে। পাতা যৌগিক, অচূড় পক্ষল। প্রতি পাতায় পত্রকের সংখ্যা ৪-১০। পত্রকের মধ্যশিরার দুই পাশ অসমান। পরিণত পাতা চক্‌চকে গাঢ় সবুজ রঙের কিন্তু কচি পাতা হরিৎ মরকত রঙের। মেহগনির ছোট চারার পাতা পরিণত গাছের তুলনায় অনেক বড় হয় এজন্য অনেকে তাকে বড় মেহগনি বলে মনে করেন।

ফুল ছোট আকারের, হল্‌দেটে সবুজ। পাতার কক্ষে গুচ্ছবদ্ধভাবে জন্মায়। ফুলের পাপড়িগুলি ছড়িয়ে থাকে। ফল প্রায় গোলাকার, কাষ্ঠল ক্যাপসুল জাতীয়। প্রতি ফলে অনেক পক্ষল বীজ থাকে। মার্চ-এপ্রিলে গাছে নূতন পাতা গজায়। এপ্রিল-মে মাসে ফুল আসে।

মেহগনি কাঠের বিশ্বজুড়ে নাম রয়েছে। আসবাব তৈরী এবং শক্ত কাঠের প্রয়োজন এমন কাজে এর ব্যবহার দেখা যায়। জাহাজ নির্মাণে এর বহুল ব্যবহার রয়েছে।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই গাছের বাকল সিঙ্কোনার পরিবর্তে ভেষজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ■

তুন

Toona ciliata M. Roem

গোত্র ঃ Meliaceae

অন্য নাম ঃ পোমা / কুমা

বৈজ্ঞানিক নামের প্রথম শব্দটি গাছের ভারতীয় নাম তুনের ল্যাটিন ভাষান্তর, ciliata শব্দটি এর ফুলের বৃতি ও দলের কিনারায় থাকা রোমকে বুঝায়। কোন কোন বইতে এই গাছের নাম *Cedrela ciliata* লেখা আছে। কিন্তু cedrela বৃক্ষ আমেরিকার অধিবাসী। আমাদের দেশীয় তুন গাছের সঠিক নাম *Toona ciliata.*

ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ পাহাড় অঞ্চলে এই বৃক্ষ জন্মায়। অনেক সময় ছায়াতরু হিসাবে রাস্তার ধারে একে লাগানো হয়। ভারতের বাইরে বার্মা, মালয়, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে এই গাছ জন্মায়। ত্রিপুরার জঙ্গলে বুনো গাছ হিসেবে সদর, খোয়াই ও বিলোনীয়া মহকুমায় এই গাছ রয়েছে। আগরতলায় কলেজ টিলায় কলেজ চত্বরে এর একটি বড় গাছ রয়েছে।

দ্রুত বর্দ্ধনশীল এই বৃক্ষের বাকল খসখসে, গাঢ় ধূসর হতে বাদামী রঙের। ডালপালা বহু বিস্তৃত। প্রায় চির সবুজ এই বৃক্ষের পাতা যৌগিক। মধ্য শিরার দুই পাশে পত্রকগুলি জোড়ায় জোড়ায় সাজানো।

ডিসেম্বর-জানুয়ারী পর্যন্ত গাছে ফুল আসে। ফুল সাদা, মিষ্টি গন্ধযুক্ত। মঞ্জুরীগুলি শাখার প্রান্ত হতে কিছুটা নীচের দিকে ঝুলে থাকে। ফল আয়তাকার ক্যাপসিউল। ২-২.৫ সেমি লম্বা। বর্ষায় ফল পাকে। প্রতি ফলে অনেকগুলি চ্যাপ্টা বীজ থাকে। বীজগুলি পক্ষল, যা তাদের বিস্তারে সাহায্য করে।

তুন আমাদের দেশের একটি মূল্যবান দারু উৎপাদনকারী বৃক্ষ। এর কাঠ লালচে রঙের এবং সুগন্ধ যুক্ত। সহজে উঁই পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয় না। বিভিন্ন নির্মাণ কাজ ও আসবাবপত্র তৈরীতে এর কাঠ ব্যবহৃত হয়। সুন্দর গন্ধের জন্য চুরুটের বাক্স তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে।

তুনের ফুল হতে লাল ও হলদে রঙ পাওয়া যায়। যা তুলা রঙ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে এই রঙ দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ায় এর ব্যবহার কম। গাছের পাতা ও বীজ

ভাল পশুখাদ্য। এর ছাল কষায়, উদরাময় রোগে এর ব্যবহার রয়েছে।

বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

লিচু

Litchi chinensis Sonn

সমার্থক নাম ঃ ***Nephalium litchi / Scytalia litchi***

গোত্র ঃ **Sapindaceae**

গণসূচক শব্দটি লিচুর চীনদেশীয় নাম হতে দেওয়া। প্রজাতি সূচক শব্দে চীন দেশে জাত বুঝায়। দক্ষিণ চীন এই গাছটির আদি বাসভূমি। সেখান হতে আঠারশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ব ভারতে এর আগমন ঘটে। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে লিচু চাষ হয়ে থাকে। ত্রিপুরা রাজ্যেও প্রচুর লিচু গাছ রয়েছে এবং এর মধ্যে বেশ কিছু ভাল জাতের গাছও রয়েছে। লিচু গাছের বহুল চাষের জন্য এ রাজ্যে এর সঙ্গে জুড়ে জায়গার নামও হয়েছে যেমন লিচু বাগান। ভারতের বাইরে বর্তমানে আফ্রিকায় এর বেশ ভাল চাষ হয়ে থাকে।

লিচু চিরহরিৎ ছোট বৃক্ষ জাতীয় গাছ। বাকল ধূসর রঙের ও খসখসে। ডালপালা বেশ ছড়ানো, পাতা চক্‌চকে গাঢ় সবুজ। পাতার আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

তবে সব গাছের পাতাই যৌগিক পক্ষল ধরনের যার মধ্যশিরার দু'পাশে পত্রকগুলি জোড়ায় জোড়ায় সাজানো থাকে। পত্রকের উপরের দিক গাঢ় সবুজ হলেও নীচের দিক ফ্যাকাশে রঙের।

ফুল খুব ছোট, সবুজাভ ও পাপড়িবিহীন। গোছা বেঁধে শাখার আগায় জন্মায়। ফল অনেকটা গোলাকার। খোসা পাত্‌লা ভঙ্গুর অসমান। পাকা ফল লাল্‌চে রঙের। প্রতি ফলে একটি করে বীজ থাকে। মাংসল শাঁস সাদা রঙের। মিষ্টি। ফল পাড়ার কিছু সময় পর খোসা গাঢ় বাদামী রঙ ধারণ করে।

ফেব্রুয়ারী মাসে গাছে ফুল আসে। মে পর্যন্ত ফল পাকে। তবে ভাল ফলনের জন্য অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পাখী, বাদুর, কাঠবিড়ালী ইত্যাদির হাত হতে ফলের সুরক্ষার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়।

আমাদের দেশে লিচুর ফল সাধারণতঃ টাটকাই খাওয়া হয়। ফলের পুষ্টি গুণ খুব ভাল। প্রোটিন, ফ্যাট ছাড়াও এতে ভিটামিন বি, সি, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লৌহ রয়েছে। চীন দেশে শুকনো ফল খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। য়ুনানী মতে ফল তৃষ্ণা নিবারক এবং হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক, যকৃত প্রভৃতির জন্য টনিক হিসাবে কাজ করে। কাঠ লাল রঙের, বেশ শক্ত, বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

চীন, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে এই গাছের বিভিন্ন অংশ ভেষজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শেকড়, বাকল ও ফুল সেদ্ধ করে সেই জলে গলরোগে গার্গল করা হয়। কাঁচা ফল ছোটদের বসন্ত রোগ উপশমে ব্যবহৃত হয়। আন্ত্রিক গোলযোগে ও স্নায়ুশূলে বীজের ব্যবহার রয়েছে।

সাধারণতঃ গুটি কলম বা জোড় কলম হতে বংশ বৃদ্ধি করা হয়। টাট্‌কা বীজ দিয়েও বংশবৃদ্ধি করা হয়। প্রায় সব ধরনের মাটিতে লিচু গাছ জন্মালেও, দোঁয়াশ মাটিতে এই গাছ সবচেয়ে ভাল বাড়ে।

তবে মাটির জলনিকাশ ব্যবস্থা ভাল হওয়া প্রয়োজন। লিচুর শেকড়ে এক প্রকার মিথোজীবী ছত্রাক বাস করে। এজন্য নূতন জায়গায় গাছ লাগাতে হলে পুরানো গাছতলা হতে কিছু মাটি এনে নূতন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া উচিত। যাতে ঐ মাটিতে থাকা মিথোজীবী ছত্রাক নূতন গাছের শিকড়ের সংস্পর্শে আসতে পারে। কলমের গাছে পাঁচ/ছয় বছরে ফল ধরে। তবে প্রথম দিকে ফলের পরিমাণ কম থাকে। কিন্তু গাছের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফলনের পরিমাণ বাড়ে। ■

রিঠা

Sapindus mukoross Gaertn.

গোত্র : **Sapindaceae**

গাছটি সম্ভবতঃ পশ্চিম হিমালয়ের আদিবাসী, আসামে এ গাছ বেশ দেখা যায়। উত্তর ভারতের অনেক অঞ্চলে এর চাষ হয়। সম্প্রতি ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় দু একটি বাড়ীতে এ গাছ দেখেছি।

ছোট বা মাঝারী আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ, বাকল হাল্কা বা গাঢ় ধূসর রঙের, কিছুটা অসমান। মাঝে মাঝে বাকলের ছোট ছোট টুকরা খসে পড়ে। পাতা যৌগিক। ৫-৮ জোড়া পত্রক বিপরীত বা একান্তরভাবে বিন্যস্ত। পত্রকের আকার ৯-১৮ সেমি × ২-৫ সেমি। অনেকটা ডল্লাকার বা তীর্যকাকার।

ফুল ছোট, সাদা বা বেগুনী রঙের। অধিকাংশ ফুলই উভয়লিঙ্গ। ছোট ছোট ফুলগুলি প্যানিকেল পুষ্প বিন্যাসে শাখার আগায় সাজানো থাকে। ফল গোলাকার, হাল্কা বাদামী রঙের। গাছ হতে ঝরার আগে ফলের খোসা কিছুটা কুচ্‌কে যায়। প্রতি ফলে একটি গোল কাল বীজ থাকে।

ফলে শেপনিন রয়েছে। গরম কাপড় ধোয়ার জন্য রিঠার ফল ভেজানো জল ব্যবহার করা হয়।

ভেষজগুণ হিসাবে গাছের বাকল ভিজানো জল উকুন মারার জন্য ব্যবহৃত হয়। ফল কফ নিঃসারক। বীজ চুর্ণ ফিটের অসুখে উপকারী। ■

কাজু বাদাম

Anacardium occidentale L.

গোত্র ঃ Anacardiaceae

গাছটি ব্রাজিলের আদিবাসী। সেখান হতে দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তারলাভ করেছে। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজদের দ্বারা ভারতবর্ষের গোয়ায় এই গাছ আসে। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্রে এর প্রচুর চাষ হয়। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও অনেক কাজু লাগানো হয়েছে।

ছোট বৃক্ষ জাতীয় গাছ। ১০-১২ মিটারের বেশী লম্বা হয় না। গুঁড়ি ছোট হলেও বেশ শক্ত এবং নীচ হতে ডালপালা বের হওয়ায় গাছটিকে ঝোপড়ার মত দেখায়। পাতা সরল, একান্তরভাবে বিন্যস্ত, আকারে মোটামুটি বড়, বিডিম্বাকার, চর্মবৎ। গাছের কাণ্ড হতে হল্‌দে রঙের আঠা বের হয়।

ফুল আকারে ছোট, হল্‌দে রঙের, তবে এতে গোলাপী ছিট রয়েছে। পুষ্পবিন্যাস

প্যানিকেল, ফল বৃক্কাকার, নাট জাতীয়। ফলটি মাংসল ন্যাসপাতি আকৃতির স্ফীত পুষ্পবৃন্তের আগায় বসানো থাকে। ফুল হতে ফল পেতে দুই থেকে আড়াই মাস সময় লাগে। বর্তমানে আমাদের দেশে আশি হাজার টনের বেশী কাজুবাদাম উৎপন্ন হয়, যার পঁচাত্তর শতাংশ বিদেশে রপ্তানী হয়। আমাদের দেশে প্রধানতঃ এপ্রিল-মে মাসে বাদাম সংগ্রহ করা হয়।

ভাজা বীজ খাদ্য হিসেবে বেশ মূল্যবান। এমনিতে খাওয়া ছাড়াও বেকারী ও মিষ্টি সামগ্রী প্রস্তুতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। মাংসল ফলবৃন্ত বা কাজু আপেল হতে এক প্রকার উত্তেজক পানীয় প্রস্তুত হয় যা আমাদের দেশের এক বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীদের বেশ প্রিয়।

ফলত্বক হতে পাওয়া তেল বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। কাজুর শাঁস হতে হাল্কা হল্‌দে রঙের তেল পাওয়া যায়, চকোলেট তৈরীতে উহা ব্যবহৃত হয়, এছাড়া বিষের প্রতিষেধক হিসেবেও এর ব্যবহার রয়েছে।

ভেষজ গুণ হিসাবে গাছের বাকলের রস কুষ্ঠরোগে ও আঁচিল নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়, গাছের শেকড় রেচকগুণ যুক্ত, বিভিন্ন রোগে এর ব্যবহার রয়েছে।

আমাদের দেশ হতে কাজু রপ্তানির পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়ছে। ত্রিপুরার আবহাওয়ায় গাছটি ভালই জন্মায় এই জন্য এর চাষ, প্রক্রিয়াকরণ প্রভৃতির দিকে আরো নজর দেওয়া উচিত। ■

পিয়াল

Buchanania lanzan Spreng

সমার্থক নাম ঃ *B. latifolia.*

গোত্র ঃ Anacardiaceae

গণসূচক নামটি এসেছে স্যার ফ্র্যান্সিস বুকাননের নাম অনুসারে। প্রজাতি সূচক latifolia শব্দ একান্তর পত্র বিন্যাস বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

গাছটি ভারতের উষ্ণ মণ্ডলে শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্যের অধিবাসী। ত্রিপুরা রাজ্যের

সদর বিভাগের বিভিন্ন স্থানে এই গাছ রয়েছে।

বড় আকারের পর্ণমোচী অরণ্যের বৃক্ষ। বাকল খস্‌খসে। পাতা সরল, একান্তর, চর্মবৎ, চওড়া আয়তাকার, স্থুলাগ্র।

ছোট উভয়লিঙ্গ সাদা ফুলগুলি পাতার কক্ষে বা শাখার আগায় রোমযুক্ত প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। ফল ছোট আকারের, ড্রুপ জাতীয়। গাছ হতে প্রচুর আঠা পাওয়া যায়। বীজের শাঁস খাদ্যোপযোগী।

ভেষজগুণ হিসাবে গাছের শেকড় কফে উপকারী। ফল টক, মিষ্টি শীতল গুণযুক্ত। কামোদ্দিপনায় ও বাতরোগে এর ব্যবহার রয়েছে। বীজ শরীরের জ্বালাপোড়া নিবারণ করে। বীজ হতে পাওয়া তেল কোন কোন স্থানে চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। গলগ্রন্থি স্ফীতিতেও বীজতেলের ব্যবহার দেখা যায়।

পাতার রস হজমীকারক। রক্ত পরিষ্কারক, রেচক ও তৃষ্ণা নিবারক। বিভিন্ন রোগে এর ব্যবহার রয়েছে। ■

বাদী

***Lannea coromandelice* (Houtt.) Merr**

সমার্থক নাম ঃ *L. grandis / Odina wodier.*

গোত্র ঃ Anacardiaceae

এই Lannea গণভুক্ত অধিকাংশ প্রজাতির বাসস্থান আফ্রিকা মহাদেশ এবং সেখানকার স্থানীয় নাম হতে গণসূচক শব্দটি নেওয়া হয়েছে। এই প্রজাতিটি ভারতের করমণ্ডল উপকূলে জাত, প্রজাতি সূচক নামে তাই সূচিত হচ্ছে। grandis শব্দের অর্থ বড়, যাতে এই গাছের বড় আকারের কথা জানা যায়।

ভারতের উষ্ণ মণ্ডলের আদিবাসী এই বৃক্ষ জাতীয় গাছটি আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। ত্রিপুরায় এই গাছ অনেক রয়েছে। ডাল হতে সহজে গাছ হওয়ায় অনেকে বাড়ীর বেড়ায় খুঁটি হিসাবে এর ডাল লাগান যা ক্রমে গাছে পরিণত হয়। আগরতলা শহরে ও তার আশেপাশে এর অনেক গাছ রয়েছে।

পর্ণমোচী বৃক্ষ, বাকল মসৃণ, গন্ধযুক্ত ও ধূসর রঙের। অনেক সময় বাকলে হাল্কা লম্বা কুঞ্চন দেখা যায়। এখানকার জলবায়ুতে গাছের আকার বেশী বড় হয় না, তবে মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। সবুজ নরম প্রশাখার আগায় পাতাগুলি গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় থাকে । পাতা যৌগিক, পক্ষল, সচূড়, পত্রক ছোট বৃন্তযুক্ত, পাতলা অন্তপ্রান্তদেশীয় শিরাযুক্ত।

শীতের সময় গাছের পাতায় ঝরে যায়। মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত গাছ পত্রশূন্য থাকে। ফুল আকারে ছোট, হল্‌দেটে এবং তাতে একটু বেগুনী আভা থাকে । ফুল স্পাইক বা মঞ্জুরী পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। ফুল একলিঙ্গ। পুং ও স্ত্রী পুষ্প আলাদা গাছে বা একই গাছের বিভিন্ন শাখায় জন্মায়। গাছে ফুল আসার পর নূতন পাতা গজায়।

ফল ছোট , বেরী জাতীয় এবং তা অনেক দিন গাছে থাকে। পাকা ফল লাল্‌চে বা বাদামী রঙের এবং প্রতি ফলে একটি শক্ত বীজ থাকে।

এই গাছ হতে পাওয়া আঠা কেলিকো মুদ্রণে ব্যবহৃত হয়। ঘর চুনকামে, চুনের মিশ্রণে এই আঠা ব্যবহার করা হয়। পাতা ভাল পশু খাদ্য। বাকল হতে পাওয়া রঞ্জক পদার্থ সিল্ক রাঙানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

ভেষজগুণ হিসাবে এর বাকল ক্ষত, মচ্‌কানো, কাটা ও অন্য চর্মরোগে উপকারী। সবুজ শাখার রস তেঁতুলের সঙ্গে মিশিয়ে বিষক্রিয়ায় বমনের জন্য ব্যবহার করা হয়। বাকলের ক্বাথ দাঁতের ব্যাথায় উপকারী। বাকল চূর্ণ দাঁতের মাজন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাতা সেদ্ধ জল গোধ এবং কষ্টকর ফুলায় উপকারী।

এই গাছের নরম শাখায় প্রচুর শর্করা থাকে, এজন্য কাটিং-এর সাহায্যে সহজে বংশবিস্তার করা যায়। ■

আম

Mangifera indica L.

গোত্র : Anacardiaceae

অন্য নাম : আম্র

গণ সূচক শব্দটি দুটি শব্দ হতে এসেছে। 'Mango' শব্দটি তামিল Manga অথবা মালায়ালাম Mangga শব্দ হাতে নেওয়া, 'fera' এই ল্যাটিন শব্দের অর্থ আমি

বহন করি। প্রজাতি সূচক indica শব্দের অর্থ ভারতীয়। সবে মিলে আম বহনকারী ভারতীয় গাছ। ভারত উপমহাদেশের হিমালয় হতে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত সর্বত্র আম জন্মায়। কোথাও কোথাও বন্য অবস্থায়ও আম গাছ দেখা যায়। প্রাচীন সাহিত্য ও স্থাপত্য হতে দেখা যায় যে ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে আমের চাষ হয়ে আসছে। এর আদি জন্মভূমি সম্বন্ধে নানা মত রয়েছে। তবে অধিকাংশ উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর মতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া আমের উৎপত্তি স্থল। খুব সম্ভবতঃ আসাম-বার্মা অঞ্চল আমের আদি জন্মভূমি। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত ত্রিপুরার সর্বত্র আমের চাষ হয়ে থাকে। এখানকার বনাঞ্চলেও আমের গাছ দেখা যায়, তবে তারা বুনো বা পরিত্যক্ত জুম চাষের জমিতে জন্মানো গাছও হতে পারে।

আমাদের দেশের সাহিত্যে আমের মত অন্য কোন বৃক্ষের অত উল্লেখ দেখা যায় না। ভারতের জনমানসের উপর নানাভাবে আম যুগ যুগ ধরে প্রভাব বিস্তার করে আসছে। সংস্কৃত সাহিত্যে উহা আম্র, অমৃত ফল, চ্যুত, রসাল, সহকার, অতি সৌরভ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইতিহাসে আম্রপাল নামে এক রাজা এবং আম্রপালী নামে এক বরনারীর কথা পাওয়া যায়। পানিনির লেখায় মানুষ বোঝাতে আম্রগুপ্ত এবং শহর বোঝাতে আম্রপুরের উল্লেখ রয়েছে। কালিদাসের মেঘদূতে আম্রকূট পাহাড়ের উল্লেখ দেখা যায়। শতপথ ব্রাহ্মণ হতে বৈদিক যুগে আমের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে জানা যায়। শৈব সাহিত্যে কোন কোন সময় শিবকে আম্রকেশ্বর বলা হত। কাঞ্চীর একাম্রনাথ মন্দির এখন পর্যন্ত প্রাচীন ধর্মীয় গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অমর কোষে উষ্ণ মণ্ডলের ফলের রাজা আমের প্রশংসা দেখা যায়।

কালিদাস হাতে আরম্ভ করে অনেক কবি আমের মুকুলকে মদনের শর হিসেবে বর্ণনা করেছেন। চরক সংহিতায় আমের ভেষজ গুণের উল্লেখ আছে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের বিবরণ হতে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে আমের প্রভাব সম্বন্ধে জানতে পারি। খৃষ্টপুর্ব ১৫০ অব্দে তৈরী সাচীস্তূপে বিভিন্ন চিত্রে আম গাছ ও ফলের কথা জানতে পারি।

ভারতের রাজ রাজাদের নিকট আমের প্রচুর আদর ছিল এবং ভাল জাতের আম

বাগানের একচেটিয়া মালিকানা তারা গৌরবের বিষয় মনে করতেন। সম্রাট আকবর দারভাঙ্গার নিকট আমবাগ নামে এক লক্ষ আমগাছের এক বাগান করেছিলেন। আইন-ই আকবরীতে নানা জাতের আমের গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। পলাশীর আম বাগানে সিরাজদৌল্লাকে হারিয়ে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের গোড়াপত্তন হয়।

আম গাছ আমাদের অত পরিচিত যে উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বর্ণনা ছাড়াও একে চিনতে অসুবিধা হয় না।

উদ্ভিদবিদ্যায় যে আমের নাম *Mangifera indica* তা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এই *Mangifera* গণের প্রজাতি সংখ্যা কারো মতে ৬২ আবার কারো মতে ৪১, যার মধ্যে দুটি প্রজাতি ভারতে পাওয়া যায়। এরা *M. indica* ও *M. Sylvatica.* *M.Sylvatica*-র দেশীয় নাম বুনো আম বা লক্ষ্মী আম। ত্রিপুরা রাজ্যের তেলিয়ামুড়া ও আমবাসা অঞ্চলে বনভূমিতে এই গাছ রয়েছে। এর ফল খাদ্যোপযোগী নয়, আকারে ছোট ও অম্ল স্বাদযুক্ত। এর কাঠ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়।

ভারতে নানা জাতের প্রায় ১৪০০ প্রকার আম রয়েছে। এদের মধ্যে গুণ, আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কোন জাতের হয়ত আঁশ বেশী, কারো হয়ত মাংস বেশী। কেউ মিষ্টি কেউবা টক। বিভিন্ন জাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় আকারের আম বোধহয় অন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরী জেলার অধিবাসী 'তেন্নেরু' জাত। এর ফল বিশাল আকৃতির, প্রায় ২৩ সেমি লম্বা এবং ওজন প্রায় ১৭০০ গ্রাম। তবে আকারে বড় হলেও গন্ধে ও গুণে অন্য অনেক জাত হতে এর স্থান বেশ নীচে। বিখ্যাত কয়েকটি জাত হল মহারাষ্ট্রের আলফেনসো, উত্তরপ্রদেশে ও বিহারের লেংড়া, দশেরী, দক্ষিণ ভারতের নীলম ও বেগুনফুলি, পশ্চিমবাংলার হিমসাগর, গোলাপখাস ও বোম্বাই প্রভৃতি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ভাল জাতের আম বিশেষ নেই। কোন কোন স্থানে হিমসাগর নাকি ভাল ফলন দেয়।

আম আমাদের দেশে এক মূল্যবান ফল। আমাদের দেশ হতে এই ফল ও ফলজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়। কাঁচা খাওয়া ছাড়াও আমসত্ব, আচার, জেলী, আমসী, রস, প্রভৃতি নানাভাবে আম খাওয়া হয়।

আম কাঠ বাদামী রঙের। ছোট গাছের কাঠ নরম হলেও পরিণত গাছের কাঠ বেশ শক্ত। সস্তার দরজা, জানলা প্রভৃতি তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে। এ ছাড়া নৌকা তৈরী, প্যাকিং বাক্স ও প্লাইউড তৈরীতে এর ব্যবহার হয়।

এর বাকল ও পাতা হতে এক প্রকার রঞ্জক পদার্থ পাওয়া যায়। পাতা ভাল পশুখাদ্য। আমের ভেষজগুণ কম নয়। কাঁচা আম চোখের প্রদাহে উপকারী। পাকা ফল রেচক ও যকৃতের রোগের উপকারী। পাতার ধোঁয়া হিক্কা প্রশমন করে। গাছের বিভিন্ন

অংশ রক্তপাত বন্ধ করে । শুকনো ফুলের ধোঁয়া মশা বিতাড়নে ফলপ্রদ। গাছের নানা অংশ সাপের বা বিছার কামড়ে উপকারী। কচি ডাল দাঁত মাজার জন্য ব্যবহৃত হয়।

উৎসবে আম পাতা দিয়ে বাড়ি ঘর সাজানো মাঙ্গলিক চিহ্ন হিসাবে মনে করা হয়। হিন্দুদের পূজা-পার্বণে আম্রপল্লব অপরিহার্য্য। আমের কাঠ পূজা- পার্বণে যজ্ঞ কাষ্ঠ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীনকাল হতে চাষ করা হলেও আমাদের দেশে ঠিকমত যত্ন করে আমের চাষ করা হয় না। আমাদের অনেকের ধারণা বড় গাছের চাষের জন্য মাঠের ফসলের মত যত্ন নিতে হয় না এবং এদের সার বা জলসেচেরও দরকার নাই। এজন্য পুরানো আম বাগানে সার ও জলসেচের অভাবে ফলনও ভাল হয় না।

আমের চাষে ভাল জাতের চারা নির্বাচন একান্ত প্রয়োজন। ভুল জাতের চারা লাগানোর ফল ধরা পড়বে বেশ কয়েক বছর পর যখন গাছে ফল ধরবে। আর একটা অসুবিধা হলো কলমের গাছের মৃত্যু হয় একটু বেশী। আম গাছে অনেক সময় পরগাছার আক্রমণও হয়, যা গাছকে নষ্ট করে দেয়। এসব অসুবিধা জয় করে একবার ফল দিতে আরম্ভ করলে অনেক বছর ফল পাওয়া যায়। ■

ভেলা

Semicarpus anacardium L.f.

গোত্র : Anacardiaceae

হিমালয়ের নিম্নাঞ্চল বিপাশা নদী হতে আসাম পর্যন্ত এই গাছের বাসভূমি। ভারতের বাইরে চট্টগ্রাম ও উঃ অষ্ট্রেলিয়ায় এই গাছ জন্মায়। ত্রিপুরার সদর ও সাব্রুম মহকুমার বিভিন্ন স্থানে এই গাছ পাওয়া যায়। আগরতলার অরুন্ধুতীনগরে এবং ইন্দ্রনগর আই টি আই চত্বরে এই গাছ রয়েছে।

মাঝারি আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ। বাকল ধূসর, কাল রঙের এবং তাতে লম্বা

ফাটল দেখা যায়। ফাটল হতে এক প্রকার সাদা রস বের হয়। পাতা একান্তর সরল, আকারে বড় এবং ডালপালার আগায় সন্নিবদ্ধ, পাতা বিডিম্বক আকৃতির হাল্কা চর্মবৎ, উপরের দিক গাঢ় সবুজ, নীচের দিক ধূসর বাদামী রঙের এবং রোমযুক্ত। পত্র বৃন্ত বেশ মজবুত।

ফুল আকারে ছোট। বৃন্তহীন। শাখার আগায় প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। কোন কোন সময় পুষ্পবিন্যাস পাতার কক্ষেও দেখা যায়। ফল ড্রুপ জাতীয়। তীর্যকভাবে আয়তডিম্বাকার। পাকা ফল কাল রঙের এবং উহা কমলা রঙের মাংসল উপবৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত।

কাপড় চিহ্নিত করার জন্য আগে ধোপারা এর ফলের ব্যবহার করত। বীজ হতে এক প্রকার তেল পাওয়া যায়।

ভেষজগুণ হিসাবে গর্ভপাতের জন্য এর বীজের ব্যবহার রয়েছে। বীজের তেল বাতরোগে মালিশের জন্য ব্যবহৃত হয়। গাছের বাকলের আঠা স্নায়ুদুর্বলতা ও যৌনরোগে উপকারী। ■

আমড়া

Spondias pinnata (L.f.) Kurz

সমার্থক নাম ঃ *S. mangifera*

গোত্র ঃ Anacardiaceae

গণ সূচক শব্দটি থিয়োফ্রিটাস কর্তৃক ব্যবহৃত গ্রীক শব্দ হতে এসেছে। pinnata শব্দটি পক্ষল পাতার কথা বুঝায়। এর সমার্থক নাম *Spondias mangifera* আমের মত ফল বিশিষ্ট গাছ বোঝাতে mangifera শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

এই বৃক্ষটি ভারত, শ্রীলংকা ও মালয় অঞ্চলের আদিবাসী। পশ্চিমবাংলার গ্রামে এই গাছ পাওয়া যায়। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামদেশে এই গাছ রয়েছে।

ছোট হতে মাঝারী আকারের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই পর্ণমোচী গাছটির বাকল

মসৃণ, ধোয়াটে রঙের এবং গন্ধযুক্ত। পাতাগুলি গাছের সবুজ শাখার আগায় সাজানো থাকে। পাতা যৌগিক, সচূড় পক্ষল। পত্রক ক্ষুদ্র বৃন্ত যুক্ত, শিরাবিন্যাস জালিকাকার, আস্তপ্রান্ত দেশীয়।

ফেব্রুয়ারী হতে মার্চে গাছ পত্রশূন্য হয়ে পড়ে এবং তখনই শাখার আগা হতে সবজে সাদা ফুলের গোছা বের হয়। ফুল পুং ও উভয় লিঙ্গ দুই প্রকারের। একই গাছে দু প্রকার ফুল দেখা যায়। ফল ড্রুপ জাতীয়। আকারে মোরগের ডিমের মত। পাকা ফল হলদে রঙের, আমের মত গন্ধ বিশিষ্ট। বেশী অম্ল স্বাদের জন্য কাঁচা ফল খুব কমই খাওয়া হয়। তবে চাটনী বা আচার হিসাবে তা খাওয়া হয়। কোন কোন জাতের আমড়া বেশ মিষ্টি। গরু, ছাগল, হরিণ প্রভৃতি এই ফল বেশী পছন্দ করে।

বাকল উদারাময়ে উপকারী। বাকল চূর্ণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে মালিশ করলে বাতে উপকারী। স্কার্ভি রোগে ফল এবং পাতার রস কোন ব্যথার উপকারী।

কাঠ কোন কাজে লাগে না। গাছ হতে আঠা পাওয়া যায়। কোথাও পাতা সব্জি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাটিং বা বীজ হতে বংশ বৃদ্ধি করা যায়। ■

ছাতিম

Alstonia scholaris (L) R.Br.

গোত্র ঃ Apocynaceae

অন্য নাম ঃ ছাত্তানি

বৈজ্ঞানিক নামের প্রথম শব্দটি এসেছে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক সি এলস্টনের নাম হতে, আর দ্বিতীয় শব্দটির অর্থ স্কুল সম্বন্ধীয়। অর্থাৎ এই গাছের কাঠ হতে ব্ল্যাক বোর্ড বা শ্লেট তৈরীর ঘটনা হতে। নামের দ্বিতীয় শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্য একটি মতও রয়েছে। বর্তমান কালে ছাত্রদের শিক্ষা শেষে যেমন বিশ্ববিদ্যালয় হতে উপাধি দেওয়া হয় প্রাচীন ভারতে সেরূপ ব্যবস্থা ছিল না। তখন গুরুগৃহে পাঠ শেষে উপাধিপত্রের প্রতীক হিসেবে নাকি একটি ছাতিম পাতা দেওয়া হত। ছাতিমের বৈজ্ঞানিক নামের দ্বিতীয় শব্দটি ঐ ঘটনার দ্যোতক।

ভারতের আদিবাসী এই বৃক্ষ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে পূর্ব ও পশ্চিম ঘাট পর্বতের আর্দ্র অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যায়। ভারত ছাড়া এই গাছ চীন, মালয় ও শ্রীলংকায়ও জন্মায়। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অনেক ছাতিম গাছ রয়েছে। আগরতলার কলেজটিলায় বেশ কয়েকটি বড় গাছ রয়েছে। বেশ লম্বা ও সুন্দর এই বৃক্ষের বাকল ধূসর রঙের এবং খসখসে। পত্রবিন্যাস আবর্তাকার। প্রতি পর্বে ৫-৭টি পাতা থাকে, এজন্য সংস্কৃতে একে সপ্তপর্ণী বলে। পাতার উপরের দিক গাঢ় সবুজ, নীচের দিক সাদা। সাদা বা হাল্কা সবুজ ফলগুলি গুচ্ছাকারে সাজানো। ফুলের একটা উগ্র মিষ্টি গন্ধ রয়েছে। অক্টোবর হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত গাছে ফুল ফোটে। কিছু দিনের মধ্যে সরু লম্বা ফলগুলি জোড়ায় জোড়ায় গাছ হতে ঝুলতে থাকে। বীজ চ্যাপ্টা এবং রোম যুক্ত।

এই গাছের কাঠ বেশ সাদা ও নরম তবে দীর্ঘস্থায়ী নয়। এ হতে প্যাকিং বাক্স, ব্ল্যাক বোর্ড প্রভৃতি তৈরী হয়।

এই গাছের বাকল ইংরেজীতে dita bark নামে পরিচিত এবং উহা নানা ভেষজ গুণ যুক্ত। জ্বর, হৃদরোগ, হাঁপানী, ক্ষত, কুষ্ঠ প্রভৃতিতে এর ব্যবহার রয়েছে।

পশ্চিম ভারতে এই গাছকে শয়তানের গাছ হিসাবে গণ্য করা হয়। সেখানকার কোন কোন আদিবাসী এই গাছকে এত ভয় করে যে, এর ছায়ার কাছেও যায় না। এজন্যই হয়ত এই গাছের ইংরাজী নাম Devil's tree. বীজ হতে সহজে গাছ জন্মায়। ■

টগর

Ervatamia coronaria (Jacq) Stapf.

সমার্থক নাম : *E. divaricata / Tabernamontana coronaria*

গোত্র : Apocynaceae

গণ সূচক শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। প্রজাতি সূচক শব্দের অর্থ মুকুটের মত, এতে ফুলের পাপড়ির বিশেষ ধরনের বিন্যাস বুঝায়।

গাছটি হিমালয়ের পাদদেশের আদিবাসী এবং পূর্ব হিমালয়ের নিম্নবর্তী অঞ্চলে একে প্রচুর দেখা যায়। ভারতের সর্বত্রই এই গাছের চাষ হয়ে থাকে। খোলা জায়গায় গাছটি ছোট ঝোপের মত দেখায়। ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামেবা শহরে সর্বত্র এই গাছ দেখা যায়।

গুল্ম জাতীয় গাছ, সাধারণতঃ এক বা দুই বছরে গাছে ফুল হয়। অনেক সময় গাছটিকে বহু বছর ধরে বাঁচতে দেখা যায় এবং এইরূপ অবস্থায় গাছটি ছোট আকারের বৃক্ষে পরিণত হয়। কাণ্ড বক্র, বাকল ধূসর রঙের। পাতা সরল, আকারে ছোট, সূক্ষ্মাগ্র। চক্‌চকে পাতাগুলি বিপরীতভাবে বিন্যস্ত।

ফুলের আকার বড়। দুটি ডালার সংযোগস্থলে পুষ্পগুচ্ছ জন্মায়। ফুলের পাপড়িগুলি নীচের দিকে নলাকারে যুক্ত। উপরের দিকে মুক্ত ও ছড়ানো। টগরের দুটি জাত রয়েছে। এদের মধ্যে একসারি পাপড়িযুক্ত গাছই বেশী দেখা য়ায়, যার দলমণ্ডল চক্রাকৃতি। একাধিক সারির পাপড়িযুক্ত গাছের পাতাগুলি আকারে একটু চওড়া এবং ফুলও আকারে বড়। প্রতি ফুল হতে দুটি শুটির মত বাঁকানো ফল হয়। ফলের বীজগুলি লাল বা কমলা রঙের শাঁসে ঢাকা থাকে। শীতের সময় ফল পাকে।

গরমের সময় ও বর্ষায় গাছে ফুল ফুটে। সাদা ফুল হতে রাতের বেলা একটা সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়।

কাঠ সাদা রঙের, বেশ শক্ত। তবে আকারে ছোট হওয়ায় তেমন কোন কাজে লাগে না। ফলের লাল রঙের শাঁস অনেক সময় সূতা ইত্যাদি রং করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ভেষজগুণ হিসাবে গাছের শেকড় পিত্তরোগে, মৃগী, পক্ষাঘাত ও বিছার কামড়ে উপকারী। কাঠ কয়লা চোখের প্রদাহে উপকারী। কোন কোন স্থানে চোখের যন্ত্রণা নিবারণে তরুক্ষীর মাথায় মাখা হয়। শেকড় দাঁতের ব্যাথা উপশম করে। কাটিং হতে সহজে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

কুরচি

Holarrhena antidysenterica Flem

গোত্র ঃ **Apocynaceae**

অন্যনাম ঃ কুটজ / কুইচ্চা

গণ সূচক *Holarrhena* শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ হতে এসেছে। Holos অর্থাৎ সম্পূর্ণ, arrhen অর্থাৎ পুরুষ, দুয়ে মিলে বোধ হয় গাছটির পুরুষালি চেহারার ইঙ্গিত; আর antidysenterica শব্দটি এর পেটের পীড়া উপশমকারী গুণ বোঝায়।

ভারতের আদিবাসী ছোট পর্ণমোচী এই বৃক্ষটি আমাদের দেশের সমতল অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে জন্মায়। কোন কোন স্থানে সুন্দর ফুলের জন্যও এর চাষ করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর কুরচি গাছ রয়েছে। আগরতলা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে এ গাছ অনেক রয়েছে। তবে জ্বালানী সংগ্রহকারীদের উপদ্রবে এ গাছ প্রায়ই বড় হতে পারে না। কলেজটিলা ও অন্যত্র দু-চারটি বড় গাছ দেখা যায়।

ছোট আকারের এই বৃক্ষের বাকল হাল্কা বাদামী রঙের। পাতাগুলি বেশ বড়, প্রায় বৃন্তহীন, বিপরীতভাবে বিন্যস্ত। সাদা সুগন্ধি ফুলগুলি শাখার আগায় গুচ্ছাকারে সাজানো। সরু লম্বা গোলাকার ফুলগুলি গাছের শাখা হতে ঝুলতে থাকে। বীজের প্রান্তে বাদামী রোমগুচ্ছ দেখা যায়।

শীতের শেষে গাছের পাতা ঝরে যায়। এপ্রিল মাস পর্যন্ত গাছ সাদা ফুলে ভরে উঠে। এই সময় গাছে নূতন পাতাও গজায়। জুলাই পর্যন্ত গাছে ফুল ফুটতে দেখা যায়। কোন কোন সময় সেপ্টেম্বর অক্টোবরে গাছে আবার ফুল ফোটে। জাত ভেদে ও ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ফুল ফোটার সময় বিভিন্ন হতে পারে। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে রামগিরি পর্বতে আষাঢ়ের প্রথম দিনে কুটজ কুসুমর (কুরচি ফুলের) অর্ঘের উল্লেখ পাই। অর্থাৎ বিভিন্ন ঋতুতে কুরচির ফুল ফোটা সেই প্রাচীন কালেও দেখা যেত।

এর কাঠ সাদা ও নরম। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন খেলনাপাতি, ছোট বাক্স, কলমদানী, চিরুনী, ফটোর ফ্রেম ইত্যাদি তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে। এই কাঠ হতে তৈরী পুতির মালা কোন কোন স্থানে গলায় পরার জন্য ব্যবহৃত হয়। কুরচির রোমযুক্ত বীজ বালিশ তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। পাতা উত্তম পশুখাদ্য। ফুল দেবতার পূজা ও সাজানো

কাজে ব্যবহৃত হয়। এ রাজ্যে চৈত্র সংক্রান্তির দিন গরুর গলায় কুরচি ফুলের মালা দেওয়া হয়। ছোটনাগপুরে কুরচি কাঠের ছাই রঙ করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

কুরচি আমাদের দেশের একটি দামী ভেষজ উদ্ভিদ। এ গাছের বাকল, পাতা ও বীজ ঔষধি গুণযুক্ত। অ্যামিবাঘটিত আমাশয় রোগে এর বাকল বেশ উপকারী। এছাড়াও নানা চর্ম রোগ ও প্লীহা রোগে এর ব্যবহার রয়েছে। পাতা বায়ুনালীর প্রদাহ, কটিবাত, ফোড়া ও ক্ষত রোগে উপকারী। বীজ হাঁপানী, শূল বেদনায় ও জ্বরে উপকারী। এই গাছের বিভিন্ন অংশ সাপ ও বিছার কামড়ের প্রতিকারে ব্যবহৃত হয়।

খালি জায়গায় সহজে এর গাছ হওয়ায় বন সৃজনে এর ভূমিকা রয়েছে। গাছের কাটা গুড়ি হতে সহজে নূতন গাছ জন্মায়। বীজ হতেও বংশবৃদ্ধি করা যেতে পারে। ■

কাঠগোলাপ

Plumeria rubra L.var. *acutifolia* (Poir.) Bailey.

সমার্থক নাম ঃ *P. acutifolia*

গোত্র ঃ Apocynaceae

অন্য নাম ঃ গোলাচী
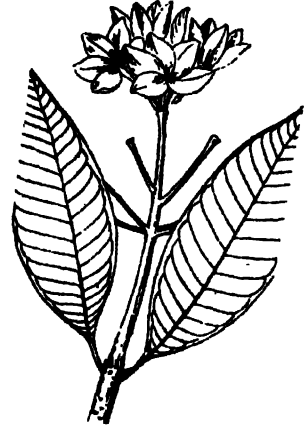
বৈজ্ঞানিক নামের প্রথম শব্দটি এসেছে ফরাসী বিজ্ঞানী চার্লস প্লুমিয়ারের নাম হতে, rubra শব্দের অর্থ লাল, acutifolia দ্বারা ছুঁচালো পাতা বোঝায়।

Plumeria গণভুক্ত বেশ কয়েকটি প্রজাতি রয়েছে। আবার প্রতিটি প্রজাতির নানা জাতের চাষ আজকাল হয়ে থাকে। এজন্য এদের সঠিক সনাক্তকরণ একটু কষ্টকর। তবে চাষ করা বিভিন্ন জাতের কাঠ গোলাপ প্রধানতঃ rubra প্রজাতিরই রকমফের। এদের কারো ফুল লাল, কারো ফুল হল্‌দেটে সাদা।

এই গাছটির আদি বাসস্থান মেক্সিকো ও গুয়াটেলমালা। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশের সর্বত্র জন্মায়। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে লাল বা হল্‌দেটে সাদা কাঠগোলাপ ফুল রয়েছে। আগরতলায়ও অনেকের বাড়ীতে রয়েছে এই গাছ।

ছোট আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ। ডালপালা ও পাতায় রয়েছে প্রচুর তরুক্ষীর।

ডাল বেশ নরম। পাতা আকারে বড় ভল্লাকৃতি, উভয় প্রান্ত ক্রমশঃ সরু। পাতাগুলি ডালার আগায় সর্পিলাকারে ঘন সন্নিবিষ্ট। ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত গাছের সব পাতা ঝরে যায়, মার্চের শেষে নতুন পাতা গজাতে আরম্ভ করে।

পত্রহীন গাছে মার্চ মাস হতে ফুল ফুটতে আরম্ভ করে। ফুলের পাপড়ি মোম সাদা তবে ভেতরের দিক একটু হল্‌দেটে এবং বাইরের দিক কিছুটা গোলাপী আভাযুক্ত। সুন্দর গন্ধযুক্ত ফুলের গোছা ডালের আগায় মঞ্জুরীদণ্ডে সোজাভাবে বিন্যস্ত থাকে। বিভিন্ন জাতের উপর নির্ভর করে ফুলের রঙে রকমফের দেখা যায়। প্রায় অক্টোবর পর্যন্ত গাছে ফুল ফোটে। পূজার জন্য এই ফুলের বেশ কদর রয়েছে। এ রাজ্যে এর ফল হয়না।

কাঠ গোলাপের কাঠ বেশ নরম। সাদা রঙের। ড্রাম তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে। এই গাছ ভেষজগুণেও সমৃদ্ধ। মূলের ছাল রেচক। পাতার পুলটিশ ফোলায় উপকারী। তরুক্ষীর বাত উপশম করে। গাছের ছাল জ্বর নাশক ও উদরাময়ে উপকারী।

বর্ষায় ডাল লাগালে তা হতে সহজে নূতন গাছ জন্মায়। ডাল কেটে সঙ্গে সঙ্গে না লাগিয়ে কয়েকদিন রাখার পর লাগালে ভাল ফল পাওয়া যায়। যে কোন মাটিতে এই গাছ জন্মায় এবং এর বিশেষ কোন যত্ন নিতে হয় না। সাদা কাঠ গোলাপ - *Plumeria alba.* alba শব্দের অর্থ সাদা। সাধারণ কাঠ গোলাপের তুলনায় এর পাতা ছোট এবং মঞ্জুরী দণ্ড পাতা হতে অনেক লম্বা। ফুল একেবারে সাদা।

এ গাছেরও আদি বাসস্থান মেক্সিকো। আমাদের দেশে বিভিন্ন স্থানে এর চাষ হয়। আগরতলার কলেজটিলার কলেজ চত্বরে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের পুরানো বাগানে এর একটি গাছ রয়েছে। ■
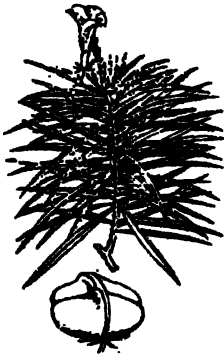
কল্‌কে

Thevetia peruviana (Pers.) Merr.

সমার্থক নাম ঃ *T. nerifolia.*

গোত্র ঃ Apocynaceae

অন্য নাম ঃ হল্‌দে করবী

Thevetia শব্দটি এসেছে ফরাসী দেশীয় পাদ্রি এন্ড্রিথিরেটের নামানুসারে। peruviana অর্থ পেরু দেশ জাত। nerifolia অর্থ সরু পাতা।

দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী এই গাছটি আমাদের দেশের সমতল ভূমিতে প্রায় সর্বত্র বাগানে লাগানো হয়। আমাদের দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে এই গাছ বেশ ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। ত্রিপুরার যত্রতত্র এই গাছের দেখা পাওয়া যায়। অনেকে একে করবী নামে ডাকলেও আসল করবীর সঙ্গে এর পার্থক্য রয়েছে। করবীর ফুল লাল বা সাদা গোছা বাঁধা, যা দূর হতে দেখলে গোলাপের গোছা বলে মনে হয়। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Nerium indicum.*

কল্‌কে ছোট বৃক্ষ বা বড় গুল্ম জাতীয় গাছ। এর বাকল ধূসর বাদামী রঙের এবং চক্‌চকে। সরু পাতাগুলি প্রায় বৃন্তহীন এবং ডালার আগার দিকে সর্পিলাকারে সাজানো। ফুল হলদে, সাদা বা গোলাপী আভাযুক্ত। পাপড়িগুলি যুক্ত, ফানেল আকৃতির। ফল মাংসল, বেরী জাতীয়। কাঁচায় সবুজ, পাকলে কাল্‌চে রঙের হয়।

ফুলের জন্য এই গাছ লাগানো হয়। শীতের অল্প কিছুদিন ছাড়া প্রায় সারা বছরই এতে ফুল ফোটে। পরিণত গাছের কাঠ মোটামুটি শক্ত হলেও বিশেষ কোন কাজে ব্যবহৃত হয় না। এর বীজ হতে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়, যা প্রদীপ জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করা যায়।

এই গাছের তরুক্ষীর বিষাক্ত। বীজও বিষাক্ত। অনেক সময় বিভিন্ন পশু মারার জন্য এর ব্যবহার দেখা যায়। আগে যখন কীটনাশক এখনকার মত সহজলভ্য ছিল না, তখন গ্রামদেশে আত্মহত্যার জন্য কল্‌কের বীজ ব্যবহার করা হত।

বীজের তৈল ও গাছের বাকলের কিছু ভেষজগুণ রয়েছে। তবে বিষাক্ত হওয়ায় খুব সাবধানতা সহকারে এদের ব্যবহার করা উচিত। বীজ হতে সহজে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

ফুলাম

Wrightia coccinea (Roxb.) Sims

সমার্থক নাম : *Nerium coccinea*

গোত্র : Apocynaceae

গণসূচক নামটি এসেছে স্কটল্যাণ্ডের উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক রাইটের নাম হতে। প্রজাতি সূচক শব্দের অর্থ লাল, যা এই গাছের লাল রঙের ফুলের জন্য দেওয়া হয়েছে।

মাঝারি আকারের এই বৃক্ষ জাতীয় গাছটির আদি বাসস্থান সিকিম, পূর্ববাংলা ও মালয়। সুন্দর লাল ফুলের জন্য আমাদের দেশে কখনো কখনো বাগানে একে লাগানো হয়। ত্রিপুরার জম্পুই পাহাড়ে এই গাছ পাওয়া যায়।

বৃক্ষটির কাণ্ড বেশ সরল। বাকল মসৃণ ছাই রঙের। পাতা সূক্ষাগ্র, অনেকটা সরু আকারের যা ছোট শাখায় বিপরীত পত্রবিন্যাসে সাজানো থাকে। ফুল মোটামুটি বড় আকারের। লাল রঙের ফুলগুলি গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় শাখার আগায় জন্মায়। প্রতি ফুলে পাঁচটি চওড়া মাংসল ভারী পাপড়ি থাকে, যার গোড়ার দিক একত্র হয়ে নলাকার গঠন তৈরী করে। পুংকেশর পাপড়ির নলাকার অংশ হতে লম্বা। প্রতি ফুল হতে এক জোড়া লম্বাটে সবুজ ফল জন্মায়। মার্চ-এপ্রিলে গাছে ফুল হয়। ফুলের একটা বিশ্রি গন্ধ রয়েছে। সম্ভবতঃ মাছি এর পরাগায়ণে সাহায্য করে।

কাঠ সাদা রঙের, শক্ত কিন্তু বেশ হাল্‌কা। পাল্‌কি তৈরীতে এই কাঠের ব্যবহার হতো। এছাড়া যেসব ছোট ছোট কাজে হাল্‌কা অথচ মজবুত কাঠের দরকার তাতে এর ব্যবহার দেখা যায়। সুন্দর ফুলের জন্যও কখনো কখনো একে বাগানে লাগানো হয়। ■

আকন্দ

Calotropis gigantea (L.) Dryand.

সমার্থক নাম ঃ *Asclepias gigantea*

গোত্র ঃ Asclepiadaceae

অন্য নাম ঃ শ্বেত আকন্দ

গণসূচক শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ হতে এসেছে। "Kalos" অর্থ সুন্দর, "tropis" অর্থ তরীফল বা নৌকার নীচের দিক। এ দিয়ে ফলের আকৃতিকে বুঝায়। প্রজাতিসূচক শব্দের অর্থ দৈত্যাকৃতি বা অস্বাভাবিক উঁচু। ভারতের সমতল ভূমি, বিশেষ করে শুষ্ক

অঞ্চল গাছটির আদি বাসস্থান। ত্রিপুরায় বিভিন্ন স্থানে রাস্তার পাশে, পতিত জমিতে এই গাছ প্রচুর দেখা যায়।

বড় গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ জাতীয় গাছ। এর ডালপালা ও পাতা তুলার মত নরম রোমে ঢাকা। বিডিম্বক, আয়তাকার, ভারী পাতাগুলি বিপরীত পত্রবিন্যাসে সাজানো। পত্রমূল খাঁজযুক্ত এবং পত্রবৃন্ত প্রায় অনুপস্থিত । ফুল নিয়ত পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। সাদা বা হাল্কা বেগুনী রঙের। প্রতি ফুল হতে এক জোড়া বাঁকা ফলিকল জাতীয় ফল জন্মায়। ফলে অসংখ্য বীজ থাকে, চ্যাপ্টা বীজের সরু প্রান্তে এক গোছা সাদা রোম থাকে যা বীজ বিস্তারে সহায়তা করে। প্রায় সারা বছর গাছে ফুল হয়।

অনেক সময় সাদা এবং হাল্কা বেগুনী ফুলযুক্ত গাছ একই স্থানে দেখা যায়। তবে সাদা ফুলের গাছ আকারে একটু ছোট হয়। আকন্দ গাছ আমাদের নানা উপকারে লাগে। তরুক্ষীর হতে গাটাপার্চা জাতীয় বস্তু তৈরী করা যায়। কিন্তু উহা বিদ্যুৎ পরিবাহক এজন্য বিদ্যুৎবাহী তার তৈরীতে এর ব্যবহার সম্ভব নয়। তরুক্ষীর হতে হল্‌দে রঙ পাওয়া যায়, যা চামড়া রং করার জন্য ব্যবহৃত হয়। গাছের বাকল হতে পাওয়া তন্তু ধনুকের গুণ, মাছ ধরার জাল প্রভৃতি তৈরীতে উপযোগী। কোন কোন অঞ্চলে এই গাছের ডালা দাঁত মাজার কাজে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের ভেষজগুণ কম নয়। গাছের বাকল ও শিকড়ের রস রেচক ও বমনকারক এবং অনেক প্রকার চর্মরোগে এর ব্যবহার রয়েছে। ফুল যকৃতের পীড়া, হাঁপানী, স্ফীতি, জ্বলন প্রভৃতিতে উপকারী। এছাড়া ইঁদুরের কামড়েও এর ব্যবহার রয়েছে। হাত-পা ফোলা, গাঁটের ব্যাথা ইত্যাদিতে আকন্দ পাতার সেক বেশ উপকারী। বিভিন্ন প্রকার বাতের ব্যাথায় এই পাতার ব্যবহার অনেক দেখা যায়। তরুক্ষীর দাঁতের যন্ত্রণায় উপকারী।

ভারতের কোন কোন অঞ্চলে এর পাতা জমিতে সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই পাতা প্রয়োগে লবণাক্ত জমির লবণের পরিমাণ হ্রাস পায়।

আকন্দ ফুল বিভিন্ন উৎসব ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন অঞ্চলে চৈত্র সংক্রান্তির দিন গরুর গলায় এই ফুলের মালা দেওয়া হয়। শিব ঠাকুরের নাকি এই ফুল বেশ প্রিয়। তাই শিব পূজার জন্য অনেকে ধুতুরা ও আকন্দ ফুল সংগ্রহ করেন। কোন কোন স্থানে গণেশ চতুর্থীর সময় গণেশের পূজায় এ ফুলের মালা ব্যবহার করা হয়। ■

কদম

Anthocephalus chinensis
(Lamk.) A. Rich.

সমার্থক নাম ঃ *A. indicus/A. cadamba/Nauclea cadamba*

গোত্র ঃ Rubiaceae

অন্য নাম ঃ কদম্ব
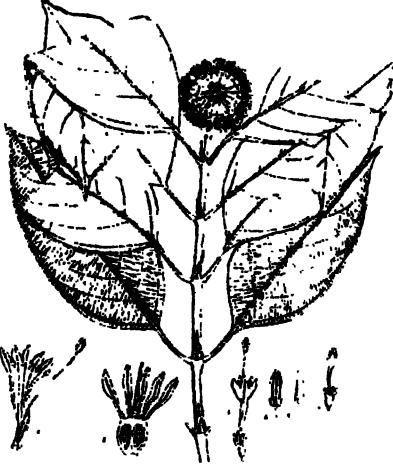
গণসূচক শব্দটি এসেছে দুটি গ্রীক শব্দ হতে। "anthos" অর্থ ফুল, "Kephalos" অর্থ মুণ্ডক, দুয়ে মিলে গোলাকার মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাসের কথা বোঝায়। প্রজাতি সূচক শব্দে গাছটির আদি বাসভূমির কথা বুঝায়।

চীন, ভারত ও মালয়ের উষ্ণ অঞ্চলে এই বৃক্ষটির আদি বাসস্থান। হিমালয়ের দক্ষিণ অঞ্চলে নেপাল হতে বার্মা পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই একে দেখা যায়। পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরায় এই গাছ লাগানো হয়, তবে অনেক সময় বুনো অবস্থায়ও এই গাছ জন্মায়। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই গাছ রয়েছে। আগরতলা শহরেও অনেক জায়গায় কদম গাছ লাগানো হয়েছে।

লম্বা বৃক্ষজাতীয় গাছ। কাণ্ড সরল, অনুভূমিক ডালাগুলি কিছুটা নীচের দিকে ঝুলে থাকে। বাকল লম্বা ফাটলযুক্ত। পাতা প্রতিমুখ পত্রবিন্যাসে সাজানো। অগ্রভাগ ছুঁচালো, উপরের দিক গাঢ় সবুজ, নীচের দিক হাল্কা সবুজ এবং মসৃণ রোম যুক্ত।

জুন হতে আগষ্টে গাছে ফুল হয়। ছোট ছোট সুগন্ধি ফুলগুলি গোলাকার মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। পুষ্পবিন্যাসগুলি শাখার আগায় ক্ষুদ্র বৃন্ত দিয়ে সাজানো। পুষ্পবিন্যাসগুলি শাখার আগায় ক্ষুদ্র বৃন্ত দিয়ে যুক্ত। বৃতি হাল্‌কা সবুজ বা ক্রীম রঙের। পাপ্‌ড়ি অনেকটা কমলা রঙের। সাদা গর্ভমুণ্ডের জন্য ফুটন্ত ফুলকে সাদাটে দেখায় ছোট ছোট ফলগুলি মাংসল পুষ্পাক্ষের সঙ্গে জুড়ে গুচ্ছ ফলের সৃষ্টি করে। বর্ষার শেষে ফল পাকে। পাকা ফল বাদামী বা হল্‌দেটে।

সরল কাণ্ডের এই ছায়াতরুটি রাস্তার ধারে লাগানো যেতে পারে। শোভাবর্দ্ধক উদ্ভিদ হিসেবে এর কদর রয়েছে। বর্ষার কদম ফুল কবি মনকেও আলোড়িত করে। প্রসাধনে কদম কেশরের ব্যবহারের কথা কাব্য ইত্যাদিতে দেখা যায়।

ফল টক স্বাদযুক্ত। কাঁচা বা রান্না করে খাওয়া যায়। তবে সহজে হজম হয় না। বিভিন্ন প্রাণী একে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। কাঠ সাদা নরম ও ভঙ্গুর প্রকৃতির। নানা প্রকার প্যাকিং বাক্স ও খেলনা ইত্যাদি হাল্‌কা সামগ্রী তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে। কাগজের মণ্ড শিল্পেও এই কাঠ ব্যবহৃত হয়। পাতা পশু খাদ্য। ভেষজগুণ হিসেবে বাকল টনিক গুণযুক্ত এবং জ্বরে উপকারী।

কদমের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সর্ম্পকের কথা বিভিন্ন পুস্তক ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ছোট চারার পাতা পরিণত গাছের চেয়ে অনেক বড় হয়। প্রথম দিকে গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে। ■

গন্ধরাজ

Gardenia jasminoides Ellis

সমার্থক নাম ঃ *G. florida*

গোত্র ঃ Rubiaceae

গণসূচক নাম এসেছে ক্যারলিনার ডঃ আলেকজেণ্ডার গর্ডনের নাম অনুসারে। প্রজাতি সূচক নামের অর্থ এর ফুল জেশমিন বা যুঁই ফুলের মত সুগন্ধ যুক্ত। ফ্লোরিডা শব্দে প্রচুর ফুল ফোটা বোঝায়।

গন্ধরাজ চীন বা জাপানের আদিবাসী। বর্তমানে উষ্ণমণ্ডলের বিভিন্ন দেশে এর চাষ হয়ে থাকে। ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র এই গাছের চাষ হয়ে থাকে। এখানে এটি একটি সুপরিচিত গাছ।

চিরসবুজ বড় জাতের গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ জাতীয় গাছ। অনেক সময় ঝোপের মত দেখায়। গাঢ় সবুজ রঙের পাতাগুলি প্রায় বৃন্তহীন দুইটি করে প্রতিমুখ বিন্যাসে বা তিনটি করে আবর্ত বিন্যাসে ডালায় সাজানো থাকে। পাতার উপরের দিকের চওড়া অংশ হতে অগ্রভাগ ও বোঁটার দিক ক্রমশ সরু। স্পষ্ট মধ্য শিরা হতে বিশ জোড়া পর্যন্ত উপশিরা বের হতে দেখা যায়। কচি পাতা ও ডালা হতে রজন জাতীয় পদার্থ বের হওয়ায় এদের

চক্চকে দেখায়।

প্রশাখার আগার দিকে পাতার মধ্যে বড় সাদা ফুলগুলি ছোট বোঁটার উপর জন্মায়। প্রতি ফুলে অনেক পাপড়ি থাকে। পাপড়িগুলির নীচের দিক জুড়ে নলাকার গঠন তৈরী করে। ফল মাংশল বেরী জাতীয়। তবে এই অঞ্চলে গন্ধরাজ গাছে ফল হতে দেখা যায় না।

সুগন্ধি ফুল বিশিষ্ট এই গাছ আমাদের বেশ পরিচিত। ফুল ফোটার সময় সাদা রঙের থাকে, যা ক্রমশ ক্রীম ও পরে হলদে রঙে পরিবর্তিত হয়। সাধারণতঃ বসন্ত ঋতুতে গাছে ফুল ফোটে তবে কোন কোন জাতে শীত ছাড়া প্রায় সারা বছর অল্পবিস্তর ফুল ফুটতে দেখা যায়। দেবতা পূজায় ফুলের ব্যবহার হয়ে থাকে।

ভেষজ গুণ হিসেবে কঙ্কণ উপকূলের অধিবাসীরা মাথাধরার উপশমের জন্য এর শেকড় ঘসে প্রলেপ হিসেবে ব্যবহার করে। হিষ্টিরিয়া রোগে শেকড়ের রস খাওয়ানো হয়। জাপানে এই গাছের বাকল ও ছাল কাপড় রাঙানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। কাটিং হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়।

ত্রিপুরায় গন্ধরাজ বাদে *Gardenia*-র আরো দুইটি প্রজাতি পাওয়া যায়। *G. coronaria* ইহাও গন্ধরাজ নামে পরিচিত। পাতা দীর্ঘাগ্র। ফুল একসারি পাপড়ি যুক্ত। ফল শিরাল। শোভাবর্দ্ধক উদ্ভিদ হিসাবে কোন কোন সময় চাষ করা হয়। সিপাহীজলা অঞ্চলে এই গাছটি রয়েছে।

G. resinifera ছোট বৃক্ষ জাতীয় গাছ। পাতা উপবৃত্তাকার। ফল শিরাযুক্ত নয়। এই গাছ হতে পাওয়া রজন জাতীয় পদার্থ চর্মরোগে উপকারী। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় এই গাছ রয়েছে। ■

ঝাড় ফানসু

Kigelia pinnata (Jacq) Dc. Prodr.

গোত্র ঃ Bignoniaceae

অন্য নাম ঃ শশা বৃক্ষ

নামের প্রথম শব্দটি এসেছে এই গাছের আদি বাসস্থান আফ্রিকার স্থানীয় নাম হতে। আর পক্ষল যৌগিক পাতার জন্য Pinnata শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

এই বৃক্ষটি আফ্রিকার মোজম্বিক ও অন্য উষ্ণ মণ্ডলের আদিবাসী। কথিত আছে, জলে ভাসতে ভাসতে এই গাছের একটি ফল বোম্বাই উপকূলে পৌছায়। ঐ ফল হতে ভারতে প্রথম গাছ হয়। আজকাল ভারতের বিভিন্ন গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে এই গাছ দেখা যায়। ত্রিপুরার আগরতলা শহরে আখাউড়া রোডে মন্ত্রী অফিসের উল্টোদিকে কয়েকটি গাছ রয়েছে।

মাঝারি হতে বড় বৃক্ষ জাতীয় এই গাছগুলি চিরসবুজ। গাছের গুড়ি বেশী লম্বা হয় না। গাছের উপরটা ছড়ানো ডালপালা নিয়ে অনেকটা গোলাকার। যৌগিক পক্ষল পাতাগুলি শাখার আগায় বিপরীতভাবে বিন্যস্ত।

ফুল বেশ বড়, অনেকটা পেয়ালা আকৃতির। নানা বর্ণের ছাপযুক্ত গাঢ় বেগুনী রঙের ফুলগুলি লম্বা দোদুল্যমান রেশিম পুষ্পবিন্যাসে সাজানো, দেখতে মনে হয় যেন একটি ঝাড়বাতি দুলছে। ফুল ফোটার সময় এপ্রিল -মে. ফুলের একটা বিশ্রী গন্ধ রয়েছে। পচা মাংসের মত এই গন্ধে অনেক মাছি আকৃষ্ট হয় তবে বাদুর দ্বারা পরাগ সংযোগ হয়।

ফল বেশ বড়, ভারী। সসেজ বা খসখসে বাকল শশার মত। লম্বা দড়ির মত বোঁটায় একটি বা কোন কোন সময় একাধিক ফল ঝুলতে থাকে। প্রতি ফলে অনেকগুলি বীজ থাকে।

রাস্তার ধারে বা পার্কে লাগানোর বেশ উপযুক্ত গাছ। আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে এই গাছকে পবিত্র বলে মানা হয় এবং এর নীচে অলৌকিক অনুষ্ঠান করা হয়। এই গাছের ডাল হতে তৈরী খুঁটিকে শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়ের বস্তু হিসাবে মানা হয়।

এর কাঠ বেশ শক্ত। ভালো জাতের নানা কাজে ব্যবহার করা যায়, তবে গুঁড়ি বেশী লম্বা না হওয়ায় গাছে খুব কম কাঠ পাওয়া যায়।

ভেষজ গুণের মধ্যে এর কাটা ফল আগুনে ঝলসে বাতের ব্যথায় বাহ্যিক প্রয়োগ করা হয়। বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। আর্দ্র-উষ্ণ মণ্ডলে এই গাছ ভালই বাড়ে। ■

আকাশ নিম

Millingtonia hortensis L.f.

গোত্র ঃ **Bignoniaceae**

অন্য নাম ঃ হিমঝুরি

নামের গণ সূচক শব্দটি এসেছে ইংরেজী উদ্ভিদবিজ্ঞানী T. Millington -এর নাম হতে। এই গণে একটিমাত্র প্রজাতি রয়েছে hortensis যার অর্থ বাগান সম্বন্ধীয়। প্রসঙ্গতঃ বাংলা নাম হিমঝুরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া।

এই গাছটির আদি জন্মভূমি বার্মা। প্রায় দুইশ বছর আগে গাছটি প্রথম ভারতে আসে কিন্তু এখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গাছটির দেখা পাওয়া যায় এবং স্থানীয় জলবায়ুর সঙ্গে তা ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। ত্রিপুরা রজ্যে এই গাছ বেশী দেখা যায় না, তবে আগরতলার কলেজটিলায় এর কয়েকটি গাছ রয়েছে।

সুন্দর, চিরহরিৎ এই লম্বা গাছটি ৬০ ফুটেরও বেশী উঁচু হয়। ডালপালা ততটা ছড়ানো না হয়ে প্রায় সোজাভাবে উপরের দিকে উঠে। বাকল হল্‌দেটে ধূসর রঙের কর্কের মত। পাতা যৌগিক দ্বি বা ত্রি পক্ষল। গাঢ় সবুজ রঙের পত্রকগুলি ৩.৭ সেমি লম্বা, অগ্রভাগ সরু। জানুয়ারী হতে মার্চের মধ্যে পুরানো পাতা ঝরে নূতন পাতা গজায়।

ফুল সুগন্ধযুক্ত। রুপার মতো সাদা, ডালার আগায় যৌগিক মঞ্জুরিতে বিন্যস্ত। নভেম্বর-ডিসেম্বর ও এপ্রিল জুনে ফুল ফোটে।

ফল সরু, চ্যাপ্টা, দু মাথা সুঁচালো। বীজ পাতলা পাখা যুক্ত। মার্চ মাস পর্যন্ত ফল পাকে। আমাদের দেশে ফল খুব কমই হয়। এর কাঠ খুবই নরম, হল্‌দেটে সাদা, ভালভাবে প্রক্রিয়াজাত করার পর আসবাব তৈরীতে ব্যবহার করা যায়। এর বাকল হতে নিম্নমানের কর্ক পাওয়া যায়।

নরম কাণ্ডের জন্য ঝড়ে গাছটির বেশ ক্ষতি হয়। তবে গাছের বৃদ্ধির হার দ্রুত হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে আবার পূর্বের চেহারা ফিরে পায়। দ্রুত বর্দ্ধনশীল এই গাছটি এ রাজ্যের জলবায়ুতে ভালই জন্মায়। ঝড়ের সম্ভাবনা কম এমন জায়গায় রাস্তার ধারে এ গাছ লাগানো যায়।

এখানকার জলবায়ুতে বীজ না হওয়ায় কাটিং, মূলের উর্ধ্বধাবক বা সাকার হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। যেখানে বীজ উৎপন্ন হয় সেখানে বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

সোনা

Oroxylon indicum (L.) vent

গোত্র ঃ Bignoniaceae

অন্য নাম ঃ সোনপাতি
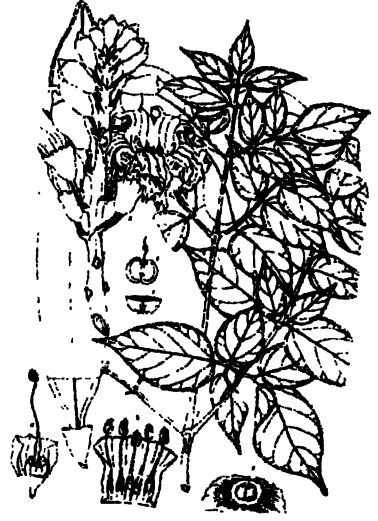
গণ সূচক শব্দটি এসেছে দুটি গ্রীক শব্দ হতে। oros অর্থ পর্বত, xylon অর্থ কাঠ, indicum অর্থ ভারতীয়। সব মিলে হল ভারতীয় বুনো কাঠ।

এই বৃক্ষটি ভারত, মালয়, শ্রীলংকা ও চীনের আদিবাসী। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বনাঞ্চলে এই গাছ জন্মায়। আগরতলার কলেজটিলায় বিজ্ঞান ভবনের পিছনে দু একটি গাছ রয়েছে।

পর্ণমোচী ছোট আকারের এই গাছটি দেখতে সুন্দর নয়। এর চারা ডালপালা না ছেড়ে প্রথমে বেশ কিছুটা লম্বা হয়। কিছুদিন পর লম্বা হওয়া বন্ধ হয়ে গুড়ি হতে ডালপালা বের হয় এবং গাছ ক্রমশঃ বড় হয়। পাতা বেশ বড়। ১.৫ মি হতে ২ মিটার লম্বা, যৌগিক, দ্বি বা ত্রি পক্ষল। দেখে মনে হয় যেন একটি শাখা। পাতাগুলি ডালার আগার দিকে জন্মায়। ডালের বা কাণ্ডের কাটা বাকল হতে সবুজ রঙের রস বের হয়। পত্রকগুলি বেশ বড় আকারের, ৭-১০ সেমি লম্বা কিনারা কিছুটা তরঙ্গিত এবং কচি অবস্থায় রোমশ। পাতা ঝরার সময় তাব বিভিন্ন অংশ আগা হতে ক্রমশঃ গোড়ার দিকে টুকরো টুকরো হয়ে ঝরে পড়ে।

মে হতে আগষ্ট মাসে গাছে ফুল আসে। ফুল আকারে বেশ বড়। শাখার আগায় ফুলগুলি রেশিম পুষ্পবিন্যাসে সাজানো থাকে। ফুল দুর্গন্ধযুক্ত। বৃতি পুরু ও চামড়ার মত। দলমণ্ডল ঘন্টাকৃতি। ফুল রাতে ফোটে এবং এর দুর্গন্ধ বাদুরকে আকৃষ্ট করে এবং তার মাধ্যমে পরাগায়ন হয়।

ফল চ্যাপ্টা, বেশ বড়, প্রায় ৩৫-৭০ সেমি লম্বা, ফল ফেটে পক্ষল বড় বীজগুলি বাতাসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফেব্রুয়ারী হতে মে মাস পর্যন্ত পত্রহীন গাছে কাল লম্বা ফলগুলি ঝুলতে দেখা যায়। এই গাছের বাকল ও ফল রংবন্ধক হিসাবে রঞ্জন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বড় বীজগুলি অনেক সময় টুপির আস্তরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সিকিমে এই বীজের মালা বৌদ্ধমন্দির অলঙ্করণে ব্যবহৃত হয়।

কাঠ হল্‌দেটে সাদা, নরম। বিশেষ কোন কাজে লাগে না। এই গাছের কিছু ভেষজগুণ রয়েছে। মূলের বাকল উদারাময় ও আমাশয়ে উপকারী। বাকল হতে তৈরী পাউডার ঘোড়ার পিঠের ক্ষত উপশম করে। বীজ রেচকগুণযুক্ত। দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায় । ■

টিউলিপ বৃক্ষ

Spathodia campanulata Beauu

গোত্র ঃ Bignoniaceae

অন্য নাম ঃ ঝর্ণা বৃক্ষ

Spathodia এই শব্দটি গ্রীক শব্দ Spathe হতে এসেছে ইহা চামচের আকারের বৃতিকে বুঝায়। Campanulata অর্থ ঘন্টাকৃতি (দলমণ্ডল), অর্থাৎ ফুলের আকৃতি হতে গাছের নাম দেওয়া হয়েছে। মধ্য আফ্রিকার আদিবাসী এই বৃক্ষ । যতদূর জানা যায় আঙ্গোলা হতে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীলংকায় এ গাছ প্রথম আসে। তার কিছুদিন পরই ভারতে এর আগমন ঘটে । সুন্দর ফুলের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই গাছ লাগানো হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও দিল্লীতে এর দেখা পাওয়া যায়। ত্রিপুরায় অল্প দু একটি গাছ রয়েছে। আগরতলা কলেজটিলায় কলেজ চত্বরে মনোবিজ্ঞান বিভাগের সামনে একটি বড় গাছ ছিল, এর কাণ্ডটি ভেতর হতে পচে যায়। সেই পুরানো গাছের মূলের উর্দ্ধধাবক বা সাকার হতে গোটা দুই নূতন গাছ হয়েছে।

আমাদের দেশে নূতন আসায় এই গাছের দেশীয় কোন নাম এখনো প্রচলিত হয়নি। ইংরেজী নাম fountai tree হতে ঝর্ণা গাছ নাম দেওয়া হয়েছে। এই গাছের ফুলের কলি নিঙড়ালে তা হতে ফিনকি দিয়ে বেশ জল বের হয়। এজন্যই এ নাম দেওয়া হয়েছে। আবার টিউলিপ ফুলের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্যের জন্য ইংরেজীতে একে tulip tree বলে। যার বাংলা রূপান্তর টিউলিপ বৃক্ষ।

এই বৃক্ষটি আকারে খুব বেশী বড় হয় না। এর কাণ্ড বেশ নরম। গাঢ় সবুজ পাতায় গাছ ঝেপে থাকে। কচি পাতার নীচের দিকে রোম থাকে। ত্রিপুরার জলবায়ুতে গাছটি চির সবুজ। ফুল আকারে বেশ বড় । কমলা বা গাঢ় লাল রঙের। দলমণ্ডল

ঘন্টাকৃতি। ডালের আগায় ফুলগুলি গুচ্ছাকারে সাজানো। ফুলের কলিগুলি চামড়ার মত বৃতি দিয়ে ঢাকা এবং তা জলীয় পদার্থে পূর্ণ। জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী হতে ফুল ফোটা শুরু হয়।

এর আদি বাসভূমিতে সহজে ফল হয় কিন্তু ত্রিপুরার জলবায়ুতে ফল প্রায় দেখা যায় না। জুন-জুলাই ফলের সময়। বীজ পক্ষল।

ছায়াতরু হিসাবে লাগানোর উপযোগী। কাঠ সাদা ও নরম, কাগজের মণ্ডের কাঁচামালের উপযোগী। আগুনে এই কাঠ সহজে না পোড়ায় কামারের হাপরের কিনারা এই কাঠে তৈরী করা হয়।

আফ্রিকার শিকারীরা এর ফলের নির্যাস বিষ হিসেবে তীরে মাখায়। বীজ কম হওয়ায় কাটিং বা মূলের উর্দ্ধধাবক হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। তবে গাছ বেশী বড় হলে গুড়ির মধ্যভাগ পচে যায় এজন্য সাবধান থাকা প্রয়োজন। ■

ধরমার

Sterospermum personatum (Hossk) Chatterjee

সমার্থক নাম ঃ *S. chelonoides*

গোত্র ঃ Bignoniaceae

অন্য নাম ঃ বরুলজাতা

এই গাছটি ভারত, বার্মা, শ্রীলংকা এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে পাওয়া যায়। ত্রিপুরার কুমারঘাট, শিলাছড়ি, জলায়া প্রভৃতি স্থানে এই গাছ রয়েছে।

বেশ বড় আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ। ডালপালা চারদিকে ছড়ানো অবস্থায় থাকে। বাকল বাদামী রঙের, কর্কের মত। পাতা যৌগিক। পত্রক সংখ্যা ৭-১১। পত্রকগুলি উপবৃত্তাকার বা অনেকটা আয়তাকার। ফুলগুলি শাখার আগায় প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। ঘন্টাকৃতি হল্‌দে পাপড়ির গলদেশের ভেতরের দিক বেগুনি রঙের। ফল ক্যাপসুল জাতীয়। ৪০-৫০ সেমি লম্বা, চতুষ্কোণে এবং পাকানো অবস্থায় থাকে। বীজ পক্ষল। কাঠ ধূসর রঙের, বেশ শক্ত। বিভিন্ন নির্মাণ কাজ ও আসবাব তৈরীতে এর ব্যবহার রয়েছে।

গাছের বিভিন্ন অংশ ভেষজগুণ বিশিষ্ট। শেকড়, পাতা ও ফুল জ্বরে উপকারী। মানসিক রোগে পাতার রস ফলপ্রদ। ■

বরমালা

Callicarpa arborea Roxb.

গোত্র : **Verbenaceae**

অন্য নাম : মাইফাইথিং

ভারতের পূর্ব হিমালয় ও আসাম অঞ্চল এই গাছের বাসভূমি। ভারতের বাইরে বার্মা, দঃ চীন, ভিয়েতনাম, ও মালয়ে এই গাছ দেখা যায়। ত্রিপুরার সর্বত্র বিশেষ করে যেখানে জুম চাষ হয় সেখানে এই গাছ রয়েছে।

চিরহরিৎ ছোট বা মাঝারি আকারের বৃক্ষ। বাকল ধূসর বা বাদামী রঙের, খসখসে এবং তাতে হাল্কা ফাটল থাকে। পাতা সরল, ৮-৩০ সেমি × ৩-১২ সেমি, ডিম্বাকার, কিনারা অখণ্ড, চর্মবৎ সুলাগ্র। নীচের দিগ রোমশ। ফুল বেগুনী রঙের, ছোট নিয়ত পুষ্প বিন্যাসে পাতার কক্ষে থাকে। ফল ড্রুপ জাতীয়, গোলাকার বেগুনী রঙের।

কাঠ হাল্কা বাদামী। মোটামোটি শক্ত। নানা কাজে ব্যবহারের উপযোগী। বাকল ভেষজগুণ যুক্ত। তিক্ত, টনিক ও হজমীগুণ বিশিষ্ট। বাকলের নির্যাস চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। ■

গামাই

Gmelina arborea Roxb.

গোত্র : **Verbenaceae**

অন্য নাম : গামার

নামের প্রথম শব্দটি এসেছে জর্মান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী J.G. Gemelin এর নাম হতে, arborea অর্থ বৃক্ষজাতীয়।

ভারত ও বার্মার আদিবাসী এই পর্ণমোচী বৃক্ষটি ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে বেশী পাওয়া যায়। ত্রিপুরা রাজ্যের বনাঞ্চলে এই গাছটির চাষ করা হয় এবং বুনো গাছও সেখানে রয়েছে। আগরতলা শহরে কলেজটিলায় এবং শহরের উপকণ্ঠে কোন কোন বাড়ীতেও গামার গাছ রয়েছে।

এই বৃক্ষটির গুড়ি বেশ সরল এবং তা হল্‌দেটে বাদামী বা সাদাটে বাকলে ঢাকা। গাছের আগায় বেশ ডালপালা থাকে। নমনীয় সরল তাম্বুলাকার পাতাগুলি বিপরীতভাবে বিন্যস্ত। বোঁটা বেশ লম্বা।
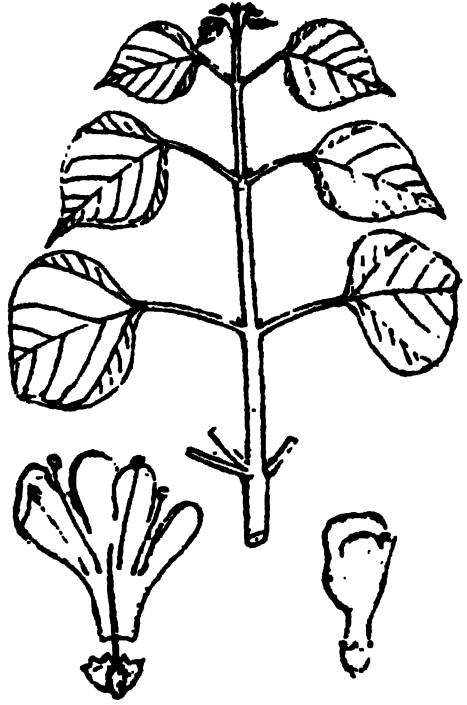
ডালার আগায় ফুলগুলি গুচ্ছাকারে সাজানো থাকে। রঙ হল্‌দেটে বাদামী, পাকা ফল কমলা বা হল্‌দে রঙের, রসালো। ফেব্রুয়ারী-মার্চে গাছে নূতন পাতা বের হয় এবং এই সময় গাছে ফুলও আসে। এপ্রিল হতে ফল পাকে। অনেক সময় গাছের সব পাতা ঝরে যাওয়ার আগেও ফুল আসতে দেখা যায়।

কাঠ হলদেটে বা বাদামী রঙের। কাঠ হাল্কা হলেও বেশ মজবুত। মসৃণ ও ঔজ্জ্বল্য বিশিষ্ট। এই কাঠে সহজে অলঙ্করণ করা যায়। বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুতে এর ব্যবহার রয়েছে। বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যে আসবাবপত্র এবং দরজা, জানালার পাল্লা তৈরীতে এই কাঠ বিশেষ উপযুক্ত। জলে দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় নৌকা তৈরীতে এর ব্যবহার হয়।

পাতা ভাল পশুখাদ্য। ফল মানুষের খাদ্যোপযোগী। গোন্দ ও অন্য উপজাতিরা এই ফল খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। কাঠের ছাই রঞ্জন শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

এই গাছের ভেষজগুণও রয়েছে। তলপেটের ব্যাথা, জ্বালা, জ্বর ইত্যাদিতে এই গাছের মূল উপকারী। কুষ্ঠ রোগে ফুলের ব্যবহার রয়েছে। ফল রক্তাল্পতা, কুষ্ঠ ও ক্ষতে উপকারী। পাতার রস ক্ষত নিরাময় করে। ফলের নির্যাস চুল বৃদ্ধির সহায়ক। বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

শিউলি

Nyctanthus arbortristis L.

গোত্র ঃ Vervenaceae

অন্য নাম ঃ শেফালী / সিঙ্গারা /হরসিঙ্গার

গণসূচক শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ হতে এসেছে "Nux" অর্থ রাত্রি, "anthos" অর্থ ফুল। দুয়ে মিলে অর্থ হল রাতে ফোটা ফুল। arbortristis অর্থ দুঃখী গাছ।

এই গাছের সুগন্ধি ফুল সন্ধ্যায় ফোটে এবং সারারাত সুন্দর মিষ্টি গন্ধ বিলিয়ে ভোরে ঝরে পড়ে। দিনের বেলা ফুলহীন গাছকে দুঃখী মনে হয়। প্রজাতি সূচক নামটি হয়ত এই ঘটনা দ্যোত্যক। কারো কারো মতে এই নামের সঙ্গে আমাদের দেশের বিষ্ণু পুরাণের একটি কাহিনী জড়িত আছে। কথিত আছে এক রাজার পারিজাতক নামে এক কন্যা সূর্যের প্রেমে পড়ে। কিন্তু তাদের ভালোবাসা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অল্প কিছুদিন পর সেই কন্যা সূর্য কর্তৃক পরিত্যাক্ত হয়ে আত্মহত্যা করে। মৃতার দেহাবশেষ হতে, শেফালী গাছের জন্ম হয়। এইজন্য এই গাছ সূর্যকে সহ্য করতে পারে না তাই ভোরেই তার সব ফুল ঝারিয়ে ফেলে। এই দুঃখজনক ঘটনা হতেই এই গাছের ইংরেজী নাম "Sad tree" -র উৎপত্তি।

এই বৃক্ষটি উত্তর, মধ্য ও পূর্বোত্তর ভারতের আদিবাসী। বর্তমানে ভারতের সর্বত্র এর চাষ হয়। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে বুনো অবস্থায় এই গাছ পাওয়া যায়। অনেক দিন আগে গিরিধিতে উশ্রী নদীর ধারে শেফালীর বন দেখেছিলাম। ত্রিপুরার সর্বত্র এই গাছ পাওয়া যায়। আগরতলায় অনেকের বাড়ীতে শেফালীর গাছ রয়েছে।

ছোট বৃক্ষজাতীয় এই গাছটিকে ৪ মিটারের বেশী উঁচু হতে দেখা যায় না। এর কচি ডালা চতুষ্কোণ যুক্ত। গাছটির বাকল খসখসে এবং শক্ত সাদা রোম যুক্ত। পত্র বিন্যাস বিপরীত। পাতা খসখসে। কিনারা খাঁজযুক্ত।

পাতার কক্ষ হতে ৩-৫টি পুষ্প যুক্ত পুষ্পগুচ্ছ জন্মায়। পুষ্পবিন্যাস নিয়ত। ফুল রাতে ফোটে। ফুলের গন্ধ পারিজাত *Cestrum nocturnum*-এর মত। এজন্য ভারতের কোন কোন এঞ্চলে একেও পারিজাত বলা হয়। ফুলের পাপড়ির গোড়ার দিক যুক্ত ও নলাকার, কমলা রঙের। উপরের দিক মুক্ত সাদা। সেপ্টেম্বর হতে ফুল ফুটতে থাকে,

তবে কোন কোন সময় আগেও ফুল ফোটে।

ফল ক্যাপসুল জাতীয়। গোলাকার, চ্যাপ্টা। শীতের শেষে ফল পাকে। গরমের সময় গাছে নূতন পাতা গজায়।

ফুলের পাপড়ির কমলা রঙের অংশ হতে পাওয়া রঞ্জক পদার্থ সিল্ক ও অন্য কাপড় রাঙানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে এই রঙ স্থায়ী হয় না। ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ পুরোহিতেরা তাদের কাপড় রং করার জন্য এদের ব্যবহার করেন। সৈয়দ মজতুবা আলির লেখায় পড়েছি সিলেট অঞ্চলে পোলাও রং করার জন্য শেফালীর শুকনো পাপড়ি ব্যবহার করা হয়।

কাঠ মোটামোটি শক্ত, তবে জ্বালানী হিসাবেই প্রধানতঃ এর ব্যবহার হয়। বাকল ট্যানিং-এ ব্যবহৃত হয়। খস্‌খসে পাতা অনেক সময় শিরিশ কাগজের পরিবর্তে কাঠ পালিশে ব্যবহার করা হয়। পাতা সব্জী হিসাবে খাওয়া হয়।

গাছটি ভেষজগুণযুক্ত। পাতা জ্বর, বাত, সায়াটিকায় উপকারী। ফুল চুলের টনিক তৈরীতে এবং বীজ চর্মরোগে উপকারী। বীজ হতে সহজে বংশবৃদ্ধি করা যায়। যে কোন মাটিতে এই গাছ জন্মায়। তবে ভাল ফুলের জন্য বেশী পুরানো গাছ না রেখে কয়েক বছর পর পর নূতন গাছ লাগানো উচিত। ■

গোহারা

Premna latifolia Roxb.

গোত্র : Verbenaceae

এই গাছটির বাসভূমি হিমালয়। পশ্চিমবাংলা, বাংলাদেশ ও ত্রিপুরা। রাজ্যের সদর বিভাগে বিভিন্ন স্থানে এই গাছ রয়েছে। আগরতলার কলেজটিলায় কলেজচত্বরে একটি বড় গাছ রয়েছে।

বড় আকারের বৃক্ষজাতীয় গাছ। বাকল কাল্‌চে রঙের। পাতা সাধারণতঃ ডিম্বাকৃতি, কখনোবা উপবৃত্তাকার। ৬.৫-১২.৫ সেমি. × ৭-৭.৫ সেমি.। সূক্ষাগ্র,নীচের দিগ নরম রোমে ঢাকা। ফুল সবুজাভ। শাখার আগায় যৌগিক নিয়ত পুষ্পবিন্যাসে সাজানো ফল ড্রুপ জাতীয়। কাল রঙের।

গাছের পাতা খাদ্যোপযোগী। কাঠ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। ভেষজ গুণ হিসাবে পাতা মূত্রবর্দ্ধক। শোথ রোগে এর ব্যবহার রয়েছে। বাকলের রস ফোড়ায় উপকারী। ■

সেগুন

Tectona grandis L.f.

গোত্র ঃ Verbenaceae

গণ সূচক শব্দটি গ্রীক শব্দ Tecton হতে এসেছে। যার অর্থ ছুতার। আর grandis শব্দের অর্থ বড়। অর্থাৎ দুয়ে মিলে ছুতারের কাজের উপযুক্ত বড় বৃক্ষ।

এই বৃক্ষটি ভারত, বার্মা, মালয় ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে বেশী পাওয়া যায়। পৃথিবীর সব চাইতে ভাল জাতের সেগুন পাওয়া যায় বার্মাতে। তারপরই মধ্যপ্রদেশের সেগুনের খ্যাতি। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সেগুন জন্মায়। ত্রিপুরার বনভূমিতে বিভিন্নস্থানে সেগুন বাগান রয়েছে। কোন কোন স্থানে রাস্তার ধারেও সেগুন গাছ লাগানো হয়েছে। আগরতলায় আখাউড়া রোড, আই. টি. আই. রোড, কলেজ রোড প্রভৃতির ধারেও কয়েকটি সেগুন গাছ রয়েছে। আজকাল কোন কোন বাড়ীতেও সেগুন গাছ দেখা যায়।

এই পর্ণমোচী বৃক্ষটি আকারে বেশ বড় হয়। পরিণত বৃক্ষ ৩০-৬০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। কচি ডালপালা চতুর্ধার বিশিষ্ট। পাতা সরল, বেশ বড় আকারের। বিশেষ করে চারা গাছে পাতার আকার অনেক বড় হয়। পত্র বিন্যাস রিপরীত। পাতা খস্‌খসে, উপরের দিক রোমহীন। কিন্তু নীচের দিক লাল্‌চে মৃদু রোমে ঢাকা।

সাদা রঙের ছোট ফুলগুলি যৌগিক মঞ্জুরীতে সাজানো। ফুলের বৃতিগুলি বেশ ছোট। কিন্তু এই বৃতিগুলি পরে বড় হয়ে নরম স্পঞ্জতুল্য ফলকে ঢেকে রাখে। জুন হতে আগষ্ট মাসে গাছে ফুল হয়। শীতের সময় ফল পাকে। নভেম্বর মাস হতে গাছের পাতা ঝরে যায়। ফুলের সঙ্গে গাছে নূতন পাতা আসে। পথের ধারে লাগানো গাছগুলি পাতা

ঝরার পর দেখতে বিশ্রী দেখায়।

আমাদের দেশের দারু উৎপাদনকারী বৃক্ষের মধ্যে সেগুনের স্থান সবার উপর। এর কাঠ বেশ শক্ত। কাঠে তৈল জাতীয় পদার্থ থাকায় ইহা দীর্ঘস্থায়ী। সেগুন কাঠ নানা শিল্পকর্মের উপযোগী। বিভিন্ন নির্মাণ কাজের জন্য আমাদের দেশে সেগুনের স্থান সবার উপর। বিভিন্ন আসবাব, রেলের স্লিপার, জাহাজ তৈরী, রেলের ওয়াগন প্রভৃতি নানা কাজে ব্যবহার রয়েছে।

পাতা হতে পাওয়া রং সূতা রাঙানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া পাতা হতে টোকা বা টুপির আকারের ছাতা, খাদ্য পরিবেশনের প্লেট ইত্যাদি তৈরী করা যায়। এছাড়াও নানা দ্রব্য প্যাকিং-এ এই পাতার ব্যবহার হয়।

এই গাছের কিছু ভেষজগুণও রয়েছে। মাথা ধরা, পিত্তাধিক্য, উদারাময় প্রভৃতিতে সেগুন কাঠ উপকারী। এই গাছের ছাই চোখের পাতা ফুলায় উপকারী। ফুল, বীজ ও মূল মূত্র বৃদ্ধিকারক।

বীজ হতে বংশবৃদ্ধি করা যায়। প্রথমে বীজতলায় চারা তৈরী করে নিয়ে এক বছর বয়স্ক চারা জমিতে লাগাতে হয়। ■

নিষিন্দা

Vitex negundo L.

গোত্র ঃ **Verbenaceae**

গণ সূচক নামটি এসেছে দক্ষিণ ইউরোপীয় একটি গুল্মের নাম হতে। negando নামটি খণ্ডিত পত্রযুক্ত ম্যাপেল জাতীয় গাছের নাম হতে এসেছে।

এই ভারতীয় গাছটি ভারত ও শ্রীলংকার উষ্ণ মণ্ডলে বিভিন্ন স্থানে জন্মায়। ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ রয়েছে। আগরতলা শহরে ও তার আশেপাশে এই গাছ প্রায়ই দেখা যায়।

এই গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ জাতীয় এই গাছটির বাকল মসৃণ, ধূসর বাদামী রঙের।

শাখা প্রশাখা লম্বা ও সরু। পাতা যৌগিক, করতলাকৃতি, পত্রকগুলি তীক্ষ্ণাগ্র। উহাদের উপরের দিক রোমশূন্য কিন্তু নীচের দিক ছোট সাদা রোমযুক্ত। কচি ডাল এমন কি ফুলের বোঁটাতেও রোম রয়েছে।

বেগুনী রঙের ছোট ফুলগুলি প্যানিকল পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। ফল ছোট, কাল রঙের, মাংসল, অনেকটা ডিম্বাকৃতি। প্রতি ফলে ৪টি বীজ থাকে। সম্পূর্ণ গাছে বিশেষ গন্ধ রয়েছে। এপ্রিল-মে মাসে ফুল ফোটে। অবশ্য অন্য সময়ও ফুল ফুটতে পারে।

কাঠ সাদা ধূসর রঙের, শক্ত। নানা কাজে ব্যবহার করা যায়। ডালপালা কঞ্চির বেড়া হিসাবে কাজে লাগে। ধান ইত্যাদি শস্য গোলাজাত করার সময় উপরে নিষিন্দা পাতা দিয়ে রাখলে পোকা মাকড়ের উপদ্রব হয় না। গাছটি ভেষজগুণযুক্ত। শেকড় টনিক গুণ সম্পন্ন ও জ্বরে উপকারী। পাতার পুলটিস মাথা ব্যথা ও সন্ধিবাতের ফোলায় উপকারী। পাতার ক্বাথ মস্তিষ্কের সর্দি ও জ্বরের উপশম করে। বুনো অবস্থায় এই গাছ অনেক পাওয়া যায়। এজন্য বংশবিস্তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে বীজ হতে বংশবৃদ্ধি হতে পারে। ■

আওয়াল

Vitex peduncularis Wall ex Schauuer

গোত্র ঃ Verbenaceae

অন্য নাম ঃ গোদা

এই গাছটি ভারতের পূর্ব হিমালয়, আসাম, বিহার, পশ্চিমবাংলায় পাওয়া যায়। ভারতের বাইরে বার্মা, ভিয়েতনাম ও মালয় এর বাসভূমি। ত্রিপুরার বনাঞ্চলে সর্বত্র এই গাছ রয়েছে।

বড় বৃক্ষ। কচি ডালপালা রোমশ। বাকল ভারী এবং ধূসর রঙের। গাছ হতে অসমান বাকলের টুকরা প্রায়ই খসে পড়ে। পাতা যৌগিক, ত্রিফলক। পত্রবৃন্ত পক্ষযুক্ত। পত্রক ভল্লাকার, এর নীচের দিগে ছোট হলদেটে গ্ল্যাণ্ড থাকে । ফুল হাল্‌কা হলদে

রঙের। পুষ্পবিন্যাস প্যানিকেল এবং তা পাতার চেয়ে লম্বা আকারের। ফল বিডিম্বাকার ড্রুপ জাতীয়। এর কাঠ ঘর তৈরীতে খুঁটি, বরগা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।

ভেষজগুণ হিসাবে পাতার নির্যাস কালাজ্বরে ও ম্যালেরিয়ায় উপকারী। বুকের ব্যাথায় এর বাকলের বহিঃপ্রয়োগ রয়েছে। ■

জারুল

Lagerstroemia speciosa L. Pers

সমার্থক নাম ঃ L. flosreginae

গোত্র ঃ Lythraceae

নামের প্রথম শব্দটি এসেছে সুইডেনবাসী বিজ্ঞানী Magnks v. lagerstrom এর নাম হতে। Spaciosa একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ সুন্দর। flosreginae এই ল্যাটিন শব্দের অর্থ রাণীর ফুল। সুন্দর ফুলের জন্য এই গাছের ইংরেজী নাম Queen's flower, আবার pride of India নামেও এই গাছ পরিচিত।

পশ্চিমঘাট পর্বতের আদিবাসী এই গাছ দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে চিরহরিৎ বনে বিশেষ করে নদীর ধারে আর্দ্র ভূমিতে জন্মায়। দক্ষিণ ভারত ছাড়া পশ্চিমবাংলা, উড়িষ্যা, আসাম ও ত্রিপুরায় এই গাছ দেখা যায় অনেক দিন ধরে সুন্দর ফুল হওয়ায় অনেক জায়গায় রাস্তার ধারে এই গাছ লাগানো হয়। আগরতলা বুদ্ধমন্দির হতে সার্কিট হাউস পর্যন্ত এবং উমাকান্ত স্কুলের সামনে রাস্তার ধারে এর কিছু গাছ রয়েছে।

এই পর্ণমোচী বৃক্ষটি পূর্ব ভারতের আর্দ্রভূমিতে বেশ বড় আকারের হয়। কিন্তু উত্তর ভারতের শুখা অঞ্চলে উহা ১৫-২০ ফুটের বেশী লম্বা হয় না। গাছের উপরটা ছড়ানো ডালপালা নিয়ে গোলাকার দেখায়। গাছের গুড়ি বেশী লম্বা হয় না। বাকল মসৃণ

ধূসর রঙের।

পর্ণমোচী বৃক্ষ হলেও সব পাতা একসঙ্গে ঝরে না যাওয়ায় একবারে নেড়া অবস্থায় এই গাছ প্রায় দেখা যায় না। পাতা সরল, বড় আকারের, মোটামুটি ১৫ সেমি লম্বা, এবং ৬-৮ সেমি চওড়া, আগা ক্রমশঃ সরু। সুস্পষ্ট মধ্যশিরার দুপাশে ১০-১২ জোড়া উপশিরা রয়েছে। ফেব্রুয়ারী-মার্চে পাতা ঝরার আগে তা লালচে বা হলদে হয়ে যায়। মে মাস পর্যন্ত ফুলের সঙ্গে গাছে নূতন পাতা দেখা দেয়।

ফুল প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। বেগুনী বা মভ রঙের। বৃত্যাংশ যুক্ত হয়ে একটি কাপের আকার ধারণ করে। পাপড়ির কিনারা ঝালরের মত ঢেউ খেলানো। ফল ছোট প্রায় গোলাকার, শক্ত, ক্যাপসুল জাতীয়। বর্ষায় ফল ধরা আরম্ভ হয়। পরের বছর ফুল আসার সময় পর্যন্ত তা গাছে থাকে। ফুল ফোটার সময় বর্ষাকাল হলেও অনেক সময় সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গাছে ফুল দেখা যায়। কাঠ হাল্কা লাল রঙের, বেশ শক্ত, দীর্ঘস্থায়ী। বাড়ী ঘর তৈরী, নৌকা তৈরী প্রভৃতি নানা কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়। জারুল উত্তর পূর্ব ভারতের একটি প্রধান দারু উৎপাদনকারী গাছ, তবে জারুল নাম দিয়ে অন্য অনেক বাজে কাঠ বাজারে বিক্রি হয়।

ভেষজগুণ হিসেবে এই গাছের শেকড় কষায়, উদ্দীপক ও জ্বর উপশমকারী। বাকল ও পাতা রেচক। বীজ নিদ্রাকারক। এই গাছের বিভিন্ন অংশ বহুমূত্র উপশমে ব্যবহৃত হয়। আন্দামানে এই গাছের ফুল ক্ষত নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। ছায়াতরু হিসাবে রাস্তার ধারে এই গাছ লাগানো যেতে পারে।

বীজ হতে সহজে বংশবিস্তার করা যায়। প্রথম বছর চারা খুব আস্তে বাড়ে, পরে বৃদ্ধির হার দ্রুত হয়। বীজতলায় চারা তৈরী করে এক বছর বয়স্ক চারা রোপণ করা উচিত। গাছ লাগানোর চার পাঁচ বছর পর ফুল ফুটতে আরম্ভ করে। দোঁয়াশ মাটিতে গাছ ভাল বাড়ে, গাছ ছায়া অপেক্ষা সূর্যালোক বেশী পছন্দ করে।

জারুল গাছ ছাড়াও L. agerstroemia গণভূক্ত অন্য একটি প্রজাতি L. indica এই রাজ্যে পাওয়া যায়। ছোট বৃক্ষ জাতীয় এই গাছটি শোভাবর্দ্ধক উদ্ভিদ হিসাবে অনেকে বাগানে লাগান। এর পাতা প্রায় ৫ সেমি লম্বা। ফুল সাদা গোলাপী বা মভ রঙের। অনুকূল জলবায়ুতে এটি ছোট বৃক্ষ হলেও এ রাজ্যে এটি গুল্ম জাতীয় গাছ। মে মাস হতে ফুল ফোটতে থাকায় একে May flower ও বলা হয়। ফুলের পাপড়ির বিচিত্রতার জন্য কোথাও উহা ফুরুস ফুল নামেও পরিচিত। এখানকার আবহাওয়ায় এর ফল খুব কম হয়, তবে কাটিং বা কলম হতে সহজে এর বংশবৃদ্ধি করা যায়। ■

গ্রন্থপঞ্জী

Benthol, A. P., 1946, *The Trees of Calcutta*, Thalker Spink & Co, Calcutta.

Chakraborty, N. K., *Tripurar Gachpala*, 1997-99, Dainik Sambad, Agartala.

Chopra, R. N., Nair, S. L. and Chopra, I. C., 1956, *Glossery of Indian Medicinal Plants*, C. S. I. R. New Delhi.

Dastur, J. F. 1962, *Useful Plants of India & Pakistan*, 6th ed, D. B Taraporevala & Sons Co.Ltd., Bombay.

Deb, D. B., 1981-83, *The Flora of Tripura State*, Vol 1-2, Today & Tomorrow Printers & Publishers, New Delhi.

Gamble, J. S., 1922, *Manual of Indian Timbers, Sampsons*, Low, Marston & Co. Ltd., London.

Kirtikar, K. R. and Basu, B. D., 1933, *Indian Medicinal Plants*, Vol I-IV, 2nd ed, Published by M. L. Basu, Allahabad.

Mc Cann, C., *Trees of India*, D. B. Taraporevala & Sons Co. Ltd, Bombay.

Randhawa, M. S., 1993, *Flowering Trees*, National Book Trust, New Delhi.

Santapau, H., 1966, *Common Trees*, National Book Trust, New Delhi.

Tropical Legumes, 1979, Nat. Aca, Sc, Washington DC.

Watt, G., 1889-1899, *A Dictionary of the Economic Products of India* , Vol. 1-6, Supdt. Govt. Printing, Calcutta.

Wealth of India, 1948-1976, Raw Materials, Vol, I-II, C.S.I.R., New Delhi.

উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নামের তালিকা

Abroma augusta
Acacia farnesiana
A. moniliformis
A. nilotica
Adenanthera pavonia
Aegle marmelos
Albizia lebbeck
A. lucida
A. procera
Alstonia scholaris
Anacardium occidentale
Annona reticulata
A. squamosa
Anogeissus acuminata
Anthocephalus chincnsis
Antidesma ghaesembilla
Aphanomixis polystachya
Aquilaria malaccensis
Ardisia solanacea
Artocarpus chaplasa
A. heterophy llus
A. lakoocha
Averrhoa bilimbi
A. carambola
Azadirachta indica
Barringtonia acutangula
Bauhinia purpurea
B. variegata
Bischofia javanica
Bixa orellana
Bombax ceiba
Brownia coccinea
Buchanania lanzan
Butea monosperma
Callicarpa arborea
Callistemon linearis
Calophyllum inophyllum
Calotropis gigantea
Careya arborea
Cassia fistula
C. nodosa
C. renigera
C. siamea
Casuarina equisetifolia
Cebia pentendra
Cinnamomum camphora
C. tamala

C. varum
Citrus maxima
C. reticulata
Cordia dichotoma
Couropita guinensis
Dalbergia lanceolaria
D. latifolia
D. sissoo
Delonix regia
Dillenia indica
D. pentagyna
Dipterocarpus turbinatus
Diospyros montana
D. peregrina
Drypetes roxburghii
Duabanga grandiflora
Enterolobium saman
Ervatamia coronaria
Erythrina indica
Eucalyptus maculata
Euphorbia antiqorum
E. nivulia
E. tirucalli
Feronia limonia
Ficus benghalensis
F. elastica
F. racemosa
F. religiosa
F. rumphii
Flacourtia jangomas
Garcinia cowa
G. xanthochymus
Gardenia jasminoides
Garuga pinnata
Glyricidia maculata
Gmelina arborea
Grevillea robusta
Hibiscus mutabilis
Holarrhena antidysentirica
Hydnocarpus kurzii
Jatropha curcas
Kigelia pinnata
Kleinovia hospita
Kydia calycina
Lagerstroemia speciosa
Leucaena leucocephala
Linnea coromandelica
Litchi chinensis
Litsea glutinosa
L. monopetala
Madhuca latifolia
Magnolia grandiflora

M. pterocarpa
Mallotus philippensis
Mangifera indica
Melia azedarach
Mesua ferrea
Michelia champaca
Millingtonia hortensis
Mimosops elengi
Moringa oleifera
Murrya koenigii
M. paniculata
Morus australes
Nyctanthes arbortristis
Oroxylum indicum
Parkia javonica
Peltophorum inerme
Phyllanthus acidus
P. emblica
Pithecellobium saman
Plumeria alba
Polyalthia longifolia
Pongamia glabra
Premna latifolia
Psidium guajava
P. guineense
Pterospermum acerifolium

Putranjiva roxburghii
Ricinus communis
Sapindus mukoross
Saraca indica
Santalum album
Schima wallichii
Sesbania grandiflora
S. sesban
Shorea robusta
Spathodia campanulata
Spondius pinnata
Sterculia foetida
S. villosa
Sterospermum personatum
Streblus asper
Swietenia macrophylla
S. mahagoni
Syzygium cerasoides
S. cumini
S. jambos
S. operculatum
S. samarangense
Tectona grandis
Tamarindus indica
Terminalia alata
T. arjuna

T. belerica

T. chebula

Thespesia populnea

Thevitia peruviana

Toona ciliata

Trema orientalis

Trewia nudiflora

Vitex negundo

V. peduncularis

Wrightia coccinia

Zanthoxylum limonella

Ziziphus jujuba

Z. rugosa.

বাংলা ভাষায় সাধারণ পাঠকদের জন্য ত্রিপুরার 162টি সপুষ্পক বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদের পরিচয়, প্রাপ্তিস্থান, বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ সম্পর্কিত তথ্য আছে এই বইতে। ত্রিপুরার উদ্ভিদ নিয়ে লেখা এটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এ জাতীয় প্রথম বই। ত্রিপুরার গাছপালা হলেও এদের অনেকগুলোই পশ্চিম বাংলা এবং বাংলাদেশে জন্মায়। তাই আশা করা যায় যে বইটি সকল বাঙালি পাঠককেই আকৃষ্ট করবে।